সত্যজিৎ রায়

অপ্রকাশিত ফেলুদা

(অসমাপ্ত)

তোতা রহস্য

(প্রথম খসড়া)

'তোমার নাম ফেলুদা?'

একটা ছোট্ট ছেলে ফেলুদার পিছনে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটা করেছে। ঘটনাটা ঘটছে পার্ক আর রাসেল স্ট্রিটের খেলনার দোকান হবি সেন্টারে। শুধু খেলনার দোকান বললে ভুল হবে, কারণ এখানে খেলনা ছাড়াও আরেকটা জিনিস পাওয়া যায় সেটা হল অ্যাকুরিয়ামের মাছ। ব্রেজিলের রাক্ষুসে মাছ পিরানহার দুটো বাচ্চা ওখানে এসেছে খবর পেয়েই দুজনে এসে হাজির হয়েছি।

ওই খুদে মাছের ধারালো দাঁত দেখে আমাদের চোখ চড়কগাছ, এমন সময় পিছন থেকে প্রশ্নটা এল।

ছেলেটি ঘাড় উঁচু করে ফেলুদার দিকে দেখছে একদৃষ্টে। একটি ভদ্রলোক হাসি হাসি মুখ করে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, 'আমার ছেলে আপনার পরম ভক্ত। বলতে পারেন আপনি ওর একজন হিরো।'

ফেলুদা কিছু বলার আগেই ছেলেটি এক নিশ্বাসে বলে গেল— 'আমাদের বাড়িতে একটি টিয়া উড়ে এসেছিল কাল বিকেলে, সেটাকে পঞ্চু ধরে ফেলেছে, আর আমরা একটা খাঁচা কিনেছি. আর সেই খাঁচাতে টিয়াটাকে রেখে দিয়েছি, আর সেটা খুব মজার কথা বলে।'

'তাই বুঝি?' ফেলুদা ছেলেটির দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল। 'কী বলে বলত?'

'খালি খালি ত্রিনয়ন বলে একজনকে ডাকে।'

'বাঃ—এতো খুব মজার ব্যাপার!' ফেলুদা বলল, 'ত্রিনয়ন নিশ্চয়ই ওকে খেতে দিত।'

'তুমি দেখবে টিয়াটা?'

বেশ বুঝতে পারছিলাম যে ফেলুদা যদি একবার হ্যাঁ বলে তো ছেলেটি একেবারে হাতে স্বর্গ পাবে।

ছেলের বাবা আরও এগিয়ে এসে বললেন, 'ফেলুদা ব্যস্ত মানুষ কত কাজ থাকে ওঁর, ওঁর পক্ষে কি যেখানে সেখানে যাওয়া সম্ভব?'

ফেলুদা বলল, 'বেশ তো, একদিন যাব এখন। তোমার টিয়া তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। অবিশ্যি কার টিয়া দেখতে যাচ্ছি সেটা আমার জানা দরকার।'

ভদ্রলোক এবার পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে ফেলুদাকে দিয়ে বললেন, 'আমার নাম জয়ন্ত বোস। ইনি হচ্ছেন শ্রীমান রজত। আপনি একদিন এলে আমরা খুবই খুশি হব। রজত ছাড়াও আমাদের বাড়িতে আপনার আরও দুটি ভক্ত আছেন—রজতের মা এবং বাবা।'

ফেলুদা কথা দিল যে একটা রবিবার সকালে রজতদের বাড়িতে গিয়ে তার টিয়া পাখি দেখে আসবে।

পরদিন সকালে ফেলুদার ডাকে ঘুম ভাঙল। বৈঠকখানা থেকে ডাকছে ফেলুদা। ও সকলের আগে উঠে যোগব্যায়াম সেরে, সকলের আগে খবরের কাগজ পড়ে।

আমি তড়াক্ করে উঠে ওর কাছে গিয়ে দেখি ও খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসে আছে। পাশে ইংরিজিটা ভাঁজ করে রাখা, হাতে বাংলা কাগজ। আমায় দেখেই 'এইটে পড়ে দেখ তোপ্‌সে' বলে কাগজটা আমার হাতে দিয়ে একটা জায়গায় আঙুল দেখিয়ে দিল। দেখি দ্বিতীয় পাতায় কর্মখালি-টালির মধ্যে ব্যক্তিগত বলে যে বিজ্ঞাপনগুলো থাকে, এটা তারই একটা। তাতে লেখা রয়েছে—

'গত ১৯শে অক্টোবর আমার একটি পোষা চন্দনা খাঁচা থেকে পালিয়ে যায়। আমার অতি প্রিয় এ পাখিটা সন্ধান দিতে পারলে উপযুক্ত পুরস্কার দেব। ধূর্জটিপ্রসাদ মল্লিক, ২২ নং হরিশ মুখার্জি রোড কলকাতা ৭০০ ০২০।'

ফেলুদা বলল, 'যদ্দুর মনে পড়ছে, এই ধূর্জটি মল্লিক হলেন একজন বিরাট ধনী ব্যবসায়ী। কালীচরণ মল্লিক অ্যান্ড সান্‌স-এর কাপড়ের

দোকান ছিল বড়বাজারে। ধূর্জটি সম্ভবত ওই অ্যান্ড সান্‌স-এর একজন। তা ইনি হঠাৎ একটা পাখির শোকে এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছেন কেন সেইটেই হচ্ছে কথা।'

আমি বললাম, 'তা হলে তো জয়ন্তবাবুদের পাখিটা ফেরত দিয়ে দিতে হবে।'

'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে। শ্রীমান রজত খবরটা শুনে খুব খুশি হবে বলে মনে হয় না। দেখি...'

ফেলুদা উঠে গিয়ে ফোন তুলে জয়ন্তবাবুর নম্বর ডায়াল করল। টেলিফোনে যা কথা হল মোটামুটি এই—

তোতা রহস্য

(দ্বিতীয় খসড়া)

'বাবা বলছে তুমি ফেলুদা।'

কথাটা শুনে পাশ ফিরে দেখি একটা আট দশ বছরের ছেলে ফেলুদার পাশে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচিয়ে তার মুখের দিকে দেখছে। তার পিছনে দূরে গরম বুশ শার্ট পরা একজন ভদ্রলোক হাসিমুখে আমাদের দিকে দেখছেন। বোধহয় তিনিই 'বাবা'। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে ফেলুদাকে বললেন, 'আমি আপনি বোধহয় একই সেলুনে চুল ছাঁটাই। সেখানেই আপনাকে দেখেছি। আসলে আমার ছেলে আপনার খুব ভক্ত, তাই আপনাকে চিনিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারলাম না।'

আমাদের কথা হচ্ছিল পার্ক স্ট্রিটের হবি সেন্টার বলে যে খেলনার দোকান আছে তার ভিতর দাঁড়িয়ে। আজ বড়দিন, তাই আমরা পার্ক স্ট্রিটের ঝলমলে চেহারাটা দেখতে বেরিয়েছি। মিনিট দশেক ঘোরাঘুরির পর ফেলুদা বলল যে ওর কিছু চাইনিজ তারের ধাঁধা কেনা দরকার। নানারকম জ্যামিতিক নকশায় ব্যাঁকানো তার, সঙ্গে আরেকটা কায়দা করে প্যাঁচানো থাকে। মাথা খাটিয়ে সেই প্যাঁচ খুলে দুটোকে

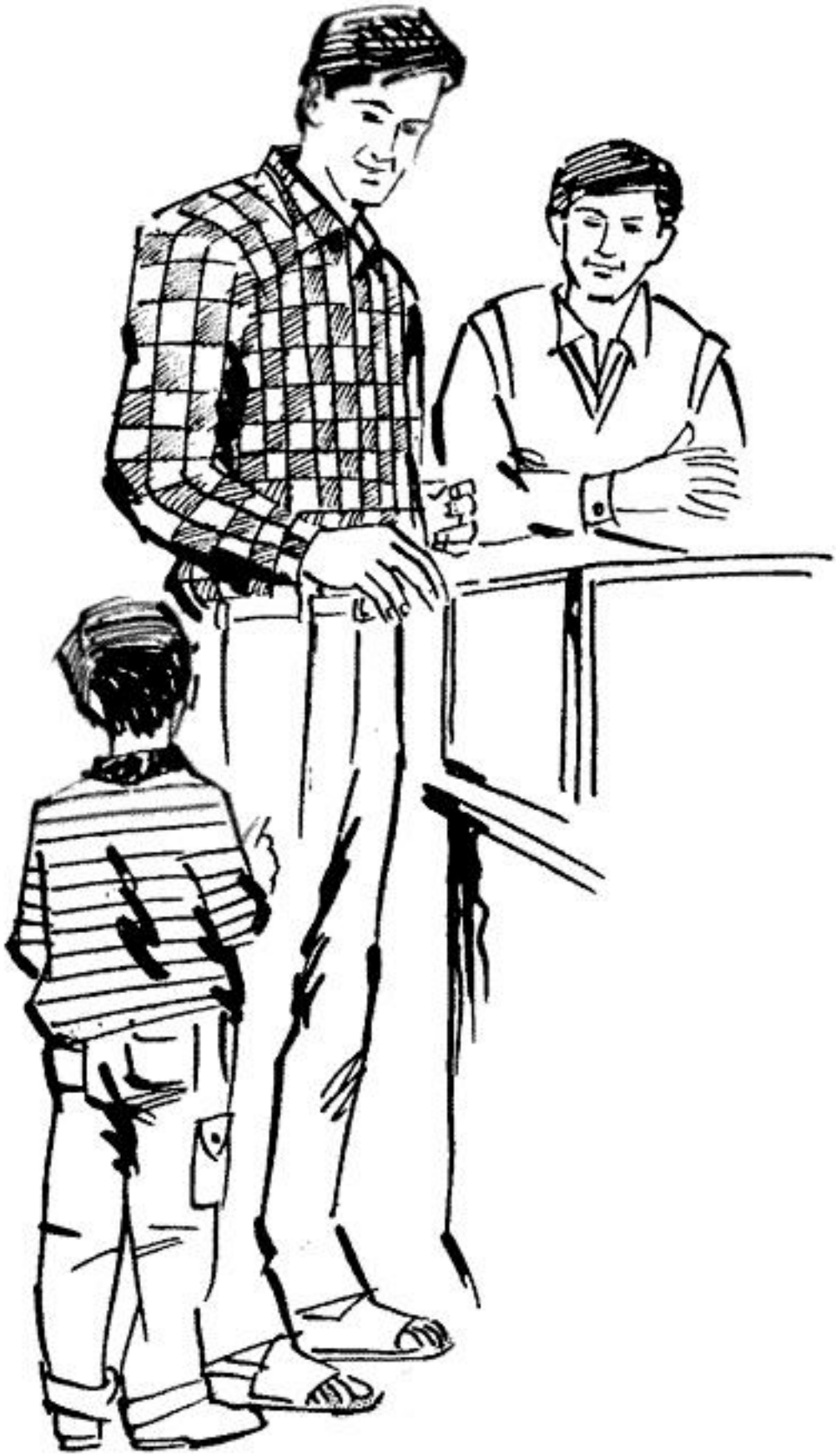

আলগা করতে হয়। এই হল Chinese Wire Puzzle। এর খোঁজেই হবি সেন্টারে আসা, আর সেখানেই ফেলুদার এই খুদে ভক্তের সঙ্গে দেখা।

ফেলুদা ছেলের বাপের কথা শুনে হেসে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি না হয় ফেলুদা, তোমার নামটি কী সেটা তো জানতে পারলাম না।'

ছেলেটি ফেলুদার কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'আমার টিয়া কোথায় গেছে বের করে দিতে পারবে?'

ভদ্রলোক হেসে উঠলেও মনে হল সেটা খানিকটা তার অপ্রস্তুত ভাবটা ঢাকার জন্য।

ফেলুদা বলল, 'কী হল তোমার টিয়া?'

ছেলেটি কিছু বলার আগে ভদ্রলোকই উত্তর দিলেন। 'ওর জন্য এই সেদিন একটা টিয়া এনে দিয়েছিলাম। আজ সকালে সেটা খাঁচা থেকে উধাও। পালিয়ে টালিয়ে গেছে বোধহয়।'

'পারবে বার করে দিতে?'—ছেলেটি এখনও এক দৃষ্টে ফেলুদার দিকে চেয়ে আছে।

ফেলুদা বলল, 'আগে সমস্ত ঘটনা না জানলে কি ডিটেকটিভ কাজ শুরু করতে পারে?'

'তা হলে চলো আমাদের বাড়ি।'

'ও কী হীরক!' ভদ্রলোক মোলায়েম ধমকের সুরে বললেন, 'ফেলুবাবুর বুঝি অন্য কাজ নেই? উনি কত ব্যস্ত লোক জানো?' তারপর ফেলুদার দিকে ফিরে বললেন, 'অবিশ্যি আপনি আসতে পারলে আমরা খুব খুশিই হব। টিয়া রহস্য সমাধানের জন্য বলছি না—হে হে—এমনি এসে চা খেয়ে যাবেন আর কী।'

ফেলুদার হাত এখন খালি, তার উপরে বড়দিনের ছুটি, তার উপরে তার খুদে ভক্তর অনুরোধ—একসঙ্গে এতগুলো কারণের জন্যই বোধহয় ও পরদিন বিকেলে নীহার দাশগুপ্তর বাড়ি যেতে রাজি হয়ে গেল।

খাবার পরে ফেলুদাকে বললাম, 'তুমি যে নীহারবাবুর বাড়িতে

যেতে রাজি হলে, ওর ছেলে কিন্তু টিয়ার ব্যাপারটা ঠিক তোমার ঘাড়ে চাপাবে।'

ফেলুদা খুব মন দিয়ে একটা নতুন কেনা চিনে তারের প্যাঁচ খোলার চেষ্টা করতে করতে বলল, 'হুঁ।'

আমি বললাম, 'হুঁ কী? শেষটায় যদি টিয়া উদ্ধার না হয়?'

'তা হলে একটি ভক্ত কমে যাবে!'—ফেলুদা বিড় বিড় করে মন্তব্য করল। আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না। যে সে লোকের যা কিছু হারালেই যদি ফেলুদাকে গিয়ে খুঁজে বের করে দিতে হয় তা হলে তো মুশকিল। একটা জবরদস্ত ক্রাইম-টাইম হয়—খুন, জালিয়াতি, একটা বড় রকমের চুরি বা ডাকাতি—তাতে ফেলুদার ডাক পড়লে ওর বুদ্ধিটা শানিয়ে নেবার সত্যি করে সুযোগ হয়। এই বড়দিনের ছুটিতে মনে মনে সেই রকমই একটা কিছুর আশা করছিলাম, কিন্তু তার জায়গায় কিনা...

আরও মিনিট পাঁচেক চেষ্টা করে তারের প্যাঁচ খুলে ফেলুদা একটা হাঁই তুলে বলল, 'আসল ব্যাপারটা কী জানিস? ওই নীহার দাশগুপ্ত লোকটা সম্বন্ধে আমার একটা কিউরিয়সিটি আছে।'

'কেন? লোকটা একজন কেউকেটা বুঝি?'

'দাশগুপ্ত বলছে, আর হেশাম রোড বলছে। যদি শরৎ দাশগুপ্তর বাড়ির ছেলে হয়, তা হলে...'

'তা হলে কী?'

'তা হলে আমাদের যাওয়াটা একেবারে মাঠে মারা যাবে না।'

* * *

ফেলুদার আন্দাজ ভুল হয়নি। নীহার দাশগুপ্ত হলেন শরৎ দাশগুপ্তের নাতি। দু বছর আগে সাতাশি বছর বয়সে শরৎ দাশগুপ্ত মারা যান। জীবনে তার একটিমাত্র শখ ছিল সেটা হল ঘড়ি সংগ্রহ করা। বাইশ নম্বর হেশাম রোডের বাড়ির দোতলার উত্তর পূর্ব কোণের বৈঠকখানায় ছিয়ানব্বুই রকম ছোট বড় ঘড়ি রয়েছে। এ ছাড়া বাড়ির অন্য ঘরে, বারান্দায় ও সিঁড়ির ল্যান্ডিঙেও আরও বেশ কয়েকরকম

ঘড়ি দেখলাম। এর চেয়ে বড় ঘড়ির সংগ্রহ যদি কলকাতায় কোথাও থেকে থাকে তো সে আমার জানা নেই। ঘড়িগুলো যখন বাজতে আরম্ভ করে তখন কথা বন্ধ করে চুপ করে শুনতে হয়।

নীহারবাবু বোধহয় তার ছেলেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রেখেছিলেন যে সে যেন ফেলুদা এলেই তাকে তার পাখির কথা বলে বিরক্ত না করে, কারণ আমরা যতক্ষণ বসে চা খেলাম, হীরক দরজার বাইরে ঘুর ঘুর করল কিন্তু ঘরে ঢুকল না।

নীহারবাবুর স্ত্রীও দেখলাম ফেলুদার ভক্ত। নিজে হাতে বিনুনি পাকানো মাংসের শিঙাড়া করেছিলেন আমাদের জন্য। তা ছাড়া কড়াইশুঁটির সঙ্গে চিড়ে ভাজা, বাড়ির তৈরি পাটিসাপটা আর চা।

চা খাওয়া শেষ হলে পর নীহারবাবু তার ঘড়ির কথা তুললেন। আমরা বারান্দায় বসেছিলাম—পাশেই বৈঠকখানা, আর সেখানেই ঘড়ি। ফেলুদা বলল, 'ঘড়ি দেখার আগে আপনার ছেলের সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই। তার টিয়া অন্তর্ধান রহস্যটাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়া অন্যায় হবে।'

হীরককে ডাক দিতেই সে দৌড়ে এল আমাদের কাছে।

ফেলুদা বলল, 'তোমার খাঁচাটা একবার দেখতে পারি কি? নাকি, পাখি নেই বলে সেটা ফেলে দিয়েছ?'

খাঁচাটা যেখানে ছিল সেখানেই আছে। হীরকদের শোবার ঘরের বাইরের বারান্দায়। তারের খাঁচা, মাথাটা গোল—যেমন সাধারণত হয়। খাঁচার ভিতরে একটা এনামেল করা বাটিতে এখনও ছোলা রয়েছে। দরজায় একটা ছিটকিনি রয়েছে, কিন্তু সেটা এখন খোলা।

'কবে এসেছিল, পাখিটা?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'এই তো—গত শনিবার', নীহারবাবু বললেন। 'হীরক ওর এক বন্ধুর বাড়িতে টিয়া দেখেছে—সেই থেকে ওর শখ। তাই শনিবার নিউ মার্কেট থেকে এটা এনে ওকে দিই। রবিবার রাত্রেই ওটা কেউ সরিয়েছে। কারণ সোমবার, অর্থাৎ কাল সকালে হীরকই ঘুম থেকে উঠে দেখে খাঁচা খালি। অথচ দরজাটা রাত্রে ওর মা নিজে হাতে বন্ধ করেছে।'

'সেই রাত্রে কোনও শব্দ পেয়েছিলে কি, হীরকবাবু?' ফেলুদা প্রশ্ন

করল।

হীরক মাথা নাড়ল। হীরকের মা বললেন, 'আমি যেন একবার ডাকতে শুনেছিলাম টিয়াকে, কিন্তু সেটা মনে হল—পাখিটা নতুন জায়গায় এসেছে, অভ্যেস হয়নি, তাই ডাকছে।'

ফেলুদা ভীষণ কাছ থেকে খাঁচাটাকে দেখছে, তার চোখে ভ্রূকুটি।

হীরক এতক্ষণ চুপ করেছিল। এবার বোধহয় আর ধৈর্য রাখতে না পেরে বলল, 'কে নিয়েছে পাখিটা?'

গম্ভীর গলায় প্রশ্নটা শুনে হাসিই পেয়ে গিয়েছিল। হীরকের মা'ও দেখলাম মুখে কাপড় চাপা দিয়ে মাথাটা ঘুরিয়ে নিলেন। নীহারবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে গলা খাকরালেন। ফেলুদা কিন্তু বেশ গম্ভীর ভাবেই বলল, 'কে নিয়েছের চেয়েও আগে জানতে হবে কেন নিয়েছে। ব্যাপারটা খুব সহজ নয় হীরকবাবু—আমাকে একটু ভাবতে সময় দিতে হবে।'

'ঠিক আছে।' গম্ভীর গলায় হীরকের কথা এল। ফেলুদা যে তার জন্যে ভাবছে এটাতেই তার মন ভাল হয়ে গেছে; টিয়া ফিরে আসুক কি না আসুক সেটা বোধহয় খুব বড় কথা নয়।

এবার আমরা নীহারবাবুর বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হলাম। এটাই হল ঘড়ির ঘর। এমন ঘর সত্যিই আমি কখনও দেখিনি। ফেলুদা বলল, 'এত ঘড়িতে রোজ রোজ দম দেওয়া তো এক পেল্লায় ব্যাপার। আলাদা লোক রাখতে হয়েছে বোধহয়?'

'আমাদের বহুদিনের পুরোনো বেয়ারা ঘনশ্যামই কাজটা করে।'

'ভাল কথা—আর চাকর বাকর কী আছে আপনাদের বলুন তো। টিয়ার ব্যাপারে আমার মনটা খচ খচ করছে। বাড়ির চাকর ছাড়া আর কেউ ওটা নিতে পারে বলে মনে তো হয় না।'

'রান্নার লোক একটি আছে, সেও অনেকদিনের। একটি ছোকরা চাকর আছে—যতীন—সে লোকটা এসেছে বছর দুয়েক হল। এ ছাড়া মালি, জমাদার—এরা কেউই রাত্রে থাকে না।'

ফেলুদা ঘড়ির দিক থেকে চোখ না ফিরিয়েই প্রশ্ন করে চলেছে।

'যতীনই কি আমাদের চা এনে দিল?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে জিজ্ঞেস করেছিলেন টিয়ার কথা?'

'হ্যাঁ। স্বভাবতই ও বলেছে কিছুই জানে না।'

'নিউ মার্কেটের যে দোকান থেকে পাখিটা কিনেছিলেন তার নাম জানেন?'

'লোকটার নাম লতিফ। লতিফের দোকান বলেই বলে।'

এর পরে আর ফেলুদা পাখি নিয়ে কোনও প্রশ্ন করেনি।

নীহারবাবু তার প্রতেকটি ঘড়ির ইতিহাস আমাদের বললেন। তিনশো বছরের পুরোনো ঘড়িও রয়েছে। একটা বেশ বড় দাঁড় করানো ঘড়িতে দেখলাম খোলস বলে কিছু নেই, কলকব্জা সব বাইরে থেকেই দেখা যাচ্ছে। কলকাতার টাইমের সঙ্গে সঙ্গে লন্ডন, প্যারিস, নিউ ইয়র্কের টাইম জানা যাচ্ছে। বাইরে যা দেখাবার মতো আছে সব দেখিয়ে নীহারবাবু একটা দেরাজ খুলে বললেন, 'আমার ঠাকুরদাদার সংগ্রহের সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটা আপনাকে দেখাই।'

একটা ছোট্ট বাক্স থেকে একটা সোনার ট্যাঁক ঘড়ি বার করে নীহারবাবু ফেলুদার সামনে ধরে বললেন, 'আড়াইশো বছর আগে লন্ডনের লুই রিকর্ডনের তৈরি—পৃথিবীর প্রথম সেলফ-ওয়াইন্ডিং ঘড়িগুলোর মধ্যে একটা হল এটা।'

আমি অবাক হয়ে এই দম না দেওয়া ঘড়ি দেখতে লাগলাম। ফেলুদার হাত ঘড়িটাতেও (যেটা দীননাথ পাকাড়াশি ওকে দিয়েছিলেন বাক্স-রহস্য সমাধানের পর) দম দিতে হয় না; কিন্তু দম-না-দেওয়ার কায়দাটা যে আড়াইশো বছর আগেই আবিষ্কার হয়ে গেছে সেটা ভাবিনি।

নীহারবাবু আমাদের পাঁচটা পর্যন্ত থেকে যেতে বলেছিলেন, কারণ সেই সময় বাজা-ঘড়িগুলো সব একসঙ্গে বাজবে, আর সেটা নাকি একটা শোনার মতো ব্যাপার। পাঁচটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকি দেখে আমরা আবার সোফায় বসলাম। ফেলুদা বলল, 'মোমবাতির দাগ দেখছি টেবিলের উপর। আপনাদের এদিকেও বুঝি পাওয়ার-কাট থেকে অব্যাহতি নেই।'

'আর বলবেন না। কারুই বা অব্যাহতি আছে বলুন। হপ্তায় তিনদিন সন্ধ্যাটা যে কী করে কাটাব সেটা ভেবে পাই না।'

'সেই জন্যেই বুঝি প্ল্যানচেট ধরেছেন?'

ভদ্রলোক প্রশ্নটা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। 'বাবা— আপনার দৃষ্টিও খুবই তীক্ষ্ণ। কাল হবি সেন্টার থেকে উইজা বোর্ড কিনেছিলাম সেটা লক্ষ করেছেন বুঝি?'

ফেলুদা হাসল। আমি জানতাম উইজা বোর্ড হল একটা চাকাওয়ালা কাঠের তক্তা, তাতে পেনসিল গোঁজার জন্য একটা ফুটো। একটা তেপায়া টেবিলের উপর একটা সাদা কাগজ রেখে তার উপর বোর্ডটাকে রাখতে হয়। তারপর ঘরের বাতি নিভিয়ে সকলে টেবিলটাকে ঘিরে বসে কোনও মৃত লোকের কথা ভাবলে নাকি

কিছুক্ষণেই সেই লোকের আত্মা এসে হাজির।

আর তখন সেই আত্মাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে সকলের হাতসুদ্ধ বোর্ডটা নাকি এঁকে বেঁকে চলতে থাকে, আর তার ফলে সাদা কাগজের উপর পেনসিল দিয়ে সেই প্রশ্নের উত্তর লেখা হয়ে যায়।

'আসলে কী জানেন,' ভদ্রলোক বললেন, 'বোর্ড ছাড়া শুধু টেবিলের উপর হাত রেখে বসে থেকে দেখেছি—কোনও ফল হয়নি। তাই ভাবলাম এবার বোর্ড দিয়ে করে দেখব।'

'বোর্ড দিয়ে ফল পেয়েছেন?'

'এখনও বসিনি। আমরা বুধবার বুধবার বসি। আমার এক বন্ধু আছে—শখটা আসলে তারই। আর আমার এক প্রতিবেশী আছেন—সুধাংশুবাবু—এই তিনজন। আপনারও এ ব্যাপারে ইন্টারেস্ট আছে না কি?'

ফেলুদা হাসল। 'নাঃ। তবে যারা এ সবের চর্চা করে তাদের সম্পর্কে একটা কৌতূহল হয় বই কী।'

'আসলে কী জানেন, অন্ধকারে বসে থাকতে থাকতে একদিন ভূত প্রেত আত্মা পরলোক এই সব নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তাই থেকেই আমার বন্ধুর মাথায় এল প্ল্যানচেট ট্রাই করার ব্যাপারটা। ছেলেমানুষী বটেই—তবে এতরকম লোকে ফল পেয়েছে বলে শুনেছি যে পরখ করে দেখতে ইচ্ছে হল।'

রাত্রে ফেলুদাকে একটু গম্ভীর দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'ঘড়ির কথা ভাবছ, না প্রেতাত্মার কথা ভাবছ, না টিয়ার কথা ভাবছ?'

ফেলুদা বলল, 'যতীন চাকরটা যখন চা দিচ্ছিল তখন ওর ডান হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীটা লক্ষ করেছিল?'

'কই, না তো।'

'দুটো ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। দেখে ভাল লাগল না। খাঁচার দরজার পাশে তারেও লাল দাগ দেখলাম। শুকনো রক্ত বলেই তো মনে হল।'

'কিন্তু যতীন খাঁচা থেকে পাখি বার করবে কেন? পাখিটা তো আর ধন দৌলত নয়। আর এমন একটা সাংঘাতিক কোনও পাখিও নয় যে বিক্রি করলে বেশি দাম পাওয়া যাবে।'

'জানি রে তোপসে, জানি...কোনও কারণে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে বলেই তো মেজাজটা খিঁচড়ে আছে। ব্যাপারটায় লজিকের এত অভাব বলেই তো আমাকে এত পীড়া দিচ্ছে। এখন যেটা দরকার সেটা হল পাখিটার সম্বন্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা। লতিফের দোকান—নিউ মার্কেট...'

ফেলুদা বলে নিউ মার্কেটের মতো এমন একটা ব্যাপার শুধু কলকাতায় বা ভারতবর্ষে কেন—সারা পৃথিবীতেই খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না। একটি সেফটি পিন থেকে রয়েল বেঙ্গল টাইগার পর্যন্ত যা কিছু চাও তাই কিনতে পাওয়া যায় নিউ মার্কেটে। আমার তো প্রতিবার গেলেই গোলকধাঁধার মতো সব গুলিয়ে যায়, কিন্তু ফেলুদা একেবারে সটান যে দোকানে যাওয়া দরকার সেখানে গিয়ে হাজির হয়। ওর নাকি পুরো মার্কেটের প্ল্যানটা মাথার মধ্যে পরিষ্কার আছে। একবার পাখির বাজারে পৌঁছে লতিফের দোকান বার করতে লাগল ঠিক দু মিনিট। সমস্ত পাখির বাজারটায় যে দিকে চোখ যায় সেদিকেই খাঁচা, আর খাঁচার মধ্যে হাজারে হাজারে কতরকম পাখি রয়েছে তার ঠিক নেই। কয়েকটা পাশাপাশি খাঁচায় তো পেলিক্যান পর্যন্ত রয়েছে মনে হল। আর সব পাখিই কি একসঙ্গে ডাকছে? তা না হলে এরকম কান ফাটা শব্দ হবে কেন?

ফেলুদা লতিফকে সোজাসুজি প্রশ্ন করল তার দোকান থেকে গত শনিবার একজন বাঙালি ভদ্রলোক এসে একটা টিয়া কিনে নিয়ে গেছে কি না।

'টিয়া তো নেয়নি বাবু', লতিফ বলল।

'টিয়া নেয়নি?'

'না বাবু। তবে চন্দনা একখানা বিক্রি হয়েছে। খুব ভাল পাখি। একজন ফরসা মতো বাবু এসে কিনে নিয়ে গেলেন।'

'টিয়া আর চন্দনা তো খুবই কাছাকাছি, তাই না?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ বাবু। তবে চন্দনার গলায় একটা দাগ থাকে। আর চন্দনার মতো অমন পরিষ্কার কথা টিয়া পাখি বলতে পারে না।'

'এই চন্দনাটা কথা বলত?'

'হ্যাঁ বাবু। 'মা' 'মা' করে ডাকত। 'ঠাকুর ভাত দাও,' 'মধুসূদন', 'হরি হরি'—অনেক কথা বলত বাবু। ভবানীপুরের এক বাড়ি থেকে এসছিল পাখিটা। আপনাদের চাই কথা বলা পাখি? ময়না আছে, চন্দনা আছে—'

হীরকের পাখিটা টিয়া না—চন্দনা, এইটাই খালি জানা গেল লতিফের কাছে এসে। ফেলুদা বলল তাতে নাকি অনেকটা লাভ হয়েছে—রহস্যের একটা নতুন দিক নাকি খুলে গেছে।

একটা প্রশ্ন আমার মনে আসছিল—মার্কেট থেকে ফেরার পথে সেটা ফেলুদাকে জিজ্ঞেস না করে পারলাম না।

'আচ্ছা ফেলুদা, পাখিটাই যদি নেবার ছিল, তা হলে খাঁচাসুদ্ধু নিয়ে গেলেই তো হত। খাঁচার দরজা খুলে জখম হওয়ার রিস্কটা নিল কেন?'

'তোর প্রশ্নটা ভালই হয়েছে রে তোপসে। এটা আমারও মাথায় এসেছিল। আসলে যে নিয়েছে সে বোধহয় এইটেই বোঝাতে চেয়েছিল যে পাখির দরজা বন্ধ করা হয়নি, তাই পাখি উড়ে পালিয়েছে। পাখিটাকে যে কোনও একটা বিশেষ প্রয়োজনে ফন্দি করে সরানো হয়েছে সেটা সে বোঝাতে দিতে চায়নি। আর খাঁচা থেকে যখন বার করে নেওয়া হয়েছে, তার মানে হয় সে পাখিকে মেরে ফেলা হয়েছে, না হয় তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।'

পরদিন সকালে ফেলুদা নীহারবাবুকে ফোন করে পাখির কোনও সন্ধান পাওয়া গেছে কি না জিজ্ঞেস করল। পাখিটাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়ে থাকে তা হলে সেটা আশেপাশেই কোনও গাছে হয়তো থাকতে পারে। কাছাকাছির মধ্যে যদি কোনও পার্ক থাকে তা হলে হীরক যেন সেখানে মাঝে মাঝে গিয়ে গাছপালাগুলো দেখে আসে, এ কথাও ফেলুদা বলল। ভদ্রলোক বললেন পাখির খবর পেলেই উনি জানাবেন।

বিষ্যুদবার সকালে সাতটার সময় নীহারবাবু ফোন করলেন। চন্দনার

খবরের জন্য নয়। তার আড়াইশো বছরের পুরোনো সেলফ-ওয়াইন্ডিং ট্যাঁক ঘড়িটা কাল রাত্রে তার দেরাজ থেকে চুরি হয়ে গেছে।

ফেলুদা টেলিফোনটা রেখে ধরা গলায় বলল, 'চট করে তৈরি হয়ে নে। আমার মন বলছিল একটা গণ্ডগোল হবে—'

১৩/২/৭৩

বাক্স রহস্য

(প্রথম খসড়া)

খুব মন দিয়ে কাগজের কাটিংগুলো সাঁটছিলাম বলেই বোধহয় হঠাৎ গ্যাঁ-ক করে কলিং বেলটা বাজতে আঁতকে উঠলাম। কাটিং সাঁটার কাজটা অবিশ্যি আমার নিজের নয়—ওটা ফেলুদা আমাকে করবার ভার দিয়েছে। খবরের কাগজ থেকে যত রাজ্যের উদ্ভট খবর বার করে কেটে একটা বিরাট মোটা খাতায় সেঁটে রাখা। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার পর লম্বা ছুটি, তাই এমনিতেই আমার সময়ের অভাব নেই, আর সবচেয়ে বড় কথা, ফেলুদার ফরমাশ খাটতে আমার কখনওই কোনও আপত্তি নেই।

ঢাউস খাতাটা বন্ধ করে কাটিংগুলো সেটা দিয়ে চাপা দিয়ে দরজা খুলতে বেরিয়ে গেলাম। ফেলুদা চুল ছাঁটতে গেছে—এত তাড়াতাড়ি ফেরার কথা নয়, আর বাবা আপিসে গেছেন। কে এল তা হলে?

দরজা খুলে যাকে দেখলাম তাকে এর আগে কখনও দেখিনি। বয়স চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে, ফরসা রং, চোখ দুটোয় একটা চিনেম্যানের ভাব আছে, আর চুল রীতিমতো পাতলা হয়ে প্রায় টাক পড়ার ভাব হলেও, পাকা নয়। বললাম, 'কাকে চাই?'

ভদ্রলোক দরজার বাইরে বাঁ দিকে বাড়ির নম্বরটার দিকে আরেকবার দেখে নিয়ে বললেন, 'প্রদোষ মিত্তির এখানে থাকেন কি?'

প্রদোষ ফেলুদার ভাল নাম। বললাম, 'হ্যাঁ—কিন্তু তিনি তো একটু বেরিয়েছেন। মিনিট পনেরোর মধ্যেই হয়তো ফিরবেন। আপনি একটু বসবেন কি?'

ভদ্রলোক সাদা ধুতি পাঞ্জাবি পরেছেন; সেই ধুতির খুঁট দিয়ে ঘাম

মুছে একটু যেন কিন্তু কিন্তু ভাবে শেষ ধাপ সিঁড়িটা উঠে ঘরের ভিতর পা দিয়ে বললেন, 'একটু—মানে, ইয়ে ছিল আর কি—'

'তা হলে বসুন না।'

বাইরের ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকেই আমাদের বৈঠকখানা। আমি পাখাটা খুলে দিলাম। ভদ্রলোক একটা সোফায় বসে বললেন, 'এক গেলাস জল যদি—'

আমি জল এনে দিলাম। ভদ্রলোক ঢক ঢক করে খেয়ে গেলাস তার বাঁ পাশের কাচের টেবিলে রেখে দিয়ে হাঁফ ছাড়লেন। এবার আরও লক্ষ করলাম—ভদ্রলোকের বা হাতের দুটো আঙুলে দুটো আংটি, পায়ে সাদা রঙের নাগরা জুতো, আর পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম। প্রদোষ মিত্তিরের খোঁজ করা মানেই ডিটেকটিভের খোঁজ করা। আর ডিটেকটিভের খোঁজ করা মানেই কোনও রহস্য বা খুন খারাপির সঙ্গে ভদ্রলোকের সম্পর্ক আছে। তা না হয়ে ভদ্রলোক যদি ফেলুদার কোনও পুরোনো বন্ধু হন তা হলে খুব খারাপ হবে। কিন্তু সেটার সম্ভাবনা কম—কারণ ফেলুদার বয়স সবেমাত্র আঠাশ হয়েছে।

আমি ঘরের উল্টোদিকে তক্তপোষটার উপর বসেছিলাম। ভদ্রলোককে একা বসিয়ে রাখা অন্যায় হবে বলে মনে হচ্ছিল; যদি উনি ফেলুদার খদ্দেরই হন, তা হলে তার সঙ্গে অভদ্রতা করাটা ভুল হবে।

কট কট শব্দ পেয়ে ভদ্রলোকের দিকে ফিরে দেখি উনি অন্যমনস্ক হয়ে আঙুল মটকাচ্ছেন। প্রথমে একে একে ডান হাতের সব আঙুল, তারপর একে একে বাঁ হাতের সব আঙুল (যদিও কড়েটায় আওয়াজ হল না) মটকে ভদ্রলোক পাশের সোফার উপর থেকে আনন্দবাজারটা তুলে নিয়ে মিনিট খানেক পাতা উলটিয়ে সেটা আবার রেখে দিলেন। ফেলুদা হলে এতক্ষণে ভদ্রলোকের সম্বন্ধে অনেক তথ্য বার করে নিতে পারত—শুধু তার চেহারা বা হাবভাব দেখেই। আমি শুধু এইটুকুই বুঝলাম যে উনি বেশ নার্ভাস। জুলাই মাসে গরম খুব বেশি নেই—কারণ সারা রাত বৃষ্টি পড়েছে। অথচ ভদ্রলোকের কপাল বার বার ধুতি দিয়ে মুছেও দেখতে দেখতে বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরে যাচ্ছে। নাকের ডগা, গোঁফের জায়গা আর কাঁধের কাছটাতেও খুব ঘাম হচ্ছে। অবিশ্যি কিছু লোক আছে যারা এমনিতেই একটু বেশি ঘামে। কম ঘামা

লোকের মধ্যে ফেলুদা নিজেই একজন।

বৈঠকখানার ঝোলানো ঘড়িটায় ঢং ঢং নটা বাজা শেষ না হতেই ফেলুদা এসে হাজির। তার মানে পনেরো মিনিটও হয়নি। চুল যে কেটেছে সেটা প্রায় দেখলে বোঝাই যায় না—অবিশ্যি এটাই হচ্ছে ফেলুদার কায়দা। ও বলে পুরুষ মানুষের চেহারার আট আনা নির্ভর করে নাপিতের উপর। কাজেই চুল কাটতে বসে সবচেয়ে বেশি সজাগ থাকা উচিত; নাপিতের হাতে ছেড়েছ কি তিন মিনিটে কাঁচির দুটো বেমক্কা চালে তোমার পোর্ট্রেট চেঞ্জ করে দেব।

যাই হোক, ফেলুদা ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, 'আপনি কি প্রদোষ মিত্তির?'

ফেলুদা বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। বসুন...'

ভদ্রলোক বসতে বসতে বললেন, 'আমার নাম হরিনাথ চক্রবর্তী। আমি আসছি কর্নওয়ালিস স্ট্রিট থেকে।'

'ট্যাক্সিতে এলেন না কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে, আমার গাড়িটা একটু গোলমাল করছে—তা ছাড়া ভবানীপুরের দিকটা ভাল জানা নেই। রোড সেন্সটাও কম—তাই ভাবলুম ট্যাক্সিতে গেলে বাড়ি খুঁজে পাওয়াটা আরেকটু সিওর হবে।'

'ও।—তা, কী ব্যাপার বলুন।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' ভদ্রলোক একটু থামলেন। বুঝলাম বেশ নার্ভাস বোধ করছেন। 'আমি—মানে, আপনার নাম শুনেছি। আমার এক দুঃসম্পর্কের আত্মীয়ের কৈলাস চৌধুরীর সঙ্গে খুব জানা শোনা আছে। তিনিই, আর কী...

ফেলুদা বলল, 'একটু চা বা কফি—?'

'আজ্ঞে, তা এক কাপ...'

'কোনটা?'

'যেটা হয়।'

ফেলুদা আমাকে ইশারা করাতে আমি টক করে উঠে গিয়ে আমাদের নিতাই চাকরকে দু পেয়ালা কফি করতে বলেই আবার বসবার ঘরে ফিরে এলাম। আমার বুক ঢিপঢিপ শুরু হয়ে গিয়েছে।

ফেলুদারও যে নামডাক আগের চেয়ে বেশি হয়েছে সেটাও বেশ বুঝতে পারছি। আগে আগে লোকে ফেলুদাকে ডেকে পাঠাত, এখন নিজেরা ধাওয়া করে বাড়ি খুঁজে তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে।

ভদ্রলোক আরেকবার ঘাম মুছে নিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা—মানে, একটু—যাকে বলে কমিক্যাল। আপনি হয়তো শুনে হাসবেন। মানে, সচরাচর যেসব কারণে মানুষে গোয়েন্দার কাছে আসে তা ঠিক না—তবে—'

ফেলুদা চুপ করে বসে আছে। তার দৃষ্টি এতক্ষণ সটান ভদ্রলোকের দিকে ছিল, এবার দেখলাম ফেলুদা গলা খাকরানি দিয়ে চোখ নামিয়ে পকেট থেকে তার দেশলাই আর সিগারেটটা বার করল। ভদ্রলোকের দিকে প্যাকেটটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আসুন।' বুঝলাম ভদ্রলোকের নার্ভাসনেসটা কাটানোর জন্যই ফেলুদা একটা হালকা স্বাভাবিক ভাব আনার চেষ্টা করছে।

ভদ্রলোক অল্প হেসে মাথা নেড়ে বললেন, 'আজ্ঞে না, আমি খাই না।'

ফেলুদা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আপনি কি আমার এই ভাইটির সামনে আপনার কথা বলতে দ্বিধা করছেন?'

ভদ্রলোক অপ্রস্তুত ভাবে হেসে বললেন, 'না না মোটেই না। আসলে—ওই যা বললাম—ব্যাপারটা একটু পিকিউলিয়ার।'

তারপর পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে হরিনাথবাবু একটা কাগজের মোড়ক বার করলেন। সেটা খুলতে তার থেকে বেরোল একটা কাগজের বাক্স, আর বাক্সর ঢাকনাটা খুলতে যেটা বেরোল সেটা আমি যেখান থেকে বসে আছি সেখান থেকে দেখে কী জিনিস বোঝা যায় না। খুব বেশি আগ্রহ বা ব্যস্ততার ভাব না দেখিয়ে তক্তপোষ ছেড়ে ফেলুদার দিকে উঠে এগিয়ে এলাম। দেখলাম—ফেলুদা এখন যেটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখছে—সেটা হল একটা ধাতুর তৈরি ছোট্ট (দু ইঞ্চির বেশি লম্বা নয়) মূর্তি। কোনও দেবতার মূর্তিই হবে—তবে চেনা দেবতা নয়। জিনিসটা সোনা বা পিতলের তৈরি, আর তাতে আবার ছোট ছোট উজ্জ্বল রংচঙে পাথর বসানো। বাদশাহি আংটির ব্যাপারের সময় ফেলুদা পাথর চিনিয়ে দিয়েছিল—তাই বুঝলাম যে

এর মধ্যে চুনি পান্না নীলা ইত্যাদি সব কিছুই আছে। আরও কিছু আছে কি না সেটা নিজে হাতে নিয়ে ভাল করে পরীক্ষা না করলে জানা যাবে না।

'বাঃ—চমৎকার!'

ফেলুদা আমার নিজের মনেই ভাবটাই প্রকাশ করল। সত্যি—জিনিসটা দেখতে অদ্ভুত সুন্দর।

'কোথায় পেলেন এটা?'

ফেলুদার এ প্রশ্নের উত্তরে ভদ্রলোক একটু হেসে ফেলুদার হাত থেকে জিনিসটা ফেরত নিয়ে বললেন, 'সেটাই তো রহস্য! কী করে যে এটা আমার কাছে এল, তা বুঝতেই পারছি না। একজন লোকের কোনও মূল্যবান জিনিস হারালে সে লোকের পক্ষে গোয়েন্দার কাছে যাওয়া স্বাভাবিক—কিন্তু একজনের হাতে যদি এমন একটা জিনিস তার অজান্তে এসে পড়ে...ব্যাপারটা একটু কমিক্যাল নয় কি?'

ফেলুদা দেখলাম বেশ গম্ভীর। বলল, 'কমিক্যাল কি না সেটা অবিশ্যি ঝট করে এই অবস্থায় বলা সম্ভব নয়। হতেও পারে, নাও হতে পারে। আপনি বরং আরেকটা ইনফরমেশন দিন। এটা কোথা থেকে বেরোল?'

এ প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল তিনি আবার হাসতে যাচ্ছেন। কিন্তু পরক্ষণেই যেন হাসিটাকে চেপে নিয়ে একটু জোর করে বেশি গম্ভীর হয়ে বললেন, 'আমার সুপুরির কৌটো থেকে।'

ব্যাপারটা একদিক দিয়ে দেখতে গেলে কমিক্যাল বটেই, কিন্তু আমারই হাসি পাচ্ছিল না। ফেলুদা বলল, 'কবে পেয়েছেন?'

হরিনাথবাবু বললেন, 'কালকে। একেবারে তলায় পড়েছিল।'

'সুপুরি আপনি নিয়মিত খান?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটা আমার একটা বাতিক।'

'কাল পেয়েছেন মানে কালকেই যে ওটা রাখা হয়েছে কৌটোতে তার কোনও মানে নেই?'

'মোটেই না! হয়তো যখন ভর্তি ছিল সেই সময় রাখা হয়েছে। কৌটো খালি হয়ে এলে পর ওটা আমার চোখে পড়েছে। সত্যি বলতে কী, চোখেও পড়েনি। অভ্যাস মতো আঙুল ঢুকিয়ে সুপুরি বার করতে গিয়ে প্রথমে হাতে ঠেকেছে। অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা লাগতে কৌটো হাতে নিয়ে ভিতরে চেয়ে দেখি মূর্তিটা দিব্যি চিত হয়ে পড়ে আছে। অথচ আমার সুপুরি আর কেউ শেয়ার করে না। আমার শোবার ঘরে চাকর এবং আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ আসেও না। চাকর বহুদিনের পুরোনো—চুরি চামারিও বাড়িতে কস্মিনকালে হয়েছে বলে মনে পড়ে না। এখন আপনিই বলুন—এর থেকে কী বুঝব।'

ফেলুদা ভুরু কুঁচকে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে সোফায় আরও ভাল করে হেলান দিয়ে বলল, 'আপনার এক কৌটো সুপুরি শেষ হতে কতদিন লাগে?'

'তা ধরুন—হিসেব তো করিনি—দিন পনেরো লাগে বোধহয়।'

'আপনার স্ত্রীই কৌটো ভরে দেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'শেষ কবে ভরেছিলেন মনে আছে?'

ভদ্রলোক চোখ বন্ধ করে একটু ভাবলেন। তারপর যখন চোখ খুললেন তখন তার চাহনিতে একটা নতুন ভাব লক্ষ করলাম।

'দিল্লি যাবার আগের দিন।'

'আপনি দিল্লি গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। আমার আপিসের কাজে। তিন দিনের জন্য।'

'প্লেনে না ট্রেনে?'

'গেছি প্লেনে, এসেছি ট্রেনে।'

'কবে?'

'কলকাতা থেকে গেছি ২২শে জুন। ওখান থেকে রওনা হয়েছি ২৫শে সকালে, ফিরেছি ২৬শে ভোরে।'

'সুপুরির কৌটোটা কী ভাবে নেন?'

'আমার একটা হাত ব্যাগ—মানে, ছোট অ্যাটাচি কেস আছে, তাতে।'

'ট্রেনে খাওয়া অভ্যেস আছে?'

'তা আছে। দিনে ৫-৬বার সুপুরি না খেয়ে পারি না। বিশেষ করে দুপুরের খাওয়া আর রাত্তিরের খাওয়ার পর তো খাই-ই।

'অন্য লোককে অফার করেন?'

'এমনিতে করি না—তবে লোকে চাইলে দিই নিশ্চয়ই।'

'ট্রেনে কেউ চেয়েছিল খেতে?'

'তা—হ্যাঁ—দু একজন যেন চেয়ে খেয়েছিল বলে মনে হচ্ছে।'

'সুপুরি খাবার পর কৌটো কি বাক্সে পুরে রেখেছিলেন?'

ভদ্রলোক আবার ভুরু কুঁচকে একটু ভাবলেন, তারপর বললেন, 'যদ্দুর মনে পড়ে—সিটের পাশে একটা টেবিলের মতো জিনিস

থাকে— তার উপরেই বোধহয় রেখেছিলাম। বাক্সে পরের দিন সকালে রাখি।'

এবার ফেলুদার ভাববার পালা। বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, 'আপনি কি এয়ার কন্ডিশনড ফার্স্ট ক্লাসে আসছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'চারটে বার্থ তো?'

'হ্যাঁ। চারটেতেই লোক ছিল।'

'সারা রাস্তা সেই একই চারজন এসেছেন?'

'বোধহয় একজন মাঝপথে কোথাও নেমে গিয়েছিলেন। এলাহাবাদে বোধহয়। কে কোথায় যাচ্ছে এ নিয়ে একবার কথা হয়েছিল। একজন অবাঙালি—বলেছিলেন যে তিনি বেনারসের।'

'দিল্লিতে কোথায় ছিলেন?'

'হোটেল। ভাল হোটেল। বেয়ারাগুলো বিশ্বস্ত বলেই জানি।'

'হুঁ।' ফেলুদা সোফা ছেড়ে উঠে দুবার পায়চারি করে বলল, 'মনে হয় ট্রেনে রাতের মধ্যেই আপনাদের কামরার বাকি তিনজনের কেউ আপনার সুপুরির কৌটোতে মূর্তিটা চালান দিয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে—কেন?'

হরিনাথবাবু একটু হেসে মিহি গলায় বললেন, 'সেইটে জানার জন্যই তো আপনার এখানে আসা। মূর্তিটা পাবার পর থেকেই একটা ভয় মনে ঢুকেছে—'

ভদ্রলোক থামলেন—আমরা তার দিকে চাইলাম।

'যদি সাময়িক কোনও বিপদ থাকায় কেউ চোরাই মাল পাচার করে থাকে—তা হলে তো সে মাল আবার উদ্ধার করতে আসতে পারে। তখন যদি আমার উপর...'

ভদ্রলোকের গলা যেন হঠাৎ শুকিয়ে গেল। কথাটা শেষ করার দরকার ছিল না—কারণ বুঝতে পারছিলাম উনি কী বলতে চাইছিলেন।

ফেলুদা আবার সোফায় বসে পড়ে বলল, 'সবচেয়ে আগে দরকার দুটো জিনিস জানা—এক হচ্ছে আপনার সহযাত্রীদের নাম ধাম, আরেক হচ্ছে এই মূর্তিটা মূল্যবান কি না। দ্বিতীয়টি বোধহয় আপনি

জানেন না। কিন্তু প্রথমটার ব্যাপারে কি আপনি কোনও সাহায্য করতে পারেন? অবিশ্যি রেল কোম্পানি তাদের বুকিং লিস্ট দেখে এ ব্যাপারে ইনফরমেশন দিতে পারে—কিন্তু তার আগে এই তিনজন সম্পর্কে আপনার কিছু মনে পড়ে না কি না সেটাও জানা দরকার।'

হরিনাথবাবু টাক চুলকে বললেন, 'ঘটনাটা তো খুব বেশিদিন আগের নয়, তাই তিনজনেরই চেহারা মোটামুটি মনে আছে। একজন বাঙালি ছিলেন—তার সঙ্গে অনেক কথা বলেছি আমি। বললেন বালিগঞ্জে থাকেন—কীসের জানি ব্যবসা আছে। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স—বেশ জোয়ান লোক। হাসলে দেখা যায় একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। নাম জানিনি—তবে তার সুটকেসটা সামনে বেঞ্চির তলায় দেখা যাচ্ছিল—যদ্দুর মনে পড়ে তাতে K.D. লেখা ছিল। আমি আর ইনি মিলেই দুটো লোয়ার বার্থ নিয়েছিলাম। ওপরে যে দুজন ছিলেন, তাদের একজন সারা রাস্তা কথাই বলেননি। ইন ফ্যাক্ট—লোকটিকে দেখে একটু গোলমেলে মনে হচ্ছিল। চশমা পরেন—তবে তার কাচের রং ঘোলাটে। গোঁফ আর জুলফিটার কথা মনে পড়ছে। ওপর থেকে দু-তিন বারের বেশি নেমেছেন বলে মনে পড়ে না। আর অন্যটি ইংরেজিতে কথা বলছিলেন। কোন দেশি লোক বলা শক্ত। বেশ সুপুরুষ চেহারা—বয়সও ত্রিশের বেশি না দেখে পশ্চিমা বলে মনে হল।'

'মাঝপথে কে নেমেছিলেন?'

'সেই পশ্চিমা ভদ্রলোকটি।'

'আর কালো চশমা?'

'তিনি নামলেন হাওড়ায়। গাড়ি থামবার অনেক আগেই মাল টাল বাইরের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।'

এর পরে আর বেশি কথা হয়নি। হরিনাথবাবু যাবার সময় বেশ কিন্তু কিন্তু ভাব করে ক্ষমা চাইলেন—'হয়তো বৃথাই আপনার সময় নষ্ট করলাম। আপনি নিশ্চয়ই ব্যস্ত মানুষ—আপনার আরও অনেক অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে...

আসলে ফেলুদা যে গোয়েন্দাগিরির কাজে সব সময় খুব ব্যস্ত তা মোটেই না। এমনিতে ও বলে যে খুব ইন্টারেস্টিং কেস না হলে ওর

নিতে ইচ্ছেই করে না—আর কেসও যে খুব একটা বেশি আসে তা নয়—তাই ও একটা আপিসে পার্ট টাইম চাকরিও করে। তবে ওর বন্ধুর আপিস বলে লক্ষ লক্ষ ছুটি চাওয়াও ওর পক্ষে খুব অসুবিধে নয়।

ফেলুদা বলল, 'আপনার ঘটনাটা যে ভারী অদ্ভুত তাতে কোনও সন্দেহ নেই—তবে ব্যাপারটা, যাকে এখনও বলে, খুব ধোঁয়াটে অবস্থায় রয়েছে। আমি এখনও এটাকে টেক-আপ করছি বলে বলব না—দু-একটা ইনফরমেশন নিয়ে তারপর আপনার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করব।'

হরিনাথবাবু সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছিলেন। তিনি এবার পকেট থেকে তার মানিব্যাগটা বার করে তার ভিতর হাতড়াতে লাগলেন। আমি ভাবলাম ফেলুদাকে বুঝি তিনি কিছু আগাম টাকা দেবেন, কিন্তু তার কথায় বুঝলাম তিনি অন্য জিনিস খুঁজছেন।—'কী আশ্চর্য—ভিজিটিং কার্ডগুলো গেল কোথায়?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল—'প্রয়োজন হবে না। আপনি যখন ট্যাক্সির ভাড়া দিচ্ছিলেন, তখন আপনার পকেট থেকে একটা কার্ড বেরিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। এই যে—'

ফেলুদা নিজের শার্টের পকেট থেকে একটা কার্ড বার করে দেখাল।

'বাকিগুলো বোধহয় আপনার পাঞ্জাবির পকেটে আছে—কারণ আপনার মানিব্যাগের পাশটা ছিঁড়ে এসেছে। এই বেলা ওটাকে চেঞ্জ করুন।'

সত্যিই ভদ্রলোকের পার্সের অবস্থা শোচনীয়। হরিনাথবাবু জিভ কেটে বললেন, 'যা বলেছেন। যাই হোক—ঠিকানা তো জানেন—টেলিফোনও ওতেই পাবেন। কোনও কিছু জানানোর থাকলে আমাকে ফোন করবেন। সকাল দশটার মধ্যে অথবা সন্ধ্যা সাতটার পরে ফোন করলেই পাবেন।'

'কিন্তু আরেকটা কথা'—ভদ্রলোক দরজার দিকে এগোচ্ছিলেন, ফেলুদা তাকে বাধা দিল। 'আপনার ওই মূর্তিটা ছাড়া তো চলবে না। ওটার মূল্যটা জানা দরকার। স্পেশালিস্টের কাছে যেতে হবে।'

ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ মূর্তির প্যাকেটটা ফেলুদাকে দিয়ে বললেন—'সত্যিই—ভারী ভুল হয়ে গেছে আমার। সত্যি বলতে কী—এটাকে

সরাতে পারলে আমার হয়তো কিছুটা নিশ্চিন্তই লাগবে।'

ফেলুদা বলল, 'সরানো মানে অবিশ্যি একদিনের জন্য। কালই আবার আপনি এটা ফেরত পাবেন।'

ভুবন সরকারের নাম ফেলুদার মুখে আগে কখনও শুনিনি, কাজেই তার বাড়িতে যাচ্ছি শুনে ফেলুদাকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম লোকটি কে।

'আর্টের একজন মস্ত সমঝদার আর সমালোচক। বিলেতেও নামডাক আছে। বৌদ্ধযুগের আর্ট সম্বন্ধে স্পেশালিস্ট। আমার মেজোমামার সহপাঠী। আর কিছু জানতে চাস?'

মাথা নেড়ে মিনমিনিয়ে বললাম, 'না—এই যথেষ্ট।'

আমাদের ট্যাক্সিটা লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়ে গিয়ে লর্ড সিনহা রোডে মোড় নিল।

'ওটা বুঝি বুদ্ধের মূর্তি?'

'তোর মুণ্ডু। বৌদ্ধ শিল্প মানেই কি বুদ্ধের মূর্তি? বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে কানেকটেড কোনও দেবতার মূর্তি হতে পারে না?'

এর পরে একেবারেই চুপ মেরে যেতে হল। মূর্তিটা জানি ফেলুদার প্যান্টের পকেটে রয়েছে। মনে মনে আরেকবার দেখতে ইচ্ছে করছিল—কিন্তু সাহস পেলাম না।

ভুবন সরকারকে দেখেই মনে হল তিনি একজন ভীষণ জ্ঞানী লোক—তা না হলে কপাল অত চওড়া হয় না, চশমার অত পাওয়ার হয় না, আর চুল ওরকম উসকোখুসকো হয় না। ভদ্রলোক তামাক খান, তার জন্যেই বোধহয় দাঁতগুলোতে ব্রাউন রং ধরে গেছে। ফেলুদাকে দেখেই বললেন, 'এসেছ। কই, কী মূর্তি দেখি—আজ আবার ইনস্টিটিউটে একটা লেকচার আছে।'

ফেলুদা বাক্স থেকে মূর্তিটা বার করে ভদ্রলোকের হাতে দিল।

ভুবনবাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন; মূর্তিটা হাতে পেয়ে একেবারে চোখের সামনে ধরেই ব্যস্তভাবে একটা টেবিলের সামনে গিয়ে দিনের আলোর উপরেই ল্যাম্প জ্বেলে চেয়ারে বসে মূর্তিটা ল্যাম্পের আলোয় ধরে সেটার উপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। এমনি দেখায় হল না

বলে দেরাজ থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে দেখলেন। দেখার সময় বিড়বিড় করে কী সব বললেন সেটা শুনতে পেলাম না—কিন্তু দেখা শেষ করেই যেটা বললেন সেটা বোধহয় দোতলার লোকেরাও শুনতে পেল—'ম্যাগনিফিসেন্ট। কোথায় পেলে এ জিনিস?'

ফেলুদা বলল, 'সেটা সিক্রেট। আগে জিনিসটা মূল্যবান কি না সেটা বলুন।'

ভদ্রলোক দাঁত খিঁচিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন, 'তুমি বলছ কী হে? তিব্বতি আর্টের এ একটা আউটস্ট্যান্ডিং অ্যান্ড রেয়ার

স্পেসিমেন। কীসের মূর্তি জানো তো এটা? যমন্তক। চৌত্রিশটা হাত, চারটে মাথা—কোনও সন্দেহ নেই। এত ছোট অথচ এত নিখুঁত তিব্বতি মূর্তি আগে কোনওদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না।'

ফেলুদা বলল, 'কোথাও যদি বিক্রি হয়—কীরকম দাম হবে এটার?'

'এ তো প্রাইসলেস!—শুধু পাথর বসানো সোনার জিনিস বলে নয়—এর ইউনিকনেস-এর জন্য। আমি বলছি এ জিনিস আর দেখিনি—তিব্বতি আর্ট আমি যত দেখেছি তত আর খুব বেশি বাঙালি দেখেছে বলে মনে হয় না। আমি নিজে লাদাখ গিয়েছি—পোটালা প্যালেসে লামার সঙ্গে দেখা করেছি—আর লামাদের সঙ্গে একসঙ্গে মড়ার খুলিতে চা খেয়েছি। ওয়াং চো-র পথে খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে আমার থাই-বোন ভেঙে যায়—তিব্বতি টোটকা ওষুধে হাড় আবার ম্যাজিকের মতো জোড়া লেগে যায়। তারপর—'

ভদ্রলোক প্রায় তিন মিনিট ধরে তিব্বতে আরও কী কী দেখেছিলেন আর করেছিলেন তাই বলে চললেন। সব শেষে বললেন যে এতদিন তিব্বতে থেকে তিব্বতের জিনিসপত্র দেখেও তিনি বলতে পারেন যে যমন্তকের এই খুদে মূর্তিটার মতো এমন অসাধারণ সুন্দর জিনিস তিনি আর দেখেননি।

১৯৬৯-এক খসড়া খাতা থেকে উপরের এই অসমাপ্ত লেখাটি উদ্ধার করা গেছে। কয়েক পাতা আগে উনি লিখে শেষ করেছিলেন 'শেয়াল দেবতা রহস্য' (যার প্রথম নাম ছিল 'ফেলুদা ও আনুবিস রহস্য' বা শুধু 'আনুবিস রহস্য')। সুতরাং, এ লেখা শেষ করলে সেটা আইন অনুযায়ী ফেলুদার পঞ্চম অ্যাডভেঞ্চার হবার কথা—যদিও গল্প না উপন্যাস তা এই অবস্থায় বলা মুশকিল। ১৯৭০ এ লেখা হল 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল'—১৯৭১-এ 'সোনার কেল্লা'—কিন্তু ১৯৭২, অর্থাৎ এই খসড়ার তিন বছর বাদে, ফেলুদার যে চতুর্থ উপন্যাসটি প্রকাশিত হল, তার সঙ্গে এই অসমাপ্ত লেখার এক আশ্চর্য মিল পাওয়া যাচ্ছে। ঠিকই ধরেছ 'বাক্স রহস্য'-র সেই সুপুরির কৌটো। কি কেউ কোনওদিন ভুলতে পারে?

আদিত্য বর্ধনের আবিষ্কার

'কোনও মানে হয়?' বললেন লালমোহনবাবু। 'হংকং পর্যন্ত দেখে এলুম, অথচ তাজমহল দেখলুম না এখনও।'

কথাটা সত্যি। দিল্লি গেছি সিমলা যাবার পথে, রাজস্থান যাবার পথে। কিন্তু আগ্রা যাওয়া হয়নি। আসলে আজকাল আমাদের কোথাও যাওয়া মানে একটা রহস্য ধাওয়া করে যাওয়া। আগ্রায় ফেলুদার কোনও কেস পড়েনি, তাই যাওয়া হয়নি।

ফেলুদা বলল, 'আপনার রেলওয়ে বুকিং আপিসে তো কে চেনা আছে বলেছিলেন—দেখুন না দিন দশেকের মধ্যে একটা ফোর-বার্থ কম্পার্টমেন্ট পাওয়া যায় কি না।'

'ফার্স্ট ক্লাস তো?'

'আমার তো অন্যতেও আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি ফার্স্ট ছাড়া ট্র্যাভেল করলে তো প্রেস্টিজ থাকবে না। বাংলার বেস্ট সেলিং রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক—সে কি আর থ্রি টিয়ারে যেতে পারে?'

'হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ—আপনি কথাও বলতে পারেন। না, সিরিয়াসলি বলছি—যাবেন আগ্রা?'

'হামিন অস্ত্ হামিন অস্ত্ হামিন অস্ত্—'

'সেটা আবার কী?'

'বিশ্বে যদি কোথাও স্বর্গ থেকে থাকে, তো সে এখানেই, এখানেই, এখানেই। তাজমহলের গায়ে ফারসি ভাষায় লেখায় আছে।'

লালমোহনবাবুর প্রতিবেশী রেলওয়ে বুকিং আপিসের কর্মচারী পরিতোষ হোড়ের দৌলতে সাতদিনের মধ্যেই আমরা রেলে রিজার্ভেশন পেয়ে গেলাম। রাত আটটার ট্রেন। আধঘণ্টা আগে গিয়ে

বইয়ের দোকান থেকে পথে পড়ার দু-একটা পত্রিকা কিনে কম্পার্টমেন্টে ঢুকে দেখি ঘর ভর্তি লোক। বুঝলাম যে যাচ্ছে একজনই, বাকি সব সি অফ করতে এসেছে। আমাদের দেখে অবিশ্যি একটা লোয়ার বার্থ খালি করে দেওয়া হল, আমরা হাতের জিনিসপত্র রেখে তাতেই পাশাপাশি বসলাম।

এর মধ্যে কোনজন যে যাত্রী সেটা কথাবার্তা থেকেই বোঝা গেল। বছর পঞ্চাশ বয়সের ভদ্রলোক, চোখে চশমা, চওড়া কপালের পিছন দিকে কাঁচা পাকা মেশানো ঢেউ খেলানো ব্যাকব্রাশ করা চুল। চেহারায় যেটার ছাপ আছে—প্রোফেসর বা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হলে আশ্চর্য হব না। কথাবার্তায় বুঝলাম ভদ্রলোক দিল্লি যাচ্ছেন একটা বক্তৃতা দিতে—কী বক্তৃতা তা অবিশ্যি বোঝা গেল না।

ফেলুদা আড়চোখে ভদ্রলোককে দেখছে, একবার ফিসফিস করে বলল, 'ব্যস্ত মানুষ। আপন ভোলা।'

'কী করে বুঝলে?'

ফিস ফিস করে উত্তর হল, 'ডান হাতের তিনটে নোখ কেটেছে—বাকিগুলো ভুলে গেছে। তার মানে অন্যমনস্ক। যে দুটো কাটেনি সে দুটো এত বড়—তা থেকে বোঝা যায় সময় পায়নি, অর্থাৎ ব্যস্ত।'

আমার কৌতূহল বেড়ে গেছে।

'আর কী বুঝলে?'

'আরগুলো তোরও বুঝতে পারা উচিত। যেমন ভদ্রলোকের পদবি বোস, বল, বর্মন, বর্ধন, ব্যানার্জি, ভট্টাচার্যি, ভৌমিক, বসাক, বটব্যাল বা ব্রহ্মচারী।'

ভদ্রলোকের সিটের তলায় একটা ভি.আই.পি-র হ্যান্ডেলের দুপারে 'এ. বি.' অক্ষরগুলো রয়েছে সেটা এবার চোখে পড়ল।

ট্রেন ছাড়ার পাঁচ মিনিট আগে কম্পার্টমেন্ট খালি হয়ে গেল।

লালমোহনবাবু উঠে বললেন, 'আমি কিন্তু আপার বার্থ নিচ্ছি।'

ফেলুদা বলল, 'আপনি প্রৌঢ় বয়সে কেন আর কষ্ট করে উঠবেন—'

'প্রৌঢ়!—আই অ্যাম ওনলি ফর্টি থ্রি! আর উপরে আমার ঘুমটা আরও ভাল হয়।'

'তথাস্তু।'

'দিল্লি যাচ্ছেন?' সহযাত্রী লালমোহনবাবুর দিকে ফিরে প্রশ্ন করলেন। বোধহয় বয়স ওঁর বেশি দেখে ওঁকেই আমাদের দলপতি ঠাউরেছেন।

'আগ্রা'—হেসে বললেন লালমোহনবাবু, 'আপনিও কি—'

'আমি আগে যাব দিল্লি—একটা বক্তৃতা আছে। তারপর আগ্রাই যাবার কথা আছে। এখনও তাজমহলটা দেখা হয়নি।'

'আরে, আমাদেরও তো ঠিক সেই ব্যাপার!'

'তাই বুঝি?'

ভদ্রলোক একটা ছোট ব্যাগ খুলে, তার থেকে একটা নোটবুক বার করলেন।

'এক্সকিউজ মি,' ফেলুদা বলল, 'ওই ব্যাগের ভিতরের পত্রিকা থেকে আপনাকে বৈজ্ঞানিক মনে হয়?'

'হ্যাঁ। আই অ্যাম এ কেমিস্ট।'

ফেলুদার ভুরু কুঁচকে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'সম্প্রতি কি খবরের কাগজে নাম উঠেছে?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'আদিত্য শেখর বর্ধন?'

ভদ্রলোক হেসে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন।

'আপনি তো নমস্য ব্যক্তি মশাই। আপনি পেট্রোলের একটা বিকল্প পদার্থ আবিষ্কার করেছেন না?'

'পদার্থ ঠিক নয় । সোলার পাওয়ার ব্যবহার করে পেট্রোলের কাজ চালানো যায়, এমন একটা ব্যাপার।'

লালমোহনবাবু হাঁ করে দুজনের কথা শুনছেন।

ফেলুদা বলল, 'আমার তো মনে হয় এটা একটা যুগান্তকারী ব্যাপার। কারণ পেট্রোলিয়ামও চিরটাকাল থাকবে না। পৃথিবীতে তেলের স্টক তো অফুরন্ত নয়। এমনকী মিডল ইস্টও নয়।'

'ঠিকই বলেছেন। এটা একটা আন্তর্জাতিক হেড-এক। তেল ফুরোলে কী হবে।'

'তা আপনি এই আবিষ্কারের পেটেন্ট নেননি? একটা ফরমুলা তো আছে নিশ্চয়ই।

'তা আছে বইকী। তবে এ তো আমাদের মাসখানেকের ব্যাপার। আমি রিসার্চ করছি আর তিন বছর ধরে।'

'কিন্তু আমার তো মনে হচ্ছে এটা একটা গোল্ড মাইন! ফরমুলাটা সাবধানে রেখেছেন তো? ওটা কিন্তু—'

ফেলুদার কথা শেষ হল না। একজন ভদ্রলোক আমাদের ঘরে এসে ঢুকেছেন। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, আর মানানসই রকম চওড়া, পাকানো গোঁফ, ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি।

'দুজন এমিনেন্ট লোক এক কম্পার্টমেন্টে ট্র্যাভেল করছেন শুনে দেখতে এলাম।'

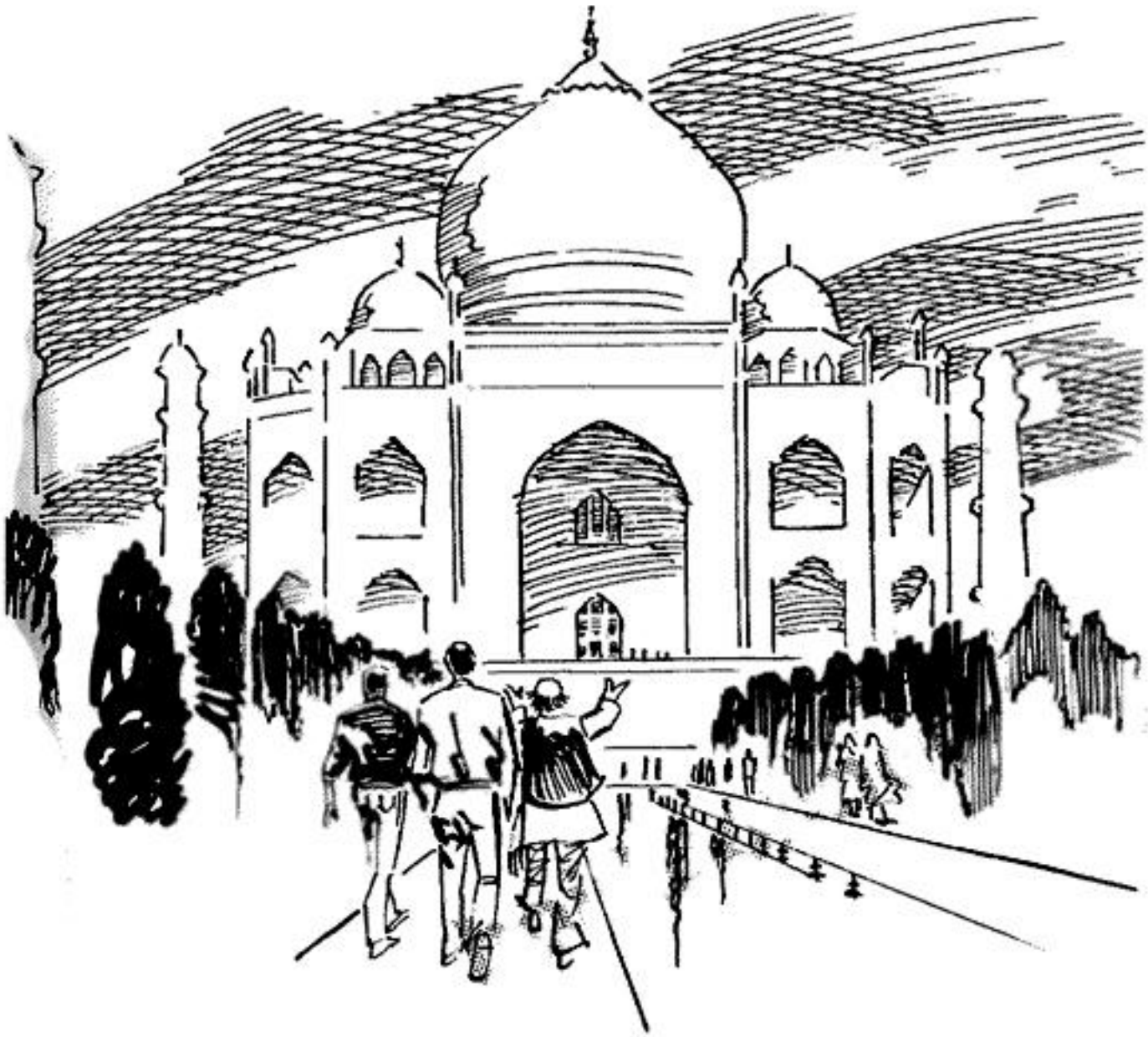

একী! লোকটা ফেলুদাকে চেনে নাকি? নাকি লালমোহনবাবুকে?

'মে আই সিট ডাউন?'

'নিশ্চয়ই।'

মিস্টার বর্ধন তাঁর বাক্সটা সরিয়ে জায়গা করে দিলেন। নতুন ভদ্রলোকটি ইংরিজি মিশিয়ে হিন্দি টানে বাংলা বলেন।

'আমি আপনাদের চিনি না, পাশের বোগিতে এক ভদ্রলোক বললেন আপনাদের কথা। দি কোয়েশ্চন ইজ—কে সাহিত্যিক আর কে ডিটেকটিভ?'

মিঃ বর্ধনও অবাক। 'আপনি কি ডিটেকটিভ নাকি?' ফেলুদার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ওটাই আমার পেশা। আমার নাম প্রদোষ মিত্র। ইনিও এঁর লাইনে কম বিখ্যাত নন। মিঃ গাঙ্গুলী—রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখেন।'

'হেঁ হেঁ।'

'হাউ ইন্টারেস্টিং,' বললেন মিঃ বর্ধন। 'বুঝেছি—তাই জন্যেই সাবধানতার কথা বলছিলেন। আপনার বোধহয় ওই সব ফরমুলা চুরির ব্যাপারে অভিজ্ঞতা আছে?'

'তা অল্পবিস্তর আছে, মিঃ বর্ধন।'

আগন্তুক ভদ্রলোক বোধহয় মনে করলেন এবার তাঁর পরিচয়টাও দেওয়া উচিত। হয়তো তাঁর লাইনে তিনিও কিছু কম বিখ্যাত নন।

'মাই নেম ইজ যোগীন্দর রাঠোর। আমার কারবার আছে দিল্লিতে—জুয়েলারি। আপনার বিষয় আমি পেপারে পড়ছিলাম। ভেরি ইন্টারেস্টিং। আই থিংক ইউ উইল বি এ রিচ ম্যান সুন!'

'জানি না', হেসে বললেন মিঃ বর্ধন। 'এমনও হতে পারে যে এ জিনিস আগেই আবিষ্কার হয়ে গেছে। সেক্ষেত্রে আমার ফরমুলার আর কোনও মূল্যই থাকবে না। এই টেকনোলজির যুগে বৈজ্ঞানিকরা তো আর বসে নেই।'

'এনিওয়ে,'—মিঃ রাঠোর উঠে পড়লেন, 'যদি আপনার ফরমুলা বিক্রি করার কথা ভাবেন, দেন থিংক অফ মি ফার্স্ট! হে হে—আমার অফার রইল!'

মিঃ রাঠোর চলে যাওয়াতে কামরাতে হঠাৎ যেন জানাজানি বেড়ে গেল।

'আপনি তো খদ্দের পেয়ে গেলেন মশাই,' বললেন লালমোহনবাবু।

মিঃ বর্ধন হেসে বললেন, 'খদ্দের এখানে কেন? বাইরে থেকেও এনকোয়ারি এসেছে। দুটো অ্যামেরিকান কেমিক্যাল ফার্ম। আমি সামনের মাসেই স্টেট্‌সে যাচ্ছি। তারপর দেখা যাক কী হয়।...আপনারা কোথায় উঠছেন আগ্রায়?'

'আগ্রা হোটেল', বলল ফেলুদা।

'প্রোফেশনালি হয়তো আপনার সঙ্গে দেখা করার কোনও প্রয়োজন হবে না—আশা করি না—তবে আমি আগ্রা যাব শনিবার। থাকব ক্লার্কে। যদি ফাঁক পান একবার চলে আসবেন। ওখানে আমার কোনও কাজ নেই—তাজমহল, ফতেপুর সিক্রি—এইসব দেখার জায়গাগুলো একটু দেখব আর কী। সঙ্গী পেলে ভালই লাগবে। আর আপনি চিন্তা করবেন না মিঃ মিত্র। আপনি গোয়েন্দা, তাই বোধহয় চতুর্দিকে ক্রিমিন্যাল দেখতে পান। আমার ফরমুলা নিরাপদেই থাকবে।'

১৯৮৩

১৯৮৩ সালের এক খাতা থেকে ফেলুদার এই অসমাপ্ত খসড়াটা পাওয়া গেছে। খাতা শুরু হয়েছে তারিণীখুড়োর এক কাহিনী দিয়ে (তারিণীখুড়ো ও বেতাল)। অন্যান্য লেখার মধ্যে আছে—'সাধনবাবুর সন্দেহ' (গল্প), 'আশ্চর্যজন্তু' (শঙ্কু), 'মানপত্র' (গল্প), 'গগন চৌধুরীর স্টুডিও' (গল্প), 'জাহাঙ্গীরের স্বর্ণমুদ্রা' (ফেলুদা), 'অপুর সঙ্গে আড়াই বছর' (প্রবন্ধ) ও 'এবার কাণ্ড কেদারনাথে' (ফেলুদা)।

কল্পা

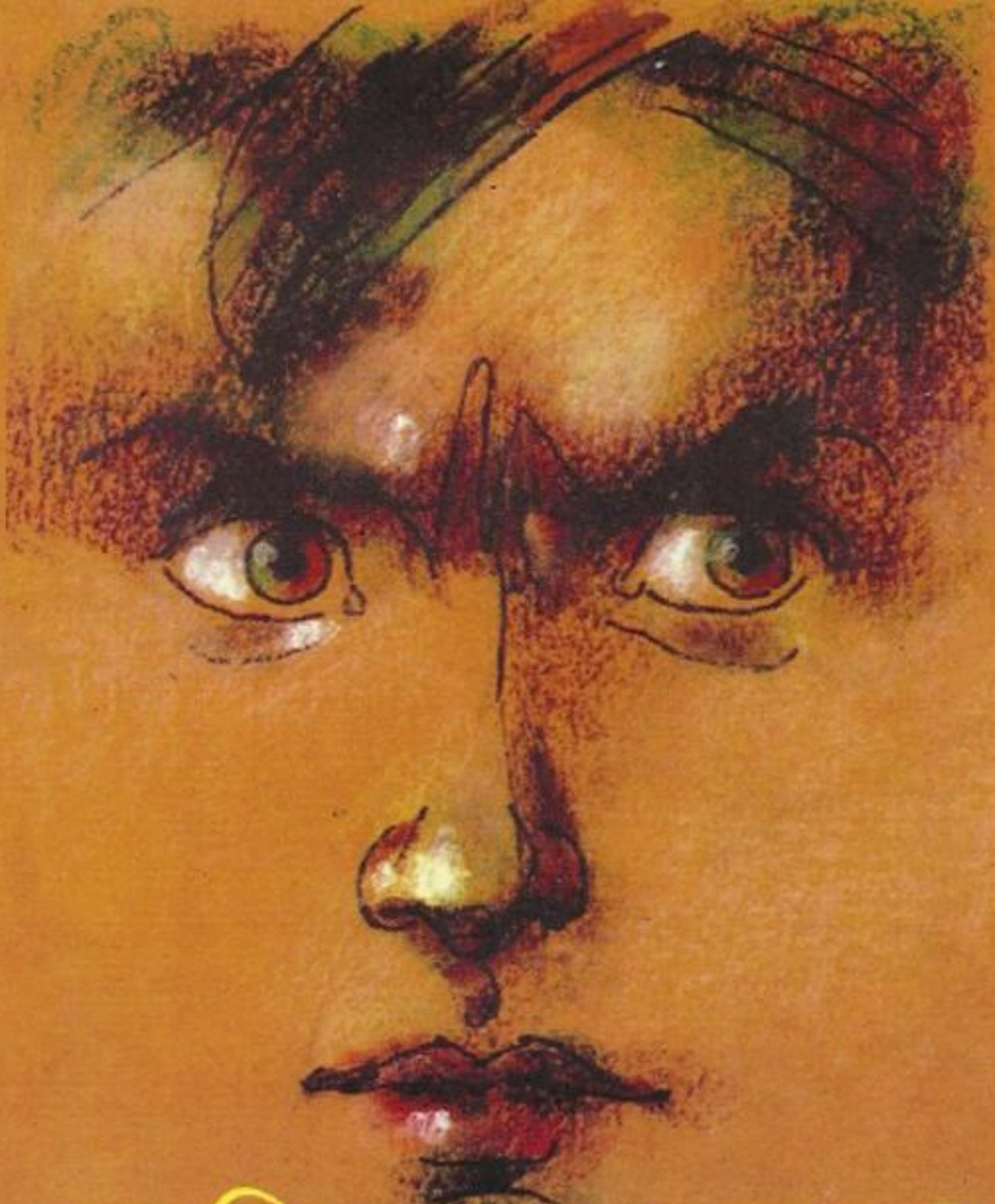

আমি আর ফেলুদা

সন্দীপ রায়

আমি আর ফেলুদা

সন্দীপ রায়

অনুলিখন

সেবাব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেলুদার স্রষ্টাকে

গোড়ার কথা

ফেলুদার ছবির শুটিংয়ের নানা মজার কাহিনি নিয়ে বাবা দুটো প্রবন্ধ লিখেছিলেন সন্দেশ পত্রিকার জন্য। 'উট বনাম ট্রেন' এবং 'ফেলুদার সঙ্গে কাশীতে'। পরে 'একেই বলে শুটিং' বইয়ে ওই দু'টি রচনা সংকলিত হয়। 'সোনার কেল্লা' এবং 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবি নিয়ে লেখা এই দুটি প্রবন্ধই কিন্তু সচেতনভাবে পুরোপুরি শুটিংয়ের বিবরণ। অর্থাৎ ফেলুদার গল্প লেখার 'ব্যাকগ্রাউন্ড' সেখানে গরহাজির। আমার তাই বহুদিন ধরেই মনে হত, চলচ্চিত্রের পাশাপাশি ফেলুদার সৃষ্টি ও তার বিভিন্ন কাহিনি রচনার নেপথ্যকথা যদি কোথাও একসঙ্গে বলা যায়, ফেলুদা ফ্যানদের কাছে সেটা একটা অত্যন্ত মূল্যবান সংগ্রহ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে লেখার কাজটা সময়-সুযোগের অভাবেই হয়ে উঠছিল না।

এর পরে আমি নিজেই ফেলুদাকে নিয়ে ছবি তৈরি করতে শুরু করি। প্রথমে টেলিফিল্ম, টিভি সিরিজ এবং তারপর পুরোদস্তুর চলচ্চিত্র। বাবার তৈরি ফেলুদার শেষ ছবি 'জয় বাবা ফেলুনাথ' মুক্তি পাওয়ার সিকি শতাব্দীরও বেশি সময় পরে 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' কাহিনি অবলম্বনে আমার ছবিটা রিলিজ করে। এর আগে ফেলুদাকে নিয়ে টেলিভিশনের জন্য তোলা আমার সমস্ত ছবিই বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু বোম্বাইয়ের বোম্বেটের দুর্দান্ত সাফল্য আমাকেও স্তম্ভিত করে দেয়। ফেলুকে নিয়ে আরও কয়েকটা ছবি তৈরির কথা এর পরেই আমি ভাবতে বসি।

প্রায় সেই সঙ্গেই আরও একটা ঘটনা ফেলুদাকে নিয়ে আমার বই লেখার পুরনো পরিকল্পনাটাকে আবার চাঙ্গা করে তোলে। সুখী গৃহকোণ পত্রিকার তরফ থেকে ফেলুদার কাহিনি ও চলচ্চিত্র তৈরির নেপথ্যকথা ধারাবাহিকভাবে লেখার প্রস্তাব আসে। সেই সময়টা সদ্য বোম্বাইয়ের বোম্বেটে রিলিজ করেছে, বেশ ব্যস্ততা ছিল। লিখতে বসার সময় নেই বললেই চলে। তাই ঠিক হয় ফেলুদা নিয়ে যাবতীয় তথ্য ও ঘটনা আমি যতটা সম্ভব স্মরণ করে কাউকে বলব, ধারাবাহিকটা আমার হয়ে লিখবেন তিনি। বিদেশে এইভাবে ভূরিভূরি বই লেখা হয়। তবে ফেলুদাকে নিয়ে এইভাবে লেখার ক্ষেত্রে আমার মনে বেশ সংশয় ছিল। ভয় একটা কারণেই, লেখার বিষয় ফেলুদা। আমার কাছ থেকে সব শুনেটুনেও লেখক মশাই যদি তাঁর কাজে ভুল করতে থাকেন, যদি বিষয়টায় তাঁর উৎসাহ না থাকে, তবে ফেলু-ভক্তদের যাবতীয় অভিশাপের শিকার আমাকেই হতে হবে, কারণ লেখাটা বেরোবে আমার নামে। কী করা যায়?

শেষে যা থাক কপালে বলে ঝুঁকিটা নিয়েই নিলাম। কারণ আমার বারবার মনে হচ্ছিল, ফেলুর 'এই বয়সেও' যখন এতটা 'পুল' রয়েছে, তখন স্রেফ ফেলু-ভক্তদের মুখ চেয়েই এই লেখাটায় হাত দেওয়া উচিত। অবশ্য অনুলিখনের কাজটা যিনি করতে এলেন, তাঁকে

দেখে একটা ব্যাপারে ভরসা হল। কেমন লেখেন তা না জানলেও, তিনি যে একজন উৎসাহী ফেলু-ভক্ত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না।

ওঁকে আমি চিনি সেই বাক্স রহস্য টেলিফিল্ম তৈরির সময় থেকেই। সেই সময়ে একটা বাংলা ওয়েব-ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে উনি আমার কয়েকটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। পরে আমাকে টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করেন, লেখাগুলোকে সাক্ষাৎকারের আদলে তৈরি না করে আমার বাইলাইনেই পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের আকার দিলে কেমন হয়? আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। কেন দিয়েছিলাম মনে পড়ে না। সম্ভবত প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য লেখা হলে এতটা স্বাধীনতা চট করে কাউকে দিতাম না। ওয়েব-ম্যাগাজিনের পাঠক সংখ্যা তখন অত্যন্ত কম। পুরোটাই অনাবাসী রিডারশিপ। অনুলেখক ভুলচুক করলেও খুব বেশি লোকের চোখে পড়বে না, ফেলু-ভক্তদের তো নয়ই, সম্ভবত এমনই কোনও যুক্তি মাথায় ছিল। পরে কিন্তু লেখাগুলো পড়ে দেখেছিলাম, উৎরে গেছে। এর চেয়ে বেশি প্রত্যাশা ছিল না, কারণ ওয়েব ম্যাগাজিনটা হাত খুলে লেখার জায়গা নয়। সেই লেখাগুলো বেরিয়েছিল 'ফেলুদা আর আমি' শিরোনামে। অর্থাৎ এই বইয়ের যে নাম, তার ঠিক 'মিরর ইমেজ'! তখন বোধ হয় মোট চারটে পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই একই অনুলেখক, অর্থাৎ সেবাব্রতকে এবারেও দেখে কিছুটা নিশ্চিন্ত হই। তবে এবারে কাজটা অনেক বড় ছিল। ফেলুদাকে ঘিরে অনেক বেশি তথ্য ও ঘটনা আমাকে স্মরণ করতে হয়েছে। সময় দিতে হয়েছে প্রচুর। রীতিমতো রিসার্চই করা হয়েছে বলা যায়। লেখার ক্ষেত্রেও উনি আমার নিজের লেখা ও কথা বলার ভঙ্গি রীতিমতো তুলে এনেছেন। ফেলুদার সমস্ত গল্প ও উপন্যাসের সম্পদ যে অলংকারহীন স্মার্ট বাংলা গদ্য, সেই ভাষাকেও যতদূর সম্ভব অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন।

ধারাবাহিকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। গত বছরই এটি বইয়ের আকারে সংকলিত হতে পারত। কিন্তু এই ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসেই ফেলুদা সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। অর্থাৎ এ বছরেই হল ইভেন্ট—ফেলুদা ফর্টি। এ বছরটা স্মরণীয় করে রাখতে ফেলুদার 'টিনটোরেটোর যীশু' উপন্যাসটা নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরিতে হাত দিচ্ছি। ইভেন্টের অঙ্গ হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে এই বইটাও। এখন পাঠকদের ভাল লাগলেই যাবতীয় উদ্যোগ সার্থক হয়।

সন্দীপ রায়

১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড
কলকাতা
ডিসেম্বর, ২০০৫

আমি আর ফেলুদা

সূচি

কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কাঃ হিন্দি ফেলু বাংলায় ফেল ১
বাক্স রহস্যঃ টাফ্‌ ফেলুর পয়লা টক্কর ৮
একমেবা স্টান্ট মাস্টার ১৮
জটায়ু'রা ২২
মগনলাল মেঘরাজ! ৩৫
বোম্বাইয়ের বোম্বেটেঃ ট্রেনের সঙ্গে ফের দৌড় ৪২
ছবি তুলতে কত তোড়জোড় ৪৭
বাবা আর ফেলুদা ৫৪

সোনার কেল্লার ক্লাইম্যাক্সে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। 'ফেলুদা' নামটা শুনলেই বাবার আঁকা ইলাস্ট্রেশনের পাশাপাশি এই ছবিটাই প্রথম চোখে ভাসে।

কাঠমান্ডুর রাস্তায় বাঙালির অতি প্রিয় 'ট্রায়ো'। অলংকার, শশী এবং মোহন আগাসে। তবে কম্বিনেশনটা ক্লিক করেনি। ছবির ভাষা হিন্দি হওয়াটাও ব্যর্থতার বড় কারণ।

কাঠমাণ্ডুর হোটেলে শশী কাপুর ও অলংকার। ফেলুদা ও তোপসের ভূমিকায়।

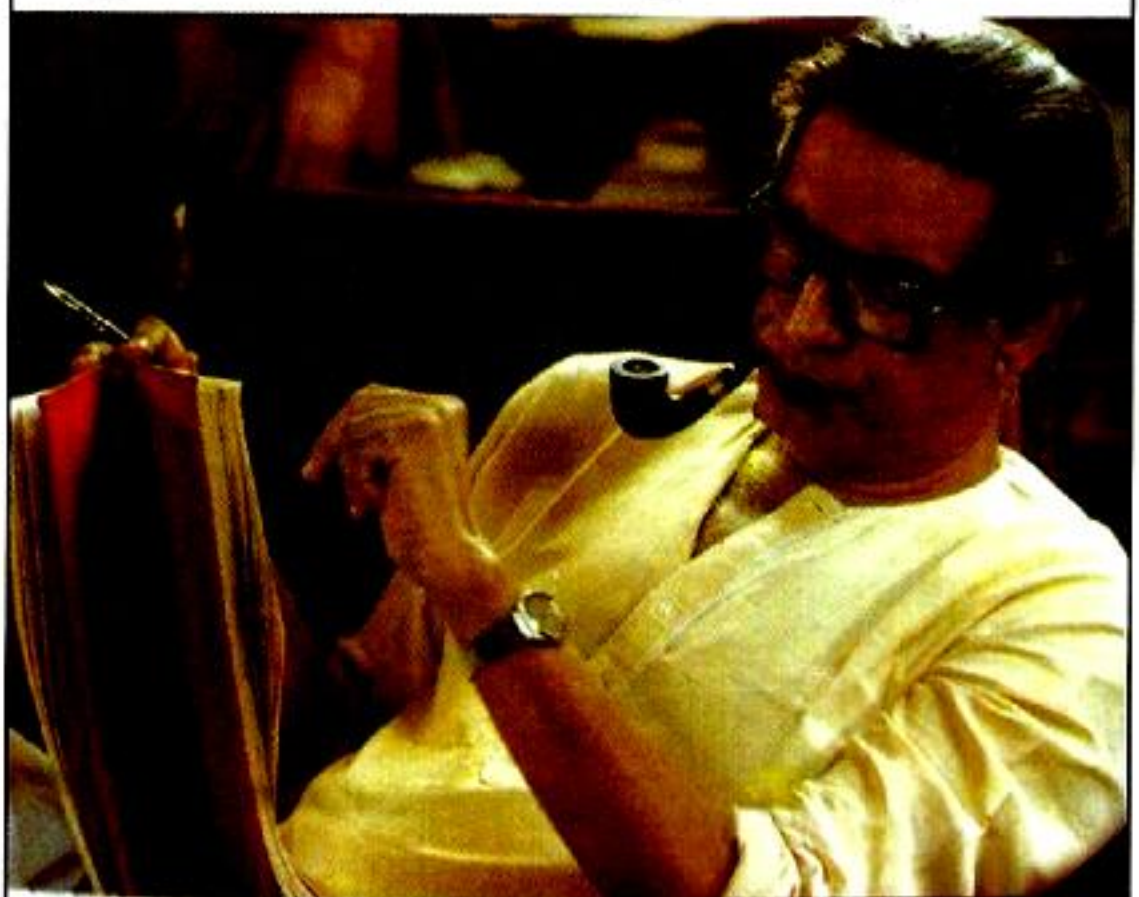

অতি পরিচিত ভঙ্গিতে বাবা। বাবার ঘরে ঢুকলে এই দৃশ্যটার অনুপস্থিতিই চোখকে পীড়া দেয়। চিরকাল দেবে।

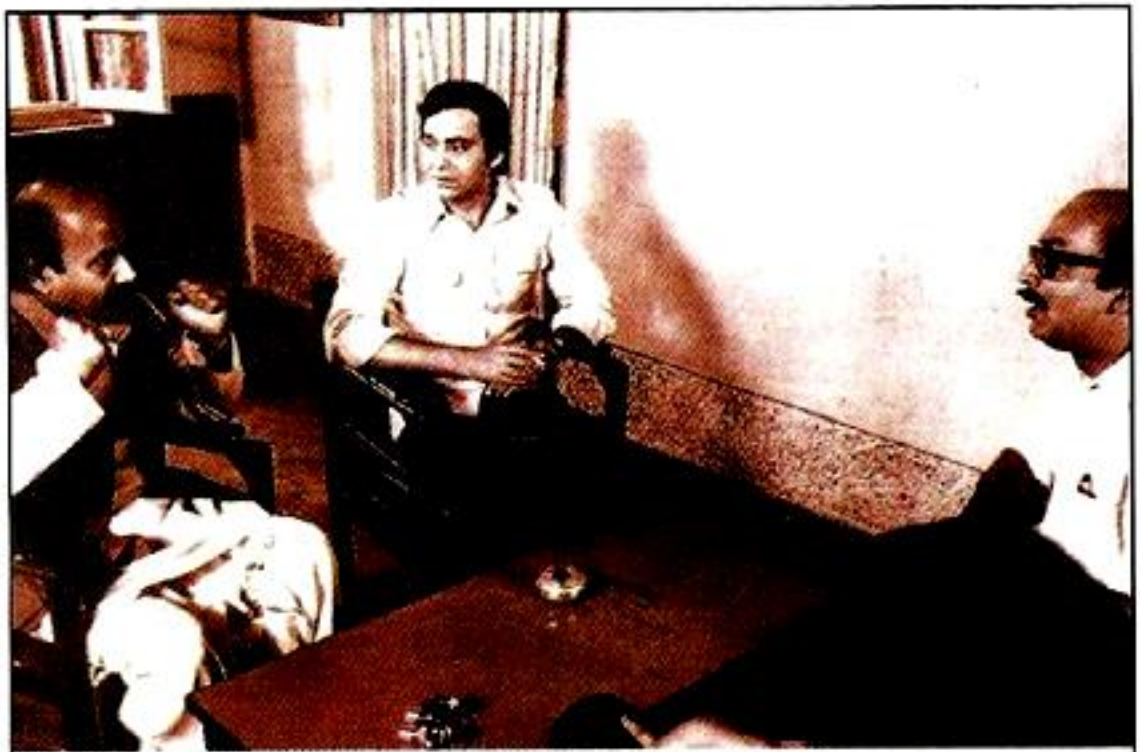

সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে ফেলুদার সাফল্যের পিছনে অনেকটা অবদান জটায়ুর। আবার জটায়ুর চরিত্রে সন্তোষদা ছাড়া অন্য কাউকে ভাবাটাও শক্ত। সন্তোষদার অভিনয় পরের জটায়ুদের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ খাড়া করে দিয়েছে।

জটায়ুর ভূমিকায় মোহন আগাসে চেষ্টা করেছিলেন আপ্রাণ। কিন্তু ফেলু-ভক্তরা তাঁকে মেনে নেননি।

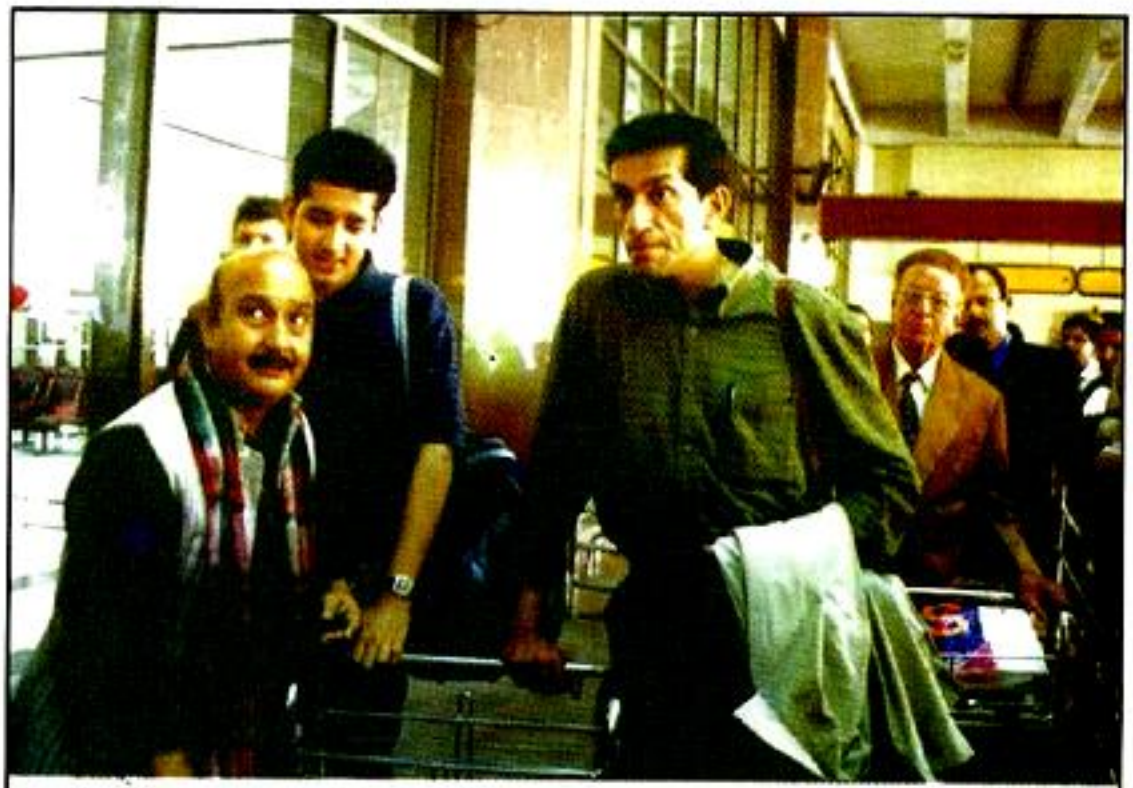

বাবার ছবির চেনা ছকের বাইরে সুপারহিট ত্রয়ীর 'ডেবিউট'। সব্যসাচী, পরমব্রত এবং বিভুদা। বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ছবিতে।

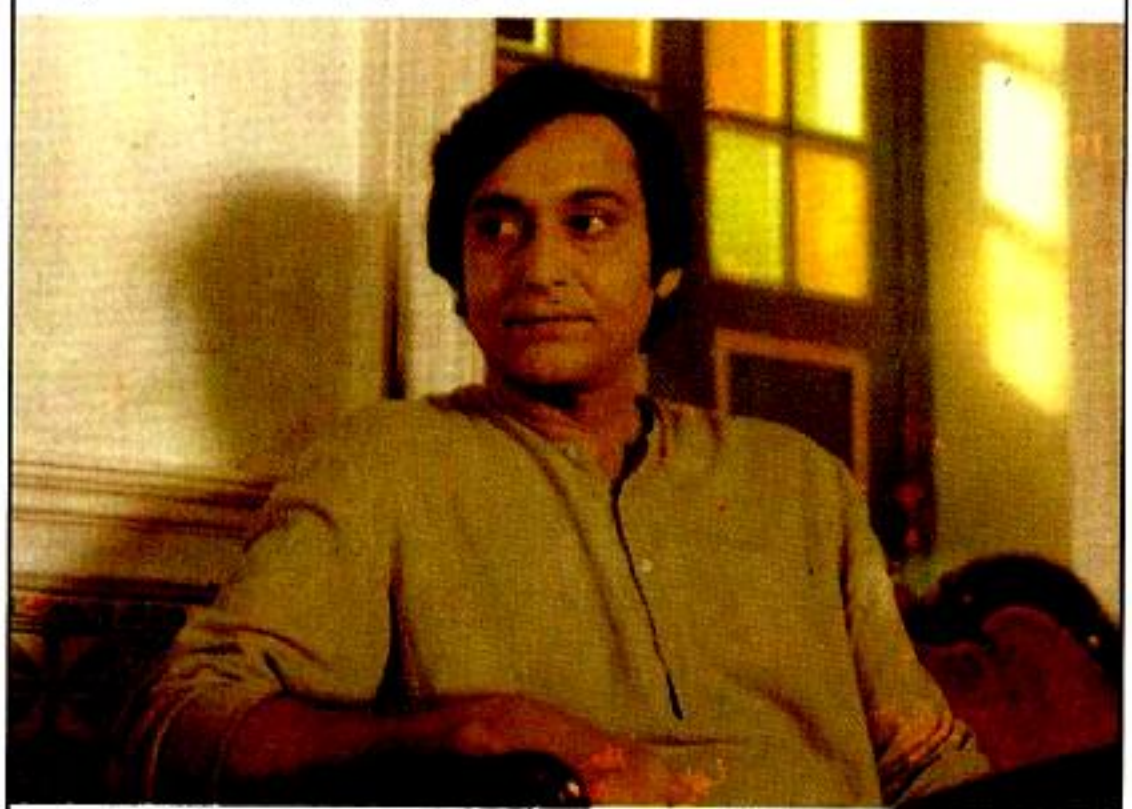

শুধু গোয়েন্দা নয়, ফেলুর চরিত্রে আপাদমস্তক বাঙালি এক অত্যন্ত বুদ্ধিমান যুবকের কথা ভেবেছিলেন বাবা। চরিত্রায়নেও যথার্থ সৌমিত্রকাকা।

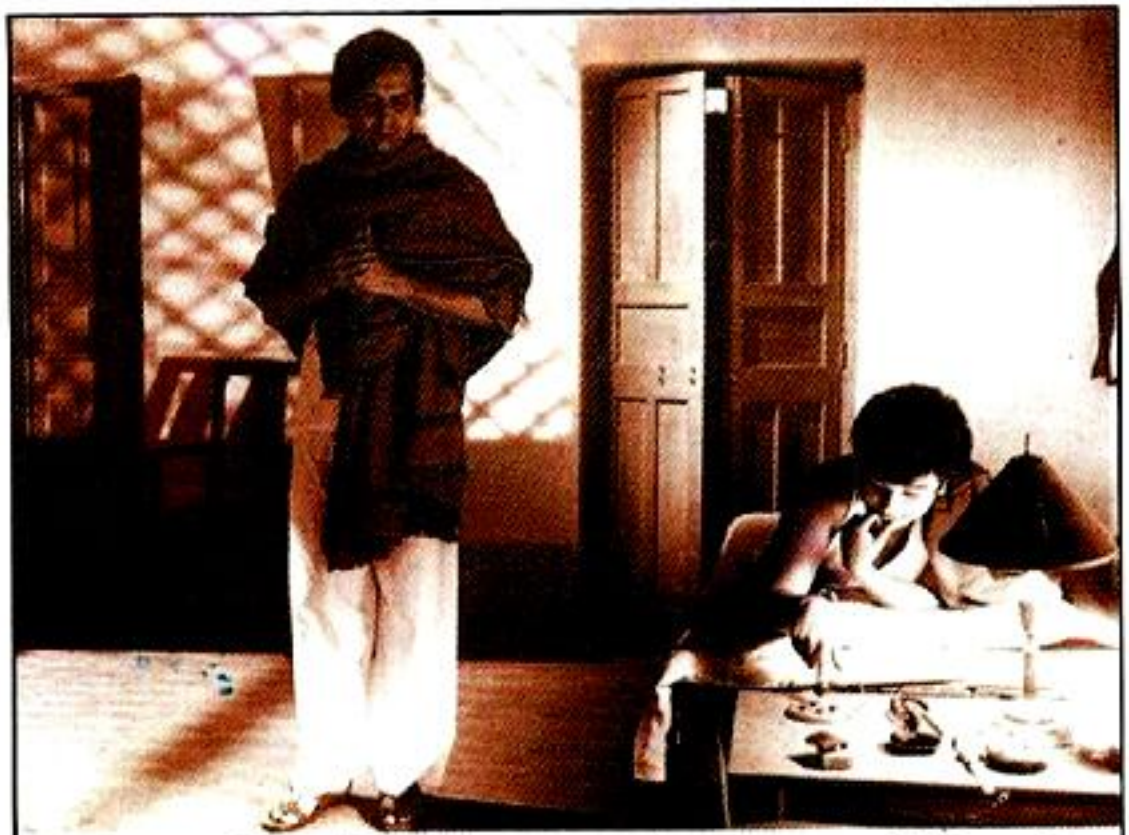

বাঙালিয়ানায় অদ্বিতীয়। কিন্তু এই প্রজন্মের পছন্দের ফেলুর মধ্যে যতটা 'টাফনেস' থাকা দরকার, ততটা সৌমিত্রকাকার মধ্যে ছিল কি?

কারিগরি প্রকৌশল 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' ছবিতে যতটা ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনটা ফেলুদার আগের কোনও ছবিতে আসেনি। সেটা সম্ভবও ছিল না অবশ্য।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ছবিতে ট্রেন আর ঘোড়ার দৌড়ের দৃশ্যের শুটিংয়ের তোড়জোড়। চিত্রগ্রহণের সময়ে সোনার কেল্লা ছবির উট আর ট্রেনের দৌড়ের দৃশ্যটার কথা আমার বারবার মনে পড়ছিল।

মগনলাল মেঘরাজ। উৎপল দত্ত ছাড়া আর কাউকে ভাবা যেত কি?

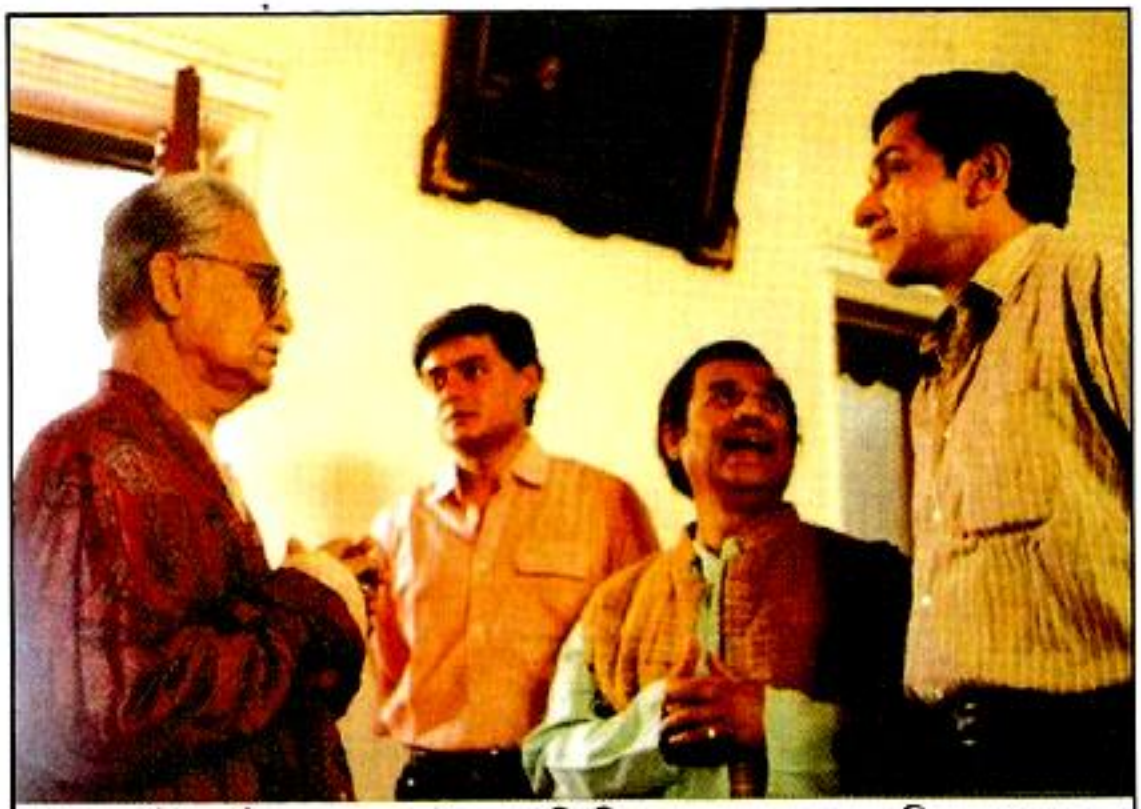

জটায়ুর চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টায় খামতি ছিল না অনুপকুমারের। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্য বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

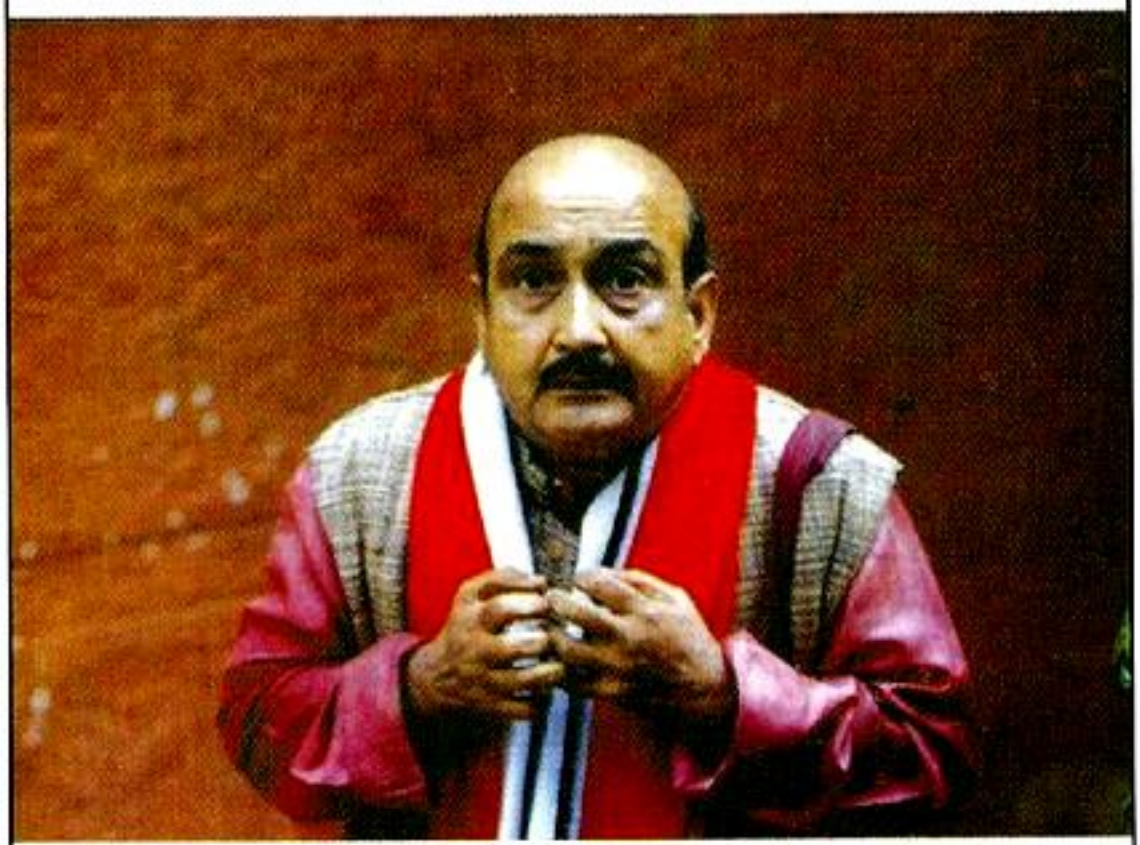

বিভুদার চেহারাটা জটায়ুর চরিত্রে মানানসই।

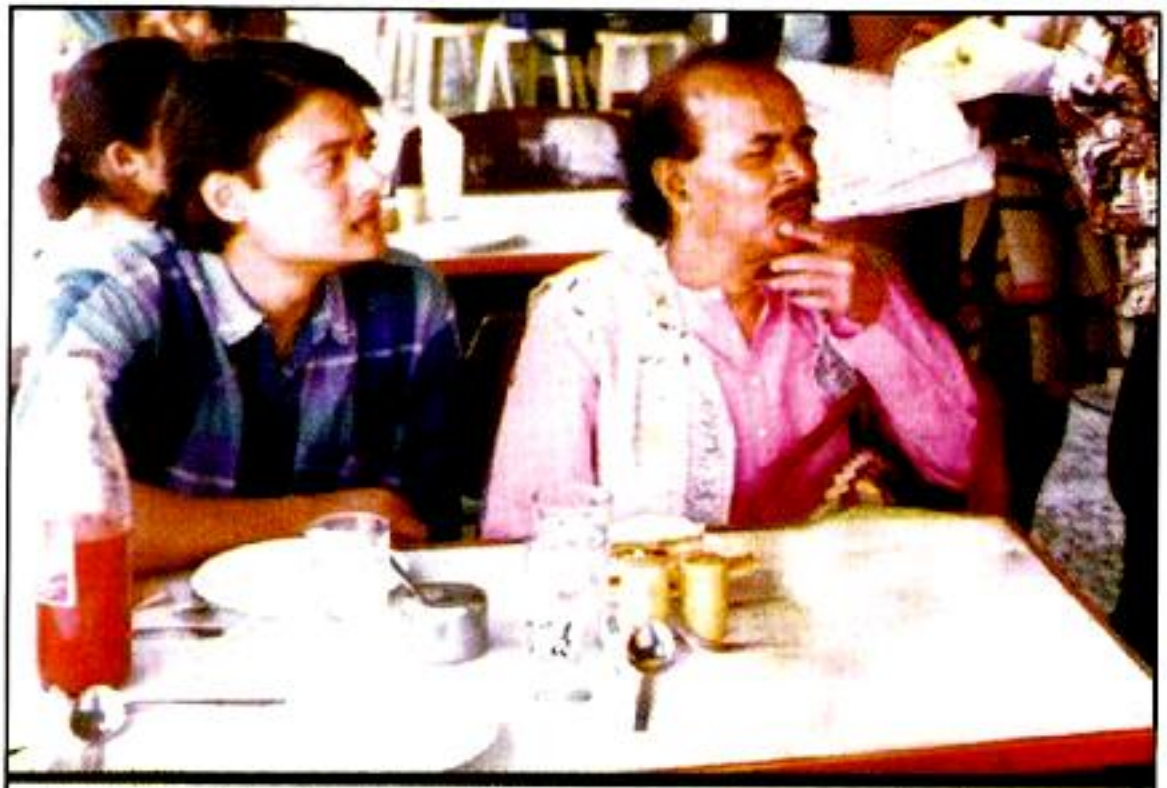

বেঁচে থাকলে রবিকাকাই জটায়ুর ভূমিকায় সন্তোষদার অভাব অনেকটা ভুলিয়ে দিতে পারতেন।

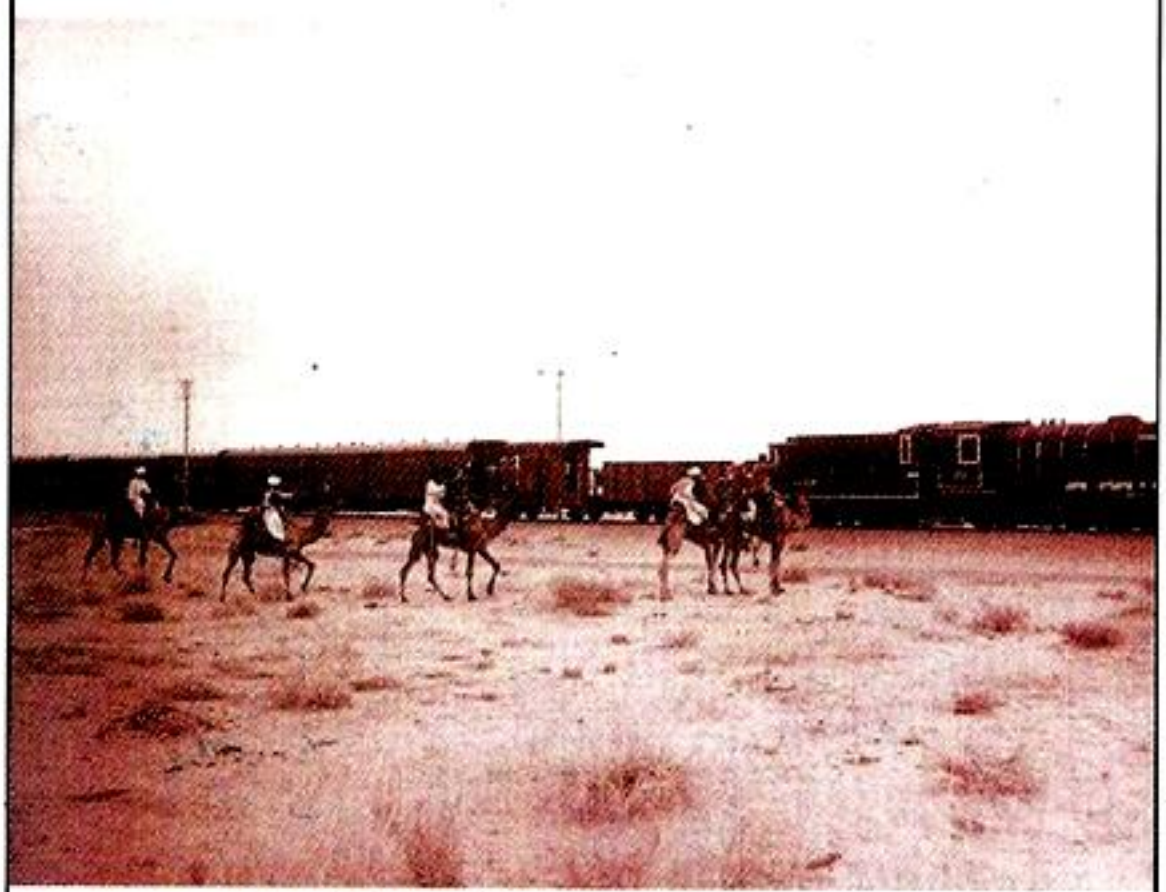

সোনার কেল্লা ছবির সেই বিখ্যাত উট বনাম ট্রেন ছবির দৃশ্য।

কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কা
হিন্দি ফেলু বাংলায় ফেল

আর্থার কনান ডয়েলের অমর গোয়েন্দাচরিত্র শার্লক হোম্‌সকে যে ফেলুদা 'গুরু' বলে মানত, সেটা বাবা একদম সরাসরি 'লন্ডনে ফেলুদা' কাহিনিতে লিখেই দিয়েছেন। লন্ডনে তদন্তে গিয়ে বেকার স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে ফেলুদা বলছে, গুরু তুমি ছিলে বলেই আমরা আছি। আজ আমার লন্ডনে আসা সার্থক হল।' ফেলুদার চরিত্রে, তার তদন্তের পদ্ধতিতে শার্লক হোম্‌সের ছাপ যে আছে, সেটা আর নতুন করে বলে দেওয়ার দরকার হয় না। বিশেষ করে শার্লক হোম্‌সের 'অবজার্ভেশনে'র ব্যাপারটা—স্রেফ একটা মানুষের চেহারা দেখে তার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক কিছু বলে দেওয়ার ক্ষমতাটা ফেলুদাও রপ্ত করে দুর্দান্তভাবে। ফেলুদার দ্বিতীয় কাহিনি 'বাদশাহী আংটি' থেকেই বাবা এই 'অবজার্ভেশনের' ব্যাপারটা আনতে শুরু করেন, যদিও প্রথম কাহিনি 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'তে তার কয়েকটা ইঙ্গিত ছিল।

অবজার্ভেশনের ক্ষমতাটা ছাড়াও, শার্লক হোম্‌সের আরও একটা প্রভাব যে ফেলুদার মধ্যে ভীষণভাবে রয়েছে, সেটা আমার প্রায়ই মনে হয়। গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি হোম্‌সের দৈনন্দিন অস্তিত্বটাকেও কনান ডয়েল নিপুণভাবে ফুটিয়েছেন। হোম্‌সের কথা বলার ধরন, পড়াশোনা, খাদ্যাভ্যাস কিংবা তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা বা একাগ্রতার ছবিটা যেভাবে আঁকা হয়েছে তা এককথায় অনবদ্য। ভিক্টোরিয়ান যুগে ব্রিটিশরা যে মানসিক উৎকর্ষের জায়গাটায় পৌঁছেছিল, হোম্‌স যেন তারই একটা জলজ্যান্ত নিদর্শন। ফেলুদাকেও আমার ঠিক তেমনই মনে হয়। শুধু একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ নয়, ছয় এবং সাতের দশকে শিক্ষিত, শহুরে আধুনিক বাঙালি যুব সমাজের প্রতিনিধি যেন সে। আর তার কাহিনিগুলোও যেন আধুনিক বাঙালি জীবনের একটা বিশেষ সময়ের প্রতিচ্ছবি। বাবা যে তাঁর নিজের চরিত্র, রুচি, অভ্যেস এবং নানা গুণের অনেকটাই গোয়েন্দাকে ধার দিয়েছিলেন, সেটা এখন অনেকেই জানেন। এখানে বলব, ফেলুদাকে নিয়ে আমার প্রথম ছবিতে তার

বাঙালিয়ানার ব্যাপারটা কেন ধরে রাখা যায়নি, এবং তার ফলে আমাদের ঠিক কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

ফেলুদাকে নিয়েই আমি আমার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবিটা করব বলে ভেবেছিলাম। সোনার কেল্লা এবং জয় বাবা ফেলুনাথ, বাবার এই দুটো ছবির নির্মাণেই একেবারে গোড়া থেকে আমি ভীষণভাবে জড়িয়ে ছিলাম। ফেলুদার কোনও নতুন গল্প লেখা হলে সেটা আমাকে আর মা'কেই আগে পড়ে শোনাতেন বাবা। আমাদের কোনও অংশে আপত্তি থাকলে সেটা বলতাম। কখনও কখনও বাবা আমাদের পরামর্শ গ্রহণও করতেন। ফেলুদার ছবি দুটো তৈরির সময়েও আমি বাবাকে কিছু কিছু বিষয়ে আমার ভাবনাচিন্তার কথা বলেই থাকতাম। ফেলুদার গল্প ও ছবির এই প্রভাবটার জন্যই বোধহয় নিজের পরিচালক জীবনের শুরুটা তাকে বাদ দিয়ে ভাবতে পারিনি। কিন্তু ইচ্ছেটা শেষ পর্যন্ত আর বাস্তব হয়ে ওঠেনি।

বলা ভালো, প্রথম ছবির বিষয় হিসেবে ফেলুদাকে বাছতে তেমন ভরসা পাচ্ছিলাম না। তার দুটো কারণ। প্রথমত ফেলুদাকে নিয়ে বাবার ছবি দুটো তার আগে ভীষণ সফল হয়েছে। ঠিক এর পরেই যদি আমিও ওই পথে হাঁটি, সে ছবি দর্শকরা কীভাবে গ্রহণ করবেন তা নিয়ে আমার একটা সংশয় ছিলই। নিশ্চিতভাবেই জানতাম, বাবার ফেলুদার সঙ্গে আমার ফেলুদার একটা তুলনা হবে, যেটা এতদিন বাদে 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' তৈরির পরেও হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে, এই তুলনার ব্যাপারটা সব সময়েই একটা ছবির ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর, একজন উঠতি পরিচালকের পক্ষে তো বটেই।

দ্বিতীয় কারণটা অবশ্যই অভিনেতা সন্তোষ দত্ত-র মৃত্যু। বাবা যে ফেলুদাকে নিয়ে আর কখনও ছবি করেননি, তার একটা প্রধান কারণ ওটাই। এক সাক্ষাৎকারে তিনি সে কথা বলেও ছিলেন। সন্তোষ দত্ত ছাড়া তখন জটায়ু ভাবা যেত না, আর জটায়ু ছাড়া ফেলুদার ছবি অসম্পূর্ণ। সোনার কেল্লা ছবিটা করার পর বাবা তো পরের ফেলুদার গল্পগুলোতে জটায়ুর চেহারাটাই বদলে দিয়েছিলেন। ইলাস্ট্রেশনে জটায়ুর চরিত্রে উঠে আসতেন অনেকটা সন্তোষদা। বাংলা সাহিত্যে এমন নিদর্শন আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই।

১৯৮৩ সালে আমার প্রথম ছবি 'ফটিকচাঁদ' মুক্তি পায়। এরপর দূরদর্শনের ন্যাশনাল নেটওয়ার্কের জন্য যখন হিন্দিতে দুটো সিরিজ পরিচালনা করার সুযোগ এল, তখন ফের ফেলুদাকে নিয়ে ছবি করার কথা ভাবতে বসলাম। তেরোটা

করে দুটো সিরিজে ছিল মোট ছাব্বিশটা পর্ব। প্রথমটায়, অর্থাৎ 'সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস'-এ অনেকগুলো ছোট গল্প ছিল, সেখানে ফেলুদাকে জায়গা দেওয়া গেল না। দ্বিতীয় সিরিজটা তৈরি হল পরের বছর '৮৭ সালে, 'সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস-২'। তাতে ফেলুদার গল্প রাখা হবে বলে প্রথম থেকেই ঠিক করলাম।

দুটো সিরিজেরই চিত্রনাট্য করেছিলেন বাবা। হিন্দিতে সংলাপ লেখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অক্ষয় উপাধ্যায়। তবে গল্প বাছতে গিয়ে বাবার মনে হল, সর্বভারতীয় দর্শকের কাছে ফেলুদার পরিচিতি প্রায় নেই বললেই চলে। বাঙালি পাঠক বা দর্শকের কাছে ফেলুদা যে ঠিক কী, সেটা অতএব তাঁদের নতুন করে বোঝানোর চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। তাঁরা ফেলুদাকে সাধারণ প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবেই দেখবেন, এবং চাইবেন একটা জমজমাট পরিবেশে টানটান গল্প। হিমালয়ের পটভূমিকায় 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' গল্পটাকেই তাই বাবার মোটামুটি আদর্শ বলে মনে হল। কলকাতা এবং কাঠমাণ্ডুতে ছবিটার শুটিং করে সিরিজে সেটাকে আটটা পর্বে ভেঙে দেখানো হবে বলে আমরা ঠিক করলাম।

কিন্তু ফেলুদা কে সাজবেন? আমরা চাইছিলাম সৌমিত্রকাকাকেই। কিন্তু দূরদর্শনের পক্ষ থেকে বার বার আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, চরিত্রটা কোনও হিন্দিভাষী নামজাদা অভিনেতাকে দিলে দর্শকরা আরও সহজে তাকে গ্রহণ করতে পারবেন। সিরিজটার মার্কেটিং (বিপণন) করতেও তাঁদের সুবিধা হবে।

অনেকগুলো নাম আমাদের মাথায় এল। হিন্দি ছবির অভিনেতাদের মধ্যে টানটান লম্বা চেহারার অভাব ছিল না, কিন্তু সেই সপ্রতিভ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ আর দুটো উজ্জ্বল চোখ? সমস্ত 'ফিচার্স' মিলিয়ে যাঁকে বাবার একেবারে 'অটোমেটিক চয়েস' বলে মনে হল তিনি অমিতাভ বচ্চন।

'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' ছবিতে নেপথ্য ভাষ্য দেওয়ার সুবাদে বাবার সঙ্গে অমিতাভর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। ওঁর স্ত্রী জয়াদির সঙ্গে তো বটেই। জয়াদি'র প্রথম অভিনয় বাবার মহানগর ছবিতে। সেই অভিনয় দেখে বাবা তাঁকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেটা পুণে'র ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার সময় জয়াদিকে কিছুটা সাহায্য করেছিল বলে আমি শুনেছি। অমিতাভ আমাদের বাড়িতেও এসেছেন। ঠিক হল বাবা অমিতাভকে প্রস্তাবটা দেবেন। কিন্তু তখন অমিতাভর জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় চলছে। এলাহাবাদ থেকে কংগ্রেসের হয়ে লোকসভা নির্বাচনে জিতে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। নতুন জগতে যথেষ্ট

টালমাটালও রয়েছে। ছবির কাজটা অমিতাভ সেই সময় কিছুটা কমিয়ে দিলেও, সাংসদ হিসেবে ব্যস্ততা ছিলই।

তাছাড়া 'অমিতাভ বচ্চন' নামটাতেই আমার কিছুটা অস্বস্তি হচ্ছিল। সেটাই আমার প্রথম ফেলুদা ছবি এবং হিন্দিতে। তার ওপর ওই মাপের একজন স্টারকে নিয়ে কাঠমাণ্ডুর খোলা জনবহুল রাস্তায় অতখানি শুটিং করা! বাঙালি ইউনিট নিয়ে কাজটা কতটা ভালোভাবে করে উঠতে পারা যাবে, তা নিয়ে আমার সংশয় প্রথম থেকেই ছিল। এখানে 'বাঙালি ইউনিট' বলে অবশ্য আমি কাউকে ছোট করতে চাইছি না। যেটা বলতে চাই সেটা হল, সুপারস্টারদের নিয়ে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে খোলা রাস্তায় শুটিং-এর হাজারো ঝক্কি সামলানোর জন্য কিছুটা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, ইউনিটের আকারও অনেক বড় হওয়ার দরকার। আমাদের না ছিল সেই অভিজ্ঞতা, না অত বড় ইউনিট। ভেবে দেখলাম রাস্তার ভিড় সামলাতে সামলাতেই ছবিটার দফারফা হবে। শেষ পর্যন্ত বাবার সঙ্গে আলোচনা করে আমরা অন্য কাউকে নেওয়ার কথা স্থির করলাম।

অথচ তখন টেলিকাস্টের তারিখ এগিয়ে আসছে। গোটা সিরিজের অর্ধেকেরও বেশি অংশ জুড়ে থাকবে 'কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কা'। 'ফেলু'-র অভিনেতা তাড়াতাড়ি না বাছলেই নয়। বেশ কয়েক জনের কথা বিবেচনা করার পর কেউ একজন শশী কাপুরের নামটা বললেন। তালেগোলে শশী কাপুরই হয়ে গেলেন ফেলুদা। জটায়ুর চরিত্রে এলেন মোহন আগাসে, আর তোপসের ভূমিকায় অলংকার।

একটা পুরনো প্রশ্নের মুখোমুখি আমাকে আজও হতে হয়। কেন শশী কাপুর? ছবিটা টিভিতে দেখানো শুরু হওয়ার পর স্রেফ এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে দিতেই আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি। শশীর মুখ বা অভিনয় ফেলুদার সঙ্গে মোটামুটি মানানসই হলেও, যেটা একেবারেই বেমানান ছিল, সেটা তার স্থূল চেহারা। সত্যি কথা বলতে, সত্তরের দশকের শশীর চেহারাটাই বোধহয় ফেলুদার পক্ষে ঠিকঠাক হত। শশী অবশ্য আমাদের বলেছিল যে শুটিং-এর আগে ওজনটাকে কমানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু কলকাতায় প্রথম যেদিন সে ছবির সেট-এ এল, দেখলাম তার চেহারা একটুও কমেনি, এবং আমিও যাকে বলা যায় বেশ মর্মাহত হলাম।

শশী কাপুরের নির্বাচনে আরও কয়েকটি 'ফ্যাক্টর' কাজ করেছিল বলে আমার মনে হয়। শশী বাবার ছবির অত্যন্ত ভক্ত ছিল। জেম্‌স আইভরির 'শেক্সপীয়ারওয়ালা' ছবিটার মিউজিক কম্পোজ করেছিলেন বাবা। ছবিটা রিলিজ করেছিল ১৯৬৬ সালে। ওই ছবিতে একটা প্রধান চরিত্রে ছিল শশী। ছবিটার কাজ চলাকালীন

শশী বাবার ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। 'সোনার কেল্লা' এবং 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবি দুটো ও আগেই দেখেছিল। কাজেই 'ফেলুদা'র সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণাটা শশীর আগে থেকেই ছিল। সেটা 'কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কা'র শুটিং চলাকালীন আমিও বুঝেছি।

তাছাড়া মুম্বইয়ের কাপুর পরিবারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ইতিহাসটাও বেশ দীর্ঘ। এর সূচনাটা বোধহয় সেই 'পথের পাঁচালী' ছবির সময় থেকে। গায়ক কিশোরকুমারের মুখ থেকে একটা গল্প শুনেছিলাম। পথের পাঁচালী যখন মুক্তি পায়, মুম্বইয়ের মেহবুব স্টুডিওতে রাজ কাপুরের একটা ছবির শুটিং হচ্ছিল। সেই সময় কিশোরকুমার একদিন দেখেছিলেন, রাজ কাপুর তাঁর ইউনিটের সবাইকে নিয়ে মেহবুব স্টুডিওর একটা ফ্লোরের বাইরের মাঠে খুব গম্ভীর মুখ করে বসে রয়েছেন। কাজকর্ম বন্ধ। ব্যাপারটা কী? রাজ কাপুর নাকি সেদিন পথের পাঁচালী দেখে এসেছিলেন। এবং আপ্লুত হয়ে কিশোরকুমারকে বলেছিলেন, 'ফিল্ম জগতে প্রায় অপরিচিত একজন বাঙালি আমাদের মতো পরিচালকদের বুদ্ধু বানিয়ে ছাড়ল। বড় একটা শিক্ষাও দিয়ে গেল।'

এরপর রাজ কাপুরের সঙ্গে বাবার যোগাযোগ হয়েছে, এবং প্রায় গোটা কাপুর পরিবারই বাবার গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছে। রাজ কাপুরের বাবা পৃথ্বীরাজ কাপুর তো আমাদের বাড়িতেও এসেছেন। আর একটা ঘটনাও বলা দরকার বলে আমি মনে করি। দার্জিলিং-এ বাবা যখন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির শুটিং করছেন, সেই সময় রাজের ভাই অভিনেতা শাম্মী কাপুরও সেখানে এসেছেন একটা হিন্দি ছবির কাজে। এখন, বাংলা ছবিতে চিরকালই টাকাপয়সা নিয়ে একটা টানাটানি থাকে। শুটিং চলাকালীন কাঞ্চনজঙ্ঘা ইউনিটে ছবি তোলার ফিল্ম-রোলে টান পড়ল। কাঞ্চনজঙ্ঘা আবার রঙিন ছবি এবং রঙিন ফিল্ম বা 'কালার র-স্টক' তখনকার দিনে অত্যন্ত দুর্মূল্য। বাবা বেশ বিপদে পড়লেন। শেষে কোনও উপায় না দেখে তিনি শাম্মীর কাছে গিয়ে অনুরোধ করলেন, 'তুমি দুটো রোল যদি আমাদের ধার দাও, তবে আপাতত সমস্যা মেটে। আমি কলকাতায় ফিরে ওগুলো তোমায় ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করব।' শাম্মী উত্তর দিয়েছিলেন, 'আপনার মতো একজন মানুষ আমাকে সমস্যার কথা বলতে এসেছেন, এটাই আমার কাছে অনেক। আপনি যতগুলো খুশি রোল নিয়ে যান। ওগুলো আপনাকে আর ফেরত দিতে হবে না।' বাবা অবশ্য কলকাতায় ফিরে শাম্মীকে রোল ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

হিন্দিতে কাজ করতে গিয়ে কাপুর পরিবারের সঙ্গে এই নিবিড় সম্পর্কটা আমাকে শশীর সঙ্গে 'কমিউনিকেট' করতে সাহায্য করবে—বাবা হয়তো এমনটাই ভেবেছিলেন। তাছাড়া একমাত্র আমাদের কাজ বলেই কিন্তু শশী নিজের সমস্ত ব্যস্ততা ফেলে একটানা ডেট দিয়েছিল। শশী সেটে আসত একদম ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। পেশাদারিত্ব ছিল দেখার মতো। অভিনয়ের বাইরেও খুঁটিনাটি ব্যাপারে সাংঘাতিক নজর। কতবার শট দেওয়ার আগে মনে করিয়ে দিয়েছে, আগের শটে জামার একটা বোতাম খোলা ছিল, অথবা চুলটা ছিল একটু অন্যরকম.....ইত্যাদি। ক্যামেরার অবস্থান বুঝে শট দেওয়া, কিংবা আলোর এক্সপোজারের বিষয়ে দুর্দান্ত জ্ঞান। আর ফেলুদার 'ম্যানারিজম'গুলো ভালো করে বোঝার জন্য বাবাকে বারবার প্রশ্ন করত। তখনও ফেলুদার গল্পের হিন্দি বা ইংরেজি অনুবাদগুলো বেরোয়নি। বেরোলে, আমার বিশ্বাস সেগুলো শশীকে অনেকটাই সুবিধা করে দিত।

পুরো ছবিটাই আমরা তুলেছিলাম ৩৫ মিলিমিটার সেলুলয়েড। তারপর সেটাকে ভিডিও ফরম্যাটে আনা হয়েছিল। এতে রঙিন ছবির গভীরতাটা ভালো পাওয়া যায়, সরাসরি ভিডিওতে তুললে যা একেবারেই সম্ভব নয়। ছবির প্রসেসিং-এর কাজ হয়েছিল মাদ্রাজের (এখন চেন্নাই) জেমিনি ল্যাবে। ল্যাব থেকে রাতে কাজ সেরে ফেরার সময় একটা টিভির দোকানের সামনে প্রায়ই দাঁড়াতাম আমরা কয়েকজন। কারণ তখন ছবিটার টেলিকাস্ট শুরু হয়ে গেছে। দোকানের ভিতর টিভি চলত, কাচের দেওয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতাম। মনে আছে, দোকানের লোকজনও খুব আগ্রহ নিয়ে সিরিজটা দেখতেন।

দুটো সিরিজই দিল্লি আর মুম্বইয়ে প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে বাংলায় 'কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কা' আর দর্শকদের মধ্যে একমাত্র অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল শশী কাপুরের চেহারাটা। তাছাড়া ফেলু জটায়ু এবং তোপসে—এই তিন চরিত্রের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় যে পরিমিত 'হিউমার' বাবা সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র দু'জায়গাতেই এনেছেন, সেটা হিন্দি চিত্রনাট্যে বজায় রাখা একেবারেই সম্ভব হয়নি। তিন মূর্তির যে বিশেষ ভাবমূর্তির সঙ্গে বাংলার দর্শক এর আগের দু'টি ছবির সুবাদে অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন, সেটা তাই জোর ধাক্কা খেয়েছিল। আটটা পর্বে ছবিটাকে ভাগ করে দেখানোর ফলে দর্শকদের অবিচ্ছিন্ন মনোযোগও পাওয়া যায়নি। কাজেই 'হিন্দি ফেলু'কে এখানে বেশ সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল।

বাবা মোটামুটি ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকতেন, ফেলু-অনুরাগীদের সমস্ত ক্ষোভ

সামাল দিতে হয়েছিল মোটামুটি আমাদেরই। বাবাও ছবিটা দেখে বলেছিলেন, যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ফেলুদার গল্প পড়ে বড় হয়েছে, তারা কখনওই শশী, মোহন আগাসে এবং অলংকারকে মেনে নেবে না।

বাংলার আসল ফেলুদা-ভক্তদের খুশি করতে না পেরে আমার মনে একটা অস্বস্তি ছিলই। তখন থেকেই ভেবেছি 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' নিয়ে বাংলায় ছবি করব। পরে কলকাতা দূরদর্শনের জন্য সেটা করেওছি।

'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' মুক্তি পাওয়ার পর একজন আমাকে এই সেদিনও জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কা'-র সেলুলয়েড প্রিন্টটা পর্দায় দেখানোর বন্দোবস্ত করা যায় কিনা। সত্যি কথাটা হল, টিভিতে ছবিটা দেখানোর পর কলকাতার দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখে সেটাকে আবার বড় পর্দায় দেখানোর কথা ভাবতেই পারিনি। এবং এখন, বোম্বাইয়ের বোম্বেটে এত সফল হওয়ার পর তো সেই প্রশ্নটাই আর ওঠে না।

বাক্স রহস্য

টাফ্ ফেলুর পয়লা টক্কর

মিশরের দেবতা আনুবিসের মূর্তি নিয়ে বাবা ফেলুদার যে রহস্য-উপন্যাস লিখেছিলেন, তার নাম 'শেয়াল দেবতা রহস্য'। অবশ্য উপন্যাসটার জন্য আরও দুটো নাম উনি এর আগে ঠিক করেছিলেন, 'ফেলুদা ও আনুবিস রহস্য' এবং 'আনুবিস রহস্য'। মজার কথা হল, খসড়া খাতার যে পাতায় এই উপন্যাসটা শেষ হচ্ছে তার কয়েক পাতা পরেই উনি আরও একটি ফেলুদা-কাহিনি লেখা শুরু করেছিলেন। সেই কাহিনিতে হরিনাথ চক্রবর্তী নামক প্রায় নিরীহ চেহারার এক ভদ্রলোক ফেলুদাকে একটা অদ্ভুত রহস্য সমাধান করতে অনুরোধ করছেন। অফিসের কাজে দিল্লি গিয়ে ফেরার পথে ভদ্রলোকের অ্যাটাচি কেসের ভেতর একটা সুপুরির কৌটোর মধ্যে কীভাবে যেন একটা ছোট্ট বিরল তিব্বতি যমন্তকের মূর্তি চলে আসে। কী করে এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, সেটা অবশ্য ফেলুদার আর খুঁজে বার করা হয়নি, কারণ বাবা কাহিনিটাকে আর শেষই করেননি। এটা ১৯৬৯ সালের কথা। এর তিন বছর পরে উনি ফেলুদাকে নিয়ে যে উপন্যাসটা লিখলেন, তার সঙ্গে কিন্তু ওই অসম্পূর্ণ লেখাটার আশ্চর্য মিল। সুপুরির কৌটো ঘিরে রহস্য জমে উঠেছে সেখানেও, তবে তার ভেতরে আর যমন্তকের মূর্তি নেই, সেটা হয়ে গেছে একটা অত্যন্ত দামি হীরে। ফেলুদার মক্কেলের নামও পালটেছে, দীননাথ লাহিড়ী। আর গোড়া থেকেই এই উপন্যাসটা যে আগের খসড়ার চেয়ে অনেক বেশি জমজমাট, সেটা দু-চার পাতা পড়লেই বোঝা যায়। উপন্যাসের নামটা বলতে হবে? বাক্স রহস্য।

বাবা চলে যাওয়ার পর ফেলুদাকে নিয়ে আমার প্রথম 'এক্সপেরিমেন্ট'। এই বাক্স রহস্যকে ঘিরেই। ছবিটার চিত্রনাট্য এবং পরিচালনা, দুটো দায়িত্বই ছিল আমার। 'বাক্স রহস্য' ভিডিও ফরম্যাটে তোলা হয়েছিল। এবং ওটাই বাংলার প্রথম ভিডিও ছবি, যা সিনেমা হলে প্রদর্শিত হয়েছিল। নন্দনে ছবিটা বহুদিন ধরে চলে। ওখানে ভিডিও প্রোজেকশান সিস্টেম তখন খুব একটা ভালো ছিল

না, আমরা একটা ভালো সিস্টেম ভাড়া করার ব্যবস্থা করেছিলাম। পরে দূরদর্শনেও ছবিটা দেখানো হয়, ফেলুদা-৩০ সিরিজে, বেশ কয়েকটা পর্বে ভাগ করে।

তবে বাক্স রহস্যর আসল গুরুত্বটা ছিল অন্য জায়গায়। 'কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কা'-র ব্যর্থতার পর প্রায় একটা দশক ফেলুদা তখন ছোট, বড় দুই পর্দাতেই অনুপস্থিত। এই সময়টায় আমি বহুবারই ভেবেছি, পর্দায় ফেলুদাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। এটাও জানতাম, ফেলুদার এই প্রত্যাবর্তনের কাজটা হবে আমাদের একটা বড়সড় পরীক্ষা। প্রথমত, সোনার কেল্লা এবং জয় বাবা ফেলুনাথ ছবিতে দর্শকদের আকর্ষণ করার যে ক্ষমতা ফেলুদা দেখিয়েছিল, তা এখনও অটুট কিনা, তা এই ছবিতে প্রমাণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, এই প্রথম ফেলুদার ছবিতে চিত্রনাট্য এবং পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। নিজের পারফরমেন্স নিয়ে তাই চিন্তা একটা ছিলই। এবং তৃতীয়ত, পর্দার ফেলু, তোপসে এবং জটায়ুর অতি পরিচিত চেহারাগুলো বাংলার এই ছবিতেই প্রথম বদলাচ্ছে। কারণ, সিদ্ধার্থকে আর তোপসে মানাবে না, সন্তোষদাও চলে গেছেন, আর সৌমিত্রকাকার বয়সও ফেলুর তুলনায় একটু বেশিই হয়ে গেছে।

বাক্স রহস্য ছবিটা তৈরি হয়েছিল 'ছায়াবাণী'-র ব্যানারে। যার বর্তমান কর্ণধার রামলাল নন্দী। বাংলায় তখনও 'টেলিফিল্মের' চলটা এত বেশি হয়নি। তারপর বাক্স রহস্য আদৌ টেলিভিশনে দেখানো হবে কিনা, সেটাও স্থির ছিল না। এতটা অনিশ্চয়তার মধ্যেও রামলালবাবু যে ছবিটা করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তার কারণ একটাই, বাংলার অগুনতি ফেলু ভক্তদের মধ্যে তিনিও একজন।

শ্যুটিং শুরু করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতেই প্রথমে যে প্রশ্নটা আমার মাথায় এল, সেটা হল, এবার ফেলুদা কে সাজবেন? 'জয় বাবা ফেলুনাথ' পর্যন্ত সৌমিত্রকাকাই ঠিক ছিলেন। এর বেশ কয়েক বছর পর অভিনেতা ও নাট্য-পরিচালক বিভাস চক্রবর্তী ফেলুদার গল্প নিয়ে একটা টেলিফিল্ম করেছিলেন। তাতেও সৌমিত্রকাকাই ফেলুদা, এবং তাঁর বয়সটা ওই চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত বেশি দেখিয়েছিল। অর্থাৎ বাক্স রহস্যর জন্য নতুন ফেলু চাই।

কিন্তু আমি জানতাম, এই কথাটা সৌমিত্রকাকাকে আগে থাকতে জানিয়ে না রাখাটা প্রায় অপরাধের পর্যায়ে পড়বে। তবে উনি বরাবরই খুব 'স্পোর্টিং' মেজাজের মানুষ, টেলিফোন করেও বুঝলাম সেই মেজাজটা একেবারেই বদলায়নি। সব কিছু শুনে বেশ মজা করেই বললেন, 'ফেলুদা নয়, ফেলুজ্যাঠা

নামের কোনও ক্যারেকটার হলেই বোধহয় এখন আমাকে বেশি মানাবে।'

এরপর নতুন ফেলু খুঁজতে গিয়ে যার নাম প্রথমেই মনে পড়ল, সে সব্যসাচী চক্রবর্তী। কেন ওর চেহারাটা আগে মনে এল, এই প্রশ্নের পিছনে একটা ঘটনা আছে। সেটা বোধহয় ১৯৯০ সালের শেষের দিকে হবে। বাবা আগন্তুক ছবির জন্য চিত্রনাট্য করেছেন, এমন সময় একদিন বেণু (সব্যসাচীর ডাকনাম) ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। তখন বাংলায় কয়েকটা সিরিয়াল করে ওর বেশ পরিচিতি হয়েছে। সেদিন ওর সঙ্গে বাবার যে কথাবার্তা হয়েছিল, সেটা উনি আমাকে বলেছিলেন। এখানে সেটা কথোপকথনের ভঙ্গিতেই তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি, নইলে এই ছোট্ট সাক্ষাৎকারের মজাটা ঠিক পাওয়া যাবে না।

সব্যসাচী সরাসরি জিজ্ঞেস করল, ফেলুদাকে নিয়ে আর ছবি করবেন না?

বাবা উত্তর দিলেন—'না'।

—কেন?

—কারণ সন্তোষ দত্ত নেই। তাকে বাদ দিয়ে ওই তিন চরিত্রের কম্বিনেশনটা জমবে না।

—রবি ঘোষকে দিয়ে জটায়ু হয় না?

—না। রবিকে নিয়ে নয়।

—যদি কম্বিনেশনটা বদলান? মানে ধরুন ফেলুদার ক্যারেকটারটা অন্য কেউ করে?

—কে?

—আমি!!

বাবা তো অবাক। উনি ফের বলেছিলেন, ফেলুদাকে নিয়ে ছবি করার পরিকল্পনা ওঁর আর নেই। তবে উনি বেণুকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। কারণ ফেলুদাকে নিয়ে ছবি করার একটা দীর্ঘকালীন ইচ্ছে যে আমার রয়েছে, সেটা উনি ভালোভাবেই জানতেন।

এরপর বেণুর সঙ্গে আমার কথা হয়, তবে তখনও ওকে সুযোগ দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তারপর থেকে কিন্তু ও নিয়মিত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। অবশ্য ১৯৯১ সালের শেষের দিক থেকেই বাবার শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি। সেই সময়টায়, বাস্তবিকই, নতুন ছবি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মতো অবস্থা ছিল না। তারপর ১৯৯২ সালে তো বাবা চলেই গেলেন।

বাবার মৃত্যুর বছর দুয়েকের মধ্যেই আরও একটা বড় আঘাত আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছিল। পথের পাঁচালী সহ বাবার বেশ কিছু ছবির নেগেটিভ এবং মাস্টার পজিটিভ এখানে পড়ে থেকে থেকে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রযোজক ইসমাইল মার্চেন্ট সেগুলোকে লন্ডনে নিয়ে গিয়ে 'রিজুভিনেট' করার একটা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। 'শেক্সপীয়ারওয়ালা', 'গুরু' ইত্যাদি ছবির প্রযোজক ইসমাইল বাবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আগেই বলেছি, 'শেক্সপীয়ারওয়ালা' ছবিতে সংগীত রচনা করেছিলেন বাবা। কাজেই ইসমাইলের অনুরোধে সম্মত না হওয়ার কোনও কারণ আমি দেখিনি। নেগেটিভগুলো লন্ডনে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছিল হেন্ডারসন ল্যাবরেটরিতে। কিন্তু সেখানে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সেগুলো প্রায় নষ্ট হয়ে যায়।

এই খবরে তো আমাদের প্রায় মাথায় হাত দেওয়ার মতো অবস্থা। নেগেটিভ পুড়ে যাওয়ার অর্থ, সেগুলো থেকে আর পজিটিভ প্রিন্ট তৈরি করা যাবে না, এবং ছবিগুলোকে আর কখনওই বড় পর্দায় দেখানো যাবে না। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ছবি বলে কথা, বাস্তব যা-ই বলুক, মন থেকে সেটা মেনে নেওয়া কঠিন। আমরা সবাই মিলে একটা রাস্তা বের করার চেষ্টায় ছিলাম।

ইসমাইল মার্চেন্ট নিজেও এই ঘটনায় বেশ আঘাত পেয়েছিলেন। উনি টেলিফোনও করেছিলেন আমাকে। বলেছিলেন, কলকাতায় এবং পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের আর্কাইভে থাকা বাবার ছবির পজিটিভ প্রিন্টগুলোকে যাতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে মেরামত করা যায়, সে ব্যবস্থা তিনি করবেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনি যে এতটা করে ফেলবেন, সেটা আমরা কেউই ভাবতে পারিনি। অনেকটা ইসমাইলের উদ্যোগেই কলকাতায় আসেন খোদ অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার্স, আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সের রেস্টোরেশন বিভাগের প্রধান মাইকেল ফ্রেন্ড। ভদ্রলোক 'ফিল্ম রিজুভিনেশনের' কাজে একজন বিশেষজ্ঞও বটে।

মাইকেলের আগেই অবশ্য কলকাতায় ঘুরে গেছেন ডেভিড শেফার্ড। তিনিও ছবি পুনরুদ্ধারের কাজে বিশেষজ্ঞ, তবে সাদাকালোয়।. বাবার সাদাকালো ছবিগুলোকে খুঁটিয়ে দেখে তিনি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, সেটা খুবই উদ্বেগজনক। মাইকেল ফ্রেন্ড কিন্তু সাদাকালো ও রঙিন, দুটো প্রযুক্তিই ভালো বোঝেন। শেফার্ডের রিপোর্টটা মাইকেল দেখেছিলেন। তারপর তিনি নন্দনে বসে বাবার অধিকাংশ ছবির পজিটিভ প্রিন্ট পরীক্ষা করে দেখেন। শেষে সেগুলিকে লস

অ্যাঞ্জেলিসে অ্যাকাডেমির ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যান। এখনও পর্যন্ত অ্যাকাডেমির উদ্যোগেই বাবার অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত ছবির প্রিন্ট ও নেগেটিভ পুনরুদ্ধার করা গেছে। এক মহান চলচ্চিত্রকারকে এভাবে সম্মান জানানোর ঘটনা অ্যাকাডেমির নিজের ইতিহাসেও বোধহয় কমই রয়েছে। মাইকেল অবশ্য এই মুহূর্তে আর অ্যাকডেমির সঙ্গে যুক্ত নন।

সেই সময়টায়, বাবার ছবির রিজুভিনেশনের কাজে আমাকে প্রায়ই নন্দনে যেতে হত। আমাদের বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়ি থেকে নন্দন অবশ্য খুব দূরে নয়। এইরকমই একদিন, ওখানে আমার সঙ্গে সব্যসাচীর দেখা হয়ে গেল। দেখলাম ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করার আকাঙ্ক্ষাটা ওর মধ্যে তখনও প্রবল। সেদিনও সব্যসাচী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ফেলুদার ছবি কবে হচ্ছে। আমিও প্রতিবারের উত্তরটাই ওকে আর একবার দিয়েছিলাম : 'সময় হলে জানাব'।

এবং সেই সময়টা এসে গেল তার কিছুদিনের মধ্যেই। বাক্সরহস্য করার জন্য এগিয়ে এলেন ছায়াবাণীর রামলাল নন্দী। ছবিটা সব্যসাচী করবে কি না জানতে আমি ওকে খবর পাঠালাম। খবর পেতেই ও আমাকে টেলিফোন করেছিল, 'করব না মানে!'

তবে সব্যসাচীকে নির্বাচিত করার পরেই একটা ছোট প্রশ্ন আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল। ও চোখে চশমা পরে, বেশ উঁচু পাওয়ারের চশমা। তাহলে ফেলুদা-ও কি চশমা পরবে?

এখন, যুক্তি দিয়ে ফেলুদার চশমা পরা'টাকে আটকানোর কোনও রাস্তা নেই। কারণ, ফেলুদার চোখ খারাপ হতেই পারে। তবে, গত ৩০ বছর ধরে ফেলুদার যে চেহারাটা বাঙালি পাঠকদের খুব পরিচিত, তার সঙ্গে কিন্তু চশমা পরা চেহারার কোনও মিল নেই। অনেক ভেবেচিন্তেই তাই বেণুকে চশমা খোলাতে হল। ফেলুদার চোখে চশমা থাকলে ছবিটা হয়তো মার খেত না, কিন্তু নষ্ট হতে পারত তার অতি পরিচিত আইডেনটিটি। আর ঘটনা হল, চশমা খুলে চুলের ধাঁচটা একটু বদলে দিতেই, বেণুকে দিব্যি ফেলুদা বলে মনে হতে লাগল।

আর একটা সমস্যা ছিল সব্যসাচীর চোখ নিয়ে। সাধারণত যাঁরা উঁচু পাওয়ারের চশমা পরেন, তাঁদের চোখদুটো একটু নিষ্প্রভ হয়ে যায়। বেণুরও তাই হয়েছিল। স্ক্রিন টেস্টে টিভির ছোট পর্দাতেও সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু ফেলুদার চোখ তো ঝকঝকে হতেই হবে। শেষ পর্যন্ত বেণুর চোখ দুটো একটু 'হাইলাইট' করে দিতে তখনকার মতো সমস্যা মিটল।

টিভি-র পর্দায় ওইটুকুতেই কাজ চলে গিয়েছিল, কিন্তু সমস্যাটা প্রকট হয় পরে 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'র শ্যুটিং চলাকালীন। কারণ সেটা বড় পর্দার কাজ। ছোটখাটো ত্রুটিও বিরাট হয়ে ধরা দেয়। সিনেমায় তাই বেণুর চোখের জন্য বিশেষ মেক-আপের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। আর যেটুকু মেক-আপ ঢাকা সম্ভব নয়, সেটুকু বেণু পুষিয়ে দিয়েছিল ওর দুর্দান্ত অভিনয় দিয়ে।

বাক্স রহস্য, বা পরে বোম্বাইয়ের বোম্বেটের চিত্রনাট্য করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল, গল্পের ক্লাইম্যাক্সে ফেলুর নিজের 'কনট্রিবিউশন'টা কম হয়ে যাচ্ছে। ফেলু যখন বিপদে পড়ছে, সেটার থেকে উদ্ধার পেতে গল্পের অন্য কোনও চরিত্রের অবদান তার থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে। অথচ বাবাই লিখেছেন, ফেলু 'যুযুৎসু'-র প্যাঁচ জানে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ কই?

আসলে বাবা তাঁর গোয়েন্দাকে একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবেই বেশি দেখাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ গল্পের ফেলু যতটা 'সেরিব্রাল', ততটা 'টাফ' নয়। আমার কিন্তু বহুদিন ধরেই মনে হত, গল্পে ব্যাপারটা উতরে গেলেও, সিনেমায় বিশেষত আজকের সময়ে, ঠিক জমবে না। সিনেমায় বুদ্ধিমান ফেলুকে কিছুটা শক্তপোক্ত এবং শারীরিক দিক থেকে তৎপরও হতে হবে। নইলে 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'-র একদম শেষে 'জেট বাহাদুর' ছবির ভিলেন মুম্বইয়ের জাঁদরেল অভিনেতা মিকি ফেলুর অটোগ্রাফ নেবে কেন?

বাক্স রহস্যয় সব্যসাচীকে ফেলুদার সাজে দেখেই কিন্তু আমার মনে হয়েছিল 'টাফ' ফেলুকে পেয়ে গেছি। বেণু ছোট থেকেই দিল্লিতে মানুষ, বাঙালির মজ্জাগত নরমসরম ভাবটা ওর মধ্যে কম। চেহারায় আপাতদৃষ্টিতে একটা কাঠিন্য রয়েছে। তারপর যখন শুনলাম ওর মার্শাল আর্টের-ও ট্রেনিং আছে, তখন বাস্তবিকই বেশ আনন্দ হল। ফেলু সাজার জন্য সব্যসাচীর যে দীর্ঘকালীন 'অ্যাম্বিনেশন'টা ছিল, সেটাই ভিতরে ভিতরে ওকে ওই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছিল বলে আমার মনে হয়।

একটা জিনিস তো আমাকেও বেশ অবাক করে দিয়েছিল। বাবা গল্পে লিখেছেন, ফেলু বেশ অনেকটা সময় চোখের পাতা না ফেলে থাকতে পারে। বাক্স রহস্যের শ্যুটিং চলাকালীন দেখেছিলাম, শট দেওয়ার সময় দীর্ঘক্ষণ ধরে বেণুর চোখের পলক পড়ছে না। শুধু ফেলু চরিত্রের অভিনয় বলে নয়, চলচ্চিত্রে বা টি ভি তে যাঁরাই অভিনয় করেন, তাঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই ক্ষমতাটা অত্যন্ত জরুরি। ছবি সম্পাদনার সময়ে বহুবার এমন হয়েছে, শুধু কোনও

অভিনেতা বা অভিনেত্রীর চোখের পলক পড়ে যাওয়ার জন্য একটা শটকে ঠিক জায়গায় কাটতে পারিনি। বেণুর ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা কিন্তু কোনওদিন হয়নি। আমার ধারণা, ফেলুদা যে অনেকক্ষণ ধরে চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকতে পারে, এই ব্যাপারটা ও আগে থাকতে জেনে প্রস্তুতি নিয়েছিল। ওর প্রস্তুতি ছিল শারীরিক দিক থেকেও। বোম্বাইয়ের বোম্বেটে করার আগে তো আমি ওকে নিয়মিত ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে বলেছিলাম। আমার কথা যে ও গুরুত্ব দিয়ে শুনেছে, সেটা শুটিং চলাকালীনই বুঝেছি।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে-র অ্যাকশনের দৃশ্যগুলো বেণু কীভাবে উতরে দিয়েছে, তা আর নতুন করে বলার দরকার হয় না। আর এই 'টাফ' ফেলু-র অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং-পর্বও নানান মজাদার ঘটনায় ঠাসা।

* * *

গোঁসাইপুর সরগরম। কলকাতা দূরদর্শনের জন্য ফেলুদা-৩০ ধারাবাহিকে হাত দিয়ে বাবার এই গল্পটাকেই আমরা বেছে নিই। সিরিজে এটা ছিল দ্বিতীয় ছবি। এর আগে যে বাক্স রহস্য দেখানো হয়েছিল সেটা আগের পর্বেই বলেছি। তবে যেহেতু বাক্স রহস্যর শুটিংয়ের সময় দূরদর্শনের সিরিজটার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না, সেহেতু এক অর্থে বলতে গেলে বাংলা দূরদর্শনের জন্য গোঁসাইপুর সরগরম-ই ফেলুদাকে নিয়ে আমার প্রথম টেলি ছবি।

গোঁসাইপুর সরগরম ছবিটার শুটিং করেছিলাম বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের কাছে হেতমপুরে। গুপীগাইন বাঘাবাইন ছবিতে যে আমলকি গ্রাম দেখানো হয়েছে তার দৃশ্যায়ন-ও ওখানেই হয়। বাক্স রহস্য থেকেই সব্যসাচীর সঙ্গে আমাদের ইউনিটে নতুন এসেছে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে। আর অবশ্যই রবিকাকা, জটায়ুর ভূমিকায়। জটায়ুর চরিত্রে রবিকাকাকে নেওয়ার জন্য সব্যসাচী যে আগেই বাবাকে বলেছিল, সে কথা আগে লিখেছি। বাবা সেই প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহিত বোধ না করলেও, আমি কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে রবিকাকাকেই নিয়েছিলাম। ওঁর চেহারাটা তখন জটায়ু চরিত্রের পক্ষে খুব বেমানান ছিল না। কিন্তু ওঁকে নির্বাচিত করার পিছনে মূল কারণটা ছিল অন্য।

জটায়ুর ভূমিকায় সন্তোষ দত্তর অভিনয় কারওর পক্ষেই ভোলা সম্ভব নয়। কাজেই তাঁর পর এমন একজন কাউকে নির্বাচন করার দরকার ছিল, যিনি অভিনয়ের গুণে চরিত্রটাকে আবার জীবন্ত করে তুলতে পারেন। চেহারার সাদৃশ্য

দেখে যাকে তাকে দিয়ে ওই চরিত্রটায় অভিনয় করালে একেবারেই চলত না। সেই জন্যই রবি ঘোষ, এবং সত্যি কথা বলতে কী, ওই মুহূর্তে অন্য আর কারোর নাম আমার মাথায় আসেওনি। তাছাড়া সিরিজটা হচ্ছে দূরদর্শনের জন্য, যেখানে সপ্তাহে সপ্তাহে এপিসোড জমা দেওয়ার একটা বাধ্যবাধকতা থাকে। তাই নতুন কাউকে নিয়ে জটায়ুর ভূমিকায় 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' প্রক্রিয়ায় কাজ করানোটা বেশ ঝুঁকির হয়ে যেত। রবিকাকার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা কিন্তু দুর্দান্ত। তবে সেটা পরে বলা যাবে।

গোঁসাইপুর সরগরম গল্পে যে মল্লিকবাড়ির কথা বাবা লিখেছেন, সেটা একটা পুরনো বড় বাড়ি। প্রায় অট্টালিকাই বলা যায়। সামান্য ভাঙাচোরা, তবে মেরামত করে নেওয়া হয়েছে। হেতমপুরের বিখ্যাত রাজবাড়িটার সঙ্গে গল্পের মল্লিকবাড়ির অনেক মিল পাওয়া যায়। বাড়িটাকে ঘিরে ছিল একটা উঁচু পাঁচিল ভিতরে কিছুটা অযত্নের ছাপওয়ালা একটা বাগান, গল্পেও ঠিক এমনটাই লেখা ছিল।

গোঁসাইপুর সরগরমের ঘটনা এই মল্লিকবাড়িকে কেন্দ্র করেই। প্রায় পুরো ছবিটাই আমরা ওই হেতমপুরে শুটির করেছিলাম। সেই সময়েই সব্যসাচীর দৃঢ় এবং পেশাদার মানসিকতার চেহারাটা আমার সামনে বেশ কয়েকবার ধরা পড়েছিল। এখানে তেমনই একটা ঘটনার কথা বলা যাক।

গোঁসাইপুর সরগরম গল্পটার ভিলেন যদি কাউকে বলতে হয়, তবে সে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। একজন ভণ্ড 'থিয়োজফিস্ট'। এই চর্চাটার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিছু নেই, তবে ব্যাপারটা ইউরোপে একসময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তারই প্রভাবে আমাদের এখানেও থিয়োজফি নিয়ে চর্চা শুরু হয়। পরলোক থেকে মৃত ব্যক্তির আত্মা নামানো, অর্থাৎ প্ল্যানচেটের প্রক্রিয়াটাও এই থিয়োজফির মধ্যে পড়ে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্ল্যানচেটে আগ্রহী ছিলেন বলে শোনা যায়। বাবা এই চর্চাটাকে ঠিক বিশ্বাস করতেন না। তবে তিনি খুব খোলা মনের মানুষ ছিলেন। থিয়োজফি নিয়ে অনেকদূর পড়াশোনা করেছিলেন। তার প্রমাণ আমরা গোঁসাইপুর সরগরম ছাড়াও তাঁর অন্য কয়েকটি কাহিনিতে পাই।

মৃগাঙ্ক নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরলোক চর্চাকে ব্যবহার করেছিল। ফেলুদা এই ভাঁওতাটা ধরতে পেরে যায়। এরপর রহস্য ফাঁস করার জন্য একটা অদ্ভুত পথ ধরে সে। মৃগাঙ্ক যাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করছিল, সেই শ্যামলাল মল্লিকের ছেলে জীবনলালকে নিয়ে একটা নিখুঁত নাটক সাজানো হয়।

মল্লিকবাড়ির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেই একদিন জেনে যান, জীবনলাল খুন

হয়েছেন। এরপর প্ল্যানচেটের আসরে মৃগাঙ্ককে দিয়ে জীবনলালের 'আত্মা' নামানো হয়। আর ওই প্ল্যানচেটের আসরেই ফেলুদা নাটকীয়ভাবে হাজির করে জীবিত জীবনলালকে। প্রমাণ হয়ে যায় মৃগাঙ্ক একজন ঠগ।

এই দুর্দান্ত পরিকল্পনায় একটাই অসুবিধে ছিল। জীবিত মানুষকে মৃতদেহ সাজিয়ে জনসমক্ষে ফেলে রাখা। যেটা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। কাজেই জীবনলালকে সরিয়ে ফেলতে হবে, এবং পুরো কাজটাই এমনভাবে করা দরকার যাতে প্রত্যেকেই মনে করে মৃতদেহ গায়েব হয়ে গেছে, এমনকী তোপসে লালমোহনও। ফেলুদার এই 'মেক বিলিভ' পরিকল্পনার দৃশ্যায়ন ছিল বেশ ঝক্কির। আর অনেকটা দৌড়োদৌড়ির কাজ যে সেখানে আছে, সেটা গল্পটা যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন। আমরা চেষ্টা করেছিলাম, দৃশ্যটাকে যতদূর সম্ভব নিখুঁতভাবে তুলতে।

কিন্তু সমস্যা হল ওই দৃশ্যটার চিত্রগ্রহণের দিনকয়েক আগে। অন্য এক দৃশ্যের কাজ চলাকালীন সব্যসাচীর ডান পায়ের পাতায় একটা বেয়াড়া রকমের ফ্র্যাকচার হয়ে গেল। কোনওভাবে ওর ডান পা-টা একটা দেওয়ালে জোর ধাক্কা খেয়েছিল। তাতেই ফ্র্যাকচার। আমি তো বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। পায়ে চোট নিয়ে বেণুকে দিয়ে ওই দৃশ্যটার শুটিং আদৌ করা যাবে তো? অথচ ওই দৃশ্যটার ওপরেই গোটা রহস্যভেদের পর্বটা দাঁড়িয়ে আছে, ওটাকে বাদ দেওয়া যাবে না।

আমার সংশয়ের কথা বেণুকে জানালাম। তখনও ও যন্ত্রণায় বেশ কষ্ট পাচ্ছে। সব্যসাচী কিন্তু আমাকে অভয় দিল, 'কোনও ভয় নেই বাবুদা। শুটিং হবে।'

বুঝলাম, স্রেফ মনের জোর থেকে বেণু এই কথাটা বলেছে। তাই উদ্বেগ দূর হল না।

তবে নতুন ফেলু ঠিক কতটা 'টাফ', তার প্রমাণ পেলাম দৃশ্যটার শুটিংয়ের দিনেই। ডান পায়ের পাতা থেকে গোড়ালির ওপর পর্যন্ত ব্যান্ডেজ। যন্ত্রণা যে বেশ রয়েছে, সেটা ওর স্টেপিং দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ক্যামেরার সামনে তা বোঝার উপায় নেই। সাবলীল দৌড়োদৌড়ি। টেক, রিটেক। মসৃণভাবে গোটা ব্যাপারটা উতরে দিল বেণু। দৃশ্যটার যে সমস্ত শট ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলোতে ওর মুখের চামড়া একবারের জন্যও কুঞ্চিত হতে দেখেনি। অথচ আমি জানি, ওর চোট ঠিক কতটা সাংঘাতিক ছিল।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, নিজের সুবিধে অসুবিধে বা অস্বাচ্ছন্দ্যকে বেণু কখনওই কাজের সময় সামনে আসতে দেয় না। ঠিক যেমন ওর চেহারায়

কখনওই ধরা পড়ে না ওর মানসিক অবস্থা। বাক্স রহস্য ছবিতেই ও প্রথম ফেলু সাজে। জটায়ু হিসেবে রবিকাকারও সেটাই প্রথম ছবি। বাক্স রহস্যের প্রথম দিনের প্রথম শটে রবিকাকার মতো উঁচুদরের অভিনেতাকে দেখেছিলাম কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়তে। অথচ পাশে বসে থাকা বেণুকে দেখে কে বলবে, জীবনের স্বপ্নের চরিত্রে অভিনয় করতে এসে প্রথম শটটা দিতে চলেছে! শান্ত, নিরুদ্বেগ। এখনকার প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যাকে বলবে 'কুল'!

ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে বেণু কতটা খুশি হয়েছিল, সেটা একটা ছোট্ট ঘটনা থেকেই কিছুটা বোঝা যাবে। বেশ মজার কাণ্ড। ফেলুদাকে নিয়ে বেশ কয়েকটা গল্পের শুটিং তখন হয়ে গেছে। বোধ হয় এই সময়েই একদিন ওর স্ত্রী মিঠু আমাকে ফোন করেছিল, 'বাবুদা', তুমি ফেলুদার ছবি পরপর করে যাও।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

—যতদিন ফেলুদার ছবির শুটিং চলছে, ও বেশ খোশমেজাজে রয়েছে। অন্যসময় বাড়ি ফিরে খিট খিট করে। অল্পতেই রেগে গিয়ে তুলকালাম। কিন্তু এখন যেন সম্পূর্ণ অন্য লোক। সংসারে শান্তি রয়েছে।

একবগ্গা

স্টান্ট মাস্টার

আগেই বলেছি, সব্যসাচীকে দেখেই প্রথম ফেলুদার ছবিতে কিছুটা অ্যাকশন ঢোকানোর পুরনো পরিকল্পনাটা আমি নেড়েচেড়ে দেখি। ফেলুদাকে বড় পর্দায় ফিরিয়ে আনা নিয়েও ওর সঙ্গে আমার বহুবার আলোচনা হয়েছে। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' নিয়ে ছবি করার পরিকল্পনা যখন ওকে প্রথম জানাই, বেণু ভীষণ উৎসাহিত হয়ে বলেছিল, 'বয়স থাকতে থাকতে এই ছবিটা করে নিই বাবুদা। নইলে এর পরে হয়তো অ্যাকশনের দৃশ্যগুলো আর জমাতে পারব না।'

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে গল্পে মারামারি বলতে আর কে স্টুডিওর ওই 'মক ফাইট'টা। যেখানে স্টান্ট মাস্টার ভিক্টর পেরুমলের সঙ্গে ফেলুদাও কুংফুর 'ডেমনস্ট্রেশন' দেবে। শেষ দৃশ্যটাও অবশ্য টানটান। তবে সিনেমায় আরও কয়েকটি অ্যাকশন দৃশ্য যোগ করা হয়। এবং তাদের চিত্রগ্রহণ পর্বে কয়েকটা চমকপ্রদ গল্পও রয়েছে। ওই মক ফাইটের চিত্রায়ণের গল্পটা এই পর্বে বলব। অবশ্য সেটা বলার আগে একটু পিছিয়ে যাওয়া দরকার।

একটা সময়ে আমি প্রচুর হিন্দি ছবি দেখেছি। আজ থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেও টেকনিক্যাল দিক থেকে ওরা ছিল রীতিমতো এগিয়ে। গল্প বা চিত্রনাট্য অধিকাংশ ছবিতে গতানুগতিক হলেও, কারিগরি কাজ কিছু কিছু ছবিতে হত বেশ উঁচুমানের। হিন্দি ছবিতে অ্যাকশন দৃশ্যগুলোও আমি খুঁটিয়ে দেখতাম। বেশ কিছু ছবিতে অ্যাকশনের দৃশ্যে ক্যামেরা ও সম্পাদনার কাজ আমায় টেনেছিল। 'শোলে' ছবিটার কথা বলতেই হয়। শোলের টেকনিক্যাল কাজের তারিফ বাবাও করতেন। মুম্বই চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে বাবার সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও, ওখানকার কাজের ধরন বা পরিবেশ সম্বন্ধে অনেক কিছুর খবর রাখতেন। আমার মনে আছে, 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' ছবিটার সেটে, শুটিংয়ের অবসরে, বাবা অভিনেতা আমজাদ খান এবং সঞ্জীব কুমারের কাছ থেকে শোলের স্টান্ট নিয়ে অনেক

কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন। এর পর তো স্টান্টম্যানদের নিয়ে বাবা একটা দুর্দান্ত উপন্যাসও লিখেছিলেন : মাস্টার অংশুমান।

কিন্তু হিন্দি ছবির মারামারির দৃশ্যগুলোর বিশাল দৈর্ঘ্য আমাকে বেশ পীড়া দিত। কারিগরি কাজ ভালো হওয়া সত্ত্বেও একটা অ্যাকশনের দৃশ্য স্রেফ পরিমিতি বোধের অভাবে মার খেত। এবং আমিও মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ভাবতাম, যাই, ছবিটার ফাইট ডিরেক্টরের সঙ্গেই এক হাত লড়ে আসি। এই কারণেই, বোম্বাইয়ের বোম্বেটের অ্যাকশন দৃশ্যগুলো নিয়ে আমি খুব সতর্ক ছিলাম। পর্দায় ওগুলো এসেছে অল্প সময়ের জন্য, কিন্তু তাদের গভীরতা হয়েছে সাংঘাতিক। কাঙ্ক্ষিত 'এফেক্ট' আনতে ডিজিটাল ডলবি সাউন্ডও আমাকে খুব সাহায্য করেছে।

অনেকেই জানেন, বেশির ভাগ হিন্দি ছবিতে মারামারির দৃশ্যে ফাইট ডিরেক্টরই শেষ কথা। ওই সব সিকোয়েন্সের শুটিংয়ের সময় পরিচালক মশাই মোটামুটি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন। অ্যাকশন দৃশ্য 'কোরিওগ্রাফ' করা, অর্থাৎ শট বাই শট মারামারির অভিনয়টাকে ভাগ করে ফেলার কাজ থেকে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত ফাইট ডিরেক্টরই ঠিক করে দেন।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটের মক ফাইটের দৃশ্যেও এমন এক ফাইট মাস্টারের সঙ্গে আমরা কাজ করি, এবং তিনি শুটিং পর্বে আমাদের যথেষ্ট বেগ দিয়েছিলেন। এর একটাই কারণ, আমরা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ধরাবাঁধা ছকের বাইরে গিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম।

ছবিতে মক ফাইটের দৃশ্যটা মুম্বইয়ের আর কে স্টুডিওতে ঘটলেও, আসলে ওর শুটির হয়েছিল অন্ধ্র প্রদেশের রামোজি ফিল্ম সিটির একটা ফ্লোরে। এখন, স্টুডিওয় কুংফুর ডেমনস্ট্রেশনের দৃশ্যটা নিয়ে আমার বহু দিন ধরেই চিন্তা ভাবনা করা ছিল। কুংফুর প্যাঁচকে ক্যামেরায় ঠিকভাবে তুলে আনার জন্য আমি বেশ কিছু বিখ্যাত ইংরেজি অ্যাকশন ছবিও নতুন করে দেখি। ব্রুস লি-র এন্টার দ্য ড্রাগন, রিটার্ন অফ দ্য ড্রাগন ইত্যাদি ছবিগুলোর নাম এই মুহূর্তে মনে আসছে। এইভাবে মোটামুটি একটা প্রস্তুতি নিয়ে আমি দৃশ্যটার শট ডিভিশন করি। কিন্তু শুটিংয়ের দিন ফ্লোরে গিয়ে দেখি, কাজকর্ম ঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোচ্ছে না।

ওই দৃশ্যটার জন্য আমাদের বেশ কয়েক জন ফাইটার দরকার হয়েছিল, যাদের স্টুডিও ফ্লোরে কুংফুর ডেমনস্ট্রেশন দেবে ভিক্টর পেরুমলরূপী রাজেশ শর্মা। ফেলুদা সেখানে গেলে ভিক্টর তাকে ডাকবে। শুরু হবে ভিক্টর ও ফেলুর নকল লড়াই।

ফাইটারদের দল হাজির, ভিক্টর পেরুমল, ফেলু দু'জনেই রেডি, কিন্তু বাধ সাধলেন ফাইট মাস্টার আনন্দ রাজ। ভদ্রলোক দক্ষিণী ছবির নামকরা স্টান্ট বিশারদ।

কুংফু-র প্যাঁচ পয়জারগুলো অভিনেতা ও ফাইটারদের রপ্ত করানোর জন্য তাঁকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ঠিক কী ধরনের দৃশ্যের শুটির হতে চলেছে, সেটা না বুঝে অবিকল হিন্দি বা দক্ষিণী ছবির অ্যাকশন দৃশ্যের ধাঁচে একটা লম্বা শট ডিভিশন করে রেখেছিলেন, যেটা মানতে গেলে ওই দৃশ্যের তো বটেই, ছবিটারও সর্বনাশ হয়ে যাবে। অথচ তিনি নিজের পরিকল্পনামাফিক তাঁর শাগরেদদের ট্রেনিং দিয়ে চলেছেন দেখলাম। শুধু দেখলাম না, দেখে শিউরে উঠলাম বলা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ রাজের কাছে গিয়ে দৃশ্যটার জন্য ঠিক কী ধরনের অ্যাকশন প্রয়োজন, সেটা অত্যন্ত বিনীতভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি বুঝলে তো! উলটে আকারে প্রকারে বলতে চাইলেন, অ্যাকশন দৃশ্যে ছবির পরিচালকের চুপচাপ বসে থাকাই ভালো। ওটাই নাকি নিয়ম।

এরপর আমাদের অনুরোধে ভদ্রলোক তাঁর দীর্ঘ নায়ক বনাম ভিলেন মার্কা মারামারির ছক কিছুটা বদলালেন। কিন্তু সেটা মোটেও যথেষ্ট নয়। অথচ ভদ্রলোককে বেশি ঘাঁটাতে ইচ্ছে করছিল না। দক্ষিণে স্টান্টম্যানদের বিরাট অ্যাসোসিয়েশন আছে। সবাই মিলে একজোট হয়ে শুটিং বন্ধ করে দিলে মাথায় হাত দিতে হবে।

শেষ পর্যন্ত একরকম বাধ্য হয়েই তাঁকে বললাম, 'আমরাও ছোটবেলায় ব্রুস লি-র ছবি বিস্তর দেখেছি। এই নকল মারামারি বোধ হয় সামলে নিতে পারব।'
'দয়া করে শট ডিভিশনের ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন।

অনুরোধে ভদ্রলোক নিমরাজি হলেন। তবে ভাবখানা এই : কোথাকার কে বাপু বাঙালি তোমরা, কেমন শুটিং করো দেখি একবার!

তবে কুংফুর প্যাঁচ পয়জারগুলো উনি অভিনেতাদের দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। আনন্দ রাজের মোটাসোটা চেহারা। অর্থাৎ স্টান্টম্যান বলতেই চোখের সামনে যেমনটা ভেসে ওঠে সেরকম নয়। কিন্তু ওই চেহারাতেই উনি শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে কিক্ ছুঁড়ছেন দেখে ভারী আশ্চর্য লাগল।

শুটিং ফ্লোরে বাবার লেখা গল্প অনুসরণে অনেকগুলো মোটা গদি পাতা হয়েছিল। সাধারণত এগুলোর ওপরেই ছবির ফাইটাররা অ্যাকশন দৃশ্যের

অনুশীলন করেন। এখন হায়দরাবাদের ফাইটারদের এই গদির ওপর হাত-পা ছুঁড়তে বিশেষ অসুবিধে হচ্ছিল না। ওঁরা এতে অভ্যস্ত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছিল সব্যসাচী আর রাজেশ শর্মার।

প্রথমের দিকে ওরা কিছুতেই পায়ের 'গ্রিপ' পাচ্ছিল না। কয়েকটা শট নিয়ে সমস্যাও দেখা দিল। ওদিকে আবার আনন্দ রাজ সমালোচকের চোখে তাকিয়ে।

কিন্তু সময় কিছুটা গড়াতেই ছবিটা বদলে গেল। বরাবরের মতো এবারেও দৃশ্যটা দুর্দান্তভাবে উতরে দিল সব্যসাচী। গদির ওপর ওর হাত-পা ছোঁড়া দেখে মনে হচ্ছিল বয়সটা বোধ হয় কোনও মন্ত্রবলে বিশ বছর কমে গেছে। সেই সঙ্গে রাজেশেরও জবাব নেই।

দৃশ্যগ্রহণের কাজ যত এগোচ্ছিল, বুঝতে পারছিলাম, আমাদের সম্বন্ধে আনন্দ রাজের ধারণাটা বদলাচ্ছে। শুটিংয়ের মধ্যপর্বে এসে ভদ্রলোককে স্বীকার করতেই হল, 'কাজটা তোমরা দারুণ করেছ। জবাব নেই।'

দৃশ্যগ্রহণের বাকি অংশটায় উনি আমাদের ভীষণ ভাবে সাহায্য করেছিলেন।

জটায়ু'রা

রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুর আত্মপ্রকাশ সোনার কেল্লা উপন্যাসে। ১৯৭১ সালে। এর ঠিক এক বছর আগে বাবা পাহাড়ের পটভূমিকায় 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' উপন্যাসটা লেখেন। তাতে জটায়ু নেই ঠিকই, কিন্তু 'রিলিফ ক্যারেক্টর' হিসাবে ফেলু ও তোপসের সঙ্গী হয়েছেন নিশিকান্ত সরকার। এই নিশিকান্ত সরকারের সঙ্গে কিন্তু জটায়ুর অদ্ভুত চারিত্রিক মিল। গ্যাংটকে গণ্ডগোল পড়লে মনে হতেই পারে, জটায়ুর আবির্ভাবের প্রস্তুতি যেন নিশিকান্ত সরকারের মধ্যে দিয়েই নিতে শুরু করেছেন বাবা। ফেলুদার রহস্যভেদের টানটান উত্তেজনার ফাঁকে ফোকরে জটায়ুর নানান মজার কাণ্ডকারখানা পাঠকদের সাময়িক 'রিলিফ' যেমন দিয়েছে, তেমনি তিন চরিত্রের মেলবন্ধনে ফেলুদার কাহিনিগুলোও পূর্ণতা পেয়েছে। আবির্ভাবেই জটায়ুর জনপ্রিয়তা হয়েছিল এমন যে, অনেকে বাবাকে ফোন করে জানতে চাইতেন 'পরের জটায়ুর গল্প কবে বেরোচ্ছে!'

ফেলুদা নিয়ে লেখায় তাই জটায়ুকে দূরে সরিয়ে রাখাটা খুবই অনুচিত হবে। বাবার ইউনিটের অন্যতম সদস্য এবং স্বাধীন পরিচালক হিসেবে এক বিরল অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। মোট পাঁচজন জটায়ুর সঙ্গে আমি কাজ করেছি। সন্তোষ দত্ত, মোহন আগাসে, রবি ঘোষ, অনুপকুমার এবং বিভু ভট্টাচার্য। এঁদের মধ্যে সন্তোষদা ছাড়া বাকি চারজনই আমার ছবির জটায়ু। এঁদের কথা তো বলবই, তবে সবার আগে সন্তোষ দত্ত, জটায়ু নামটা উচ্চারিত হলেই অবশ্যম্ভাবী ভাবে যাঁর চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যাঁকে দেখে বাবা ইলাস্ট্রেশনে জটায়ুর চেহারাটা বদলে দেন।

অভিনেতা সন্তোষদার মুনশিয়ানা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে একটা ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ না করলে বোঝা যাবে না, শুধু দর্শক নয়, জটায়ু চরিত্রের সঙ্গে সন্তোষদার একাত্মতা সতীর্থ অভিনেতাদের কাছেও কতটা শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছিল।

এটা উনি চলে যাওয়ার অনেক পরের কথা। বাক্স রহস্য ছবিটা করার আগে জটায়ু চরিত্রে রবিকাকাকে নেওয়ার বিষয়ে মনস্থির করেছি। কথাটা রবিকাকাকে টেলিফোনে জানালাম। ওঁর মতো জাঁদরেল অভিনেতাও আমার প্রস্তাবটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর গুনে গুনে ঠিক তিনটে শব্দ উচ্চারণ করলেন, এবং তাতেই স্পষ্ট, সন্তোষদার জটায়ুকে উনি ঠিক কী চোখে দেখতেন : 'বাবা! জটায়ু! সন্তোষ দত্ত!'

সোনার কেল্লায় বাবা লিখেছেন জটায়ুর বাড়ি বৈদ্যবাটিতে। তবে পরের কাহিনিতেই সেটা বদলে হল উত্তর কলকাতার গড়পার। এই গড়পারেই ছিল আমাদের আসল বাড়ি। ছেলেবেলায় কয়েকটা বছর গড়পারে কাটিয়ে বাবাকে বকুলবাগানে চলে আসতে হলেও, গড়পারের বাড়ির স্মৃতি তাঁর মনে আজীবন ছিল সজীব। এই গড়পারের বাড়িতেই ছিলেন কুলদারঞ্জন রায়, বাবা যাঁকে ধনদাদু বলে ডাকতেন। ছেলেবেলায় বাবার দেখা অন্যতম বর্ণময় চরিত্র কুলদারঞ্জন। গল্প বলায় আশ্চর্য রকমের দক্ষতা ছিল তাঁর। ছোটদের জন্য ইলিয়ড ও ওডিসি, পুরাণের গল্প, বেতাল পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি বেশ কয়েকটা ভালো বইও তিনি লিখেছিলেন। গড়পারের বাড়িতেই ছিল তাঁর স্টুডিও, সেখানে ফটো ফিনিশের কাজ হত, এবং তাতেও ধনদাদুর হাত ছিল দুর্দান্ত। আর ছিলেন বাবার দুই কাকা, সুবিনয় ও সুবিমল রায়। আমার দাদু, সুকুমার রায় পরলোকগত হওয়ার পর কয়েক বছরের জন্য সন্দেশ পত্রিকা চালানোর ভার সুবিনয় রায়ের হাতে গিয়ে পড়ে। তাঁরও লেখার হাত ছিল দুর্দান্ত। আর সুবিমল রায় ভাইপো মানিককে যত রাজ্যের আজগুবি গল্প শোনাতেন। অর্থাৎ গড়পারের বাড়িতে বাবার দেখা চরিত্রদের অনেকেই গল্প বলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

তাই গল্পলেখক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুকে বাবা যখন সেই গড়পারেই এনে ফেললেন, তখন মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, ছেলেবেলার উজ্জ্বল স্মৃতিটাই হয়তো তাঁর এই কাজকে প্রভাবিত করে থাকবে। এই ধারণার বাস্তব ভিত্তি কতটা তা এখন আর জানার উপায় নেই। গড়পারে জটায়ুর মতো হাস্যকর কোনও চরিত্রকে দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল কি না, সেটাও বাবা কোনও দিন স্পষ্ট করে বলেননি। কিন্তু জটায়ু চরিত্রটা যে গড়পারের প্রতি তাঁর একটা 'নস্ট্যালজিক স্যালিউট', সেটা ভেবে নেওয়ার কারণ বোধহয় যথেষ্টই রয়েছে।

ফিরে আসি সন্তোষদার কথায়। উনি যে একজন দক্ষ আইনজীবী ছিলেন, সেটা অনেকেই জানেন। ফৌজদারি মামলা করতেন। পর্দার সন্তোষদার সঙ্গে

আসল সন্তোষদার অনেক মিল ছিল। বেশি কথা বলতেন না, কিন্তু রসবোধ ছিল দুর্দান্ত। আদালতে ওঁর সওয়াল শুনে বিচারপতি তো বটেই, আসামিও নাকি হেসে ফেলতেন।

সেই পরশপাথর ছবি থেকে বাবার সঙ্গে যুক্ত, আমাদের বাড়িতে ওঁর যাতায়াত ছিল খুবই। কোনও ছবির শুটিংয়ের আগে বাবা সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে বসে স্ক্রিপ পড়তেন। সে এক জমজমাট আসর। সোনার কেল্লা ও জয় বাবা ফেলুনাথ ছবি দুটোর শুটিংয়ের আগে এই রকম আসরেই সন্তোষদাকে জটায়ুর চরিত্রটা ভালো করে বোঝানোর জন্য বাবা অভিনয় করে দেখাতেন। সন্তোষদা মন দিয়ে বাবাকে লক্ষ করতেন বলে মনে আছে। সোনার কেল্লা ছবিটার একেবারে পরিকল্পনার স্তর থেকেই আমরা জানতাম, সন্তোষদা জটায়ু হচ্ছেন। চরিত্রটার জন্য মেক আপ হিসেবে ওঁকে শুধু একটা গোঁফ লাগাতে হয়েছিল। বাবা তাঁর ছবির অভিনেতাদের সংলাপ মুখস্থ করতে বারণ করতেন যাতে ক্যামেরার সামনে তাঁদের কথাবার্তা স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এই পদ্ধতিতে ভালো অভিনেতাদের 'ইম্প্রোভাইজ' করারও অনেক সুযোগ থাকে। সন্তোষদার ইম্প্রোভাইজেশন ছিল দুর্দান্ত। বহুবার এমন হয়েছে, রিহার্সালে কোনও ডায়লগ যেভাবে বলেছেন, শট দেওয়ার সময় সেটা হয়ে গেছে অন্যরকম। এবং জিনিসটা বাবার পছন্দও হয়েছে।

অভিনেতাদের বাবা এতটা স্বাধীনতা দিতেন বলেই একেবারে শটের আগে পর্যন্ত ডায়ালগে ছোটখাট পরিবর্তন ঘটত। তবে দেখতাম, মাঝেমধ্যে সন্তোষদাকে বলছেন, 'ইম্প্রোভাইজেশনটা একটু বেশি হয়ে গেল সন্তোষ। স্ক্রিপ্ট-এ ফিরে এস।' 'হীরক রাজার দেশে' ছবিটার শুটিং-এর সময় তো উনি সন্তোষদাকে আগে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, 'সমস্ত ডায়ালগই ছন্দে লেখা। কাজেই সন্তোষ, এখানে বেশি কেরামতি দেখাতে যেও না।'

সোনার কেল্লা আর জয় বাবা ফেলুনাথ, এই দুটো ছবির শুটিং পর্বের বহু মজার গল্প বাবা 'একেই বলে শুটিং' বইটাতে লিখেছেন। সেগুলোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন সন্তোষদা। সে সব গল্প আর নতুন করে বলার কোনও প্রয়োজন নেই। এখানে বরং অন্য একটা গল্প আমি শোনাব, যেটা বাবা কোথাও লেখেননি। এটাও জয় বাবা ফেলুনাথের শুটিং পর্বেরই ঘটনা, এবং পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন সন্তোষদা।

কাশীতে বিশ্বনাথ মন্দির থেকে কিছু দূরে জ্ঞানবাপী। আওরঙ্গজেবের বিখ্যাত

মসজিদ এখানেই। বাবার কাহিনি অনুযায়ী, এখান থেকে একটা গলি ধরে পূর্ব দিকে কিছুটা এগিয়ে ফেলুর দুর্দান্ত প্রতিপক্ষ মগনলাল মেঘরাজের আস্তানা। এক ঝলমলে দুপুরে ফেলু, তোপসে আর জটায়ু হাজির মগনলালের আস্তানায়। মগনলাল ফেলুকে ঘোষালবাড়ির তদন্তের কাজটা ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেবে। বিনিময়ে ফেলুর জন্য মোটা অঙ্কের ঘুষ। কিন্তু ফেলু ঘুষ নিয়ে মামলা ছাড়তে অসম্মত হলে 'আঙ্কল' জটায়ুকে হেনস্থা করবে মগনলাল।

জটায়ুকে নিয়ে মগনলাল যে বরাবরই রসিকতা করতে পছন্দ করে, সেটা বাবা লিখেছেন। এই রসিকতা অধিকাংশ সময়েই অত্যন্ত বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়, এবং তার শুরু এই 'জয় বাবা ফেলুনাথ' উপন্যাসেই। 'ফেলুদা অ্যান্ড কোং'-এর সঙ্গে মগনলালের দ্বিতীয় টক্কর 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' উপন্যাসে। তৃতীয়টা 'গোলাপী মুক্তো রহস্য'য়। সেবার তো মগনলাল জটায়ুকে 'রবীন্দরনাথ টেগোরে'র গান গাইয়ে ছেড়েছে।

জয় বাবা ফেলুনাথে ফিরে আসি। ঘুষ নিতে ফেলুদা অসম্মত হলে মগনলাল অর্জুনকে ডাকে। অর্জুন আগে সার্কাসে 'নাইফ থ্রোয়িং'-এর খেলা দেখাত। এবার জটায়ুকে একটা 'ডার্ট বোর্ডে'র মতো নকশাকাটা কাঠের তক্তার সামনে দাঁড় করিয়ে শুরু হয় অর্জুনের ছুরি ছোঁড়ার লোমহর্ষক খেলা।

বাবা ভেবেছিলেন কোনও পেশাদার 'জাগলার'কে দিয়ে অর্জুনের ভূমিকায় অভিনয় করাবেন, যাঁর 'নাইফ থ্রোয়িং'-এর কেরামতিটাও আয়ত্তে আছে। কাঠের তক্তার সামনে জটায়ুকে আদৌ দাঁড় করানো যাবে কিনা, সে বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত তখনও নেওয়া হয়নি। বাবা আসলে জাগলারের দক্ষতাটা যাচাই করে নিতে চাইছিলেন। 'নাইফ থ্রোয়িং'-এর জাগলার যথেষ্ট দড় না হলে সন্তোষদাকে কাঠের বোর্ডের সামনে দাঁড় করানোটা, বলাই বাহুল্য, মারাত্মক ঝুঁকির কাজ হয়ে যেত।

একজন জাগলার এলেন। তাঁকে পরীক্ষা করে দেখা হল। একটা বোর্ডের ওপর যেখানে যেখানে 'টার্গেট' এঁকে দিলেন বাবা, ছুরিগুলো তাদের প্রায় একহাত এদিক ওদিকে গিয়ে বিঁধতে লাগল। কয়েকটা আবার খুলে মাটিতে পড়েও গেল।

নাইফ থ্রোয়িং-এর ছুরি ওজনে বেশ ভারী। নির্দিষ্ট গতিবেগ দিয়ে ছুঁড়লে সেটা যাতে সটান বোর্ডে গিয়ে গেঁথে যেতে পারে, সে জন্যই এই ওজন। ছুরিগুলো যদি একটার পর একটা বোর্ডে গিয়ে গাঁথতে না থাকে, তাহলে খেলার মজা দর্শকরা নিতে পারবেন না। আবার ছুরি সামান্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই মহা বিপদ।

তাই ঠিক হল, "দৃশ্যটায় কিছু ট্রিক স্পট" ব্যবহার করা হবে। কিন্তু কয়েকটা শটে তো জটায়ুকে তক্তার সামনে দাঁড় করাতেই হবে। নইলে দর্শকদের কাছে দৃশ্যটা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে না। অথচ জাগলারের লক্ষ্যভেদের যা নমুনা, তাতে ওই একটা দু'টো শটও সন্তোষদার জীবন সংশয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বাবা বুঝতে পারলেন, ওই জাগলারকে দিয়ে কাজটা করানো যাবে না। অথচ সময়মতো আর কাউকে খুঁজেও পাওয়া গেল না। দৃশ্যটা নিয়ে উনি ভাবনাচিন্তা করতে লাগলেন, তবে সন্তোষদাকে স্ক্রিপ্ট পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাতে লেখা আছে, অর্জুনরূপী কামু মুখোপাধ্যায় সন্তোষদার দিকে ছুরি ছুঁড়বেন। দৃশ্যটা কীভাবে তোলা হবে, সে কথা কিন্তু ওতে লেখা ছিল না। বাবা অভিনেতাদের যে স্ক্রিপ্ট পড়তে দিতেন, তাতে কারিগরি খুঁটিনাটি লেখা থাকত না। কাজেই সন্তোষদা যখন দৃশ্যটার কথা পড়লেন, তখন তাঁর হৃৎপিণ্ডটা নিশ্চয়ই একবারের জন্য কেঁপে উঠেছিল।

সন্তোষদা সত্যিই বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। সে কথা উনি ছোটদের একটা পত্রিকায় লিখেও ছিলেন। 'জটায়ুর মৃত্যু প্রতীক্ষা'। তার একটা কপি আমার কাছে আছে, কেউ চাইলে পড়তে দিতে পারি।

১৬মে ১৯৭৮। ইন্দ্রপুরী স্টুডিও। 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবির ভয়ংকর সেই দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ। স্টুডিওর একটা ফ্লোরে তৈরি করা হয়েছে মগনলালের বৈঠকখানা। অর্জুনের ছুরি যেখানে একটার পর একটা গিয়ে বিঁধবে, সেই কাঠের বোর্ড তৈরি। তার ওপর বাবা একটা রাক্ষসের ছবির আউটলাইন করে দিয়েছেন। সেট-শিল্পীরা তার ওপর রং করেছেন। সব মিলিয়ে জমজমাট ব্যাপার।

দৃশ্যগ্রহণ শুরু হল। প্রথমে কামু মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে ছুরি ছোঁড়ার দৃশ্যটা তোলা হল। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। বেশ কয়েকটা শটে জটায়ুও আছেন। তবে সেগুলো ছুরি ছোঁড়ার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। ছবিটা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বুঝবেন আমি কোন শটগুলোর কথা বলছি। আর, যে শটগুলোয় কামুকাকু ছুরি ছুঁড়ে দিচ্ছেন, সেগুলোয় বলাই বাহুল্য উলটোদিকে জটায়ু নেই।

এরপর সেইসব মোক্ষম শট, যেখানে দেখানো হচ্ছে, সন্তোষদার শরীরের চারপাশে ছুরিগুলো এসে বিঁধে যাচ্ছে।

রাক্ষসের ছবি আঁকা সেই বোর্ডটার সামনে সন্তোষদাকে এনে দাঁড় করানো হল।

আশ্চর্য! একটা ছুরিও কিন্তু ওঁর দিকে লক্ষ করে ছোঁড়া হল না।

বরং সন্তোষদার শরীর থেকে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি দূরত্বের ব্যবধানে ছুরিগুলোকে বোর্ডের গায়ে পর পর গেঁথে দেওয়া হল। প্রত্যেকটা ছুরির পিছনে বাঁধা সরু নাইলনের তার, যা ক্যামেরায় ধরা পড়বে না। ক্যামেরার চোখের বাইরে থেকে সেই তারগুলোকে টান টান করে ধরেছিলাম আমি এবং আরও কয়েকজন। এবার ক্যামেরা চালু হল। উলটো গতিতে। যাকে বলে 'রিভার্স মোশন ফটোগ্রাফি'। আমরা একটা নাইলনের তার ধরে হ্যাঁচকা টান দিচ্ছি, এক-একটা করে ছুরি বোর্ড থেকে খুলে ছিটকে বেরিয়ে আসছে, আর সেই দৃশ্য উলটো গতিতে তুলে নিচ্ছে ক্যামেরা। যার অর্থ, এই ছবি যখন প্রোজেক্টরে সাধারণ গতিতে চলবে, তখন দেখা যাবে একের পর এক ছুরি এসে বিদ্যুৎগতিতে সন্তোষদার চারপাশে গেঁথে যাচ্ছে। এইভাবে বেশ কয়েকটা শট নেওয়া হল।

বাবার এই দুর্দান্ত পরিকল্পনা পর্দায় ঠিক কী চেহারা নিয়েছিল সেটা আর নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। তবে শুটিং-এর পর একটা 'টেকনিক্যাল' ত্রুটি মনের মধ্যে অস্বস্তি তৈরি করছিল। দেখেছিলাম, নাইলনের তারে টান দিয়ে ছুরিগুলো তুলে আনার পর বোর্ডের ওপর ছোট ছোট দাগ হয়ে যাচ্ছে। ক্যামেরাতেও তা ভালোই ধরা পড়ছিল। এখন, দৃশ্যটা রিভার্স মোশনে তোলা, অর্থাৎ দর্শক দৃশ্যগ্রহণের সময়ের সর্বশেষ মুহূর্তটা সবচেয়ে আগে দেখবেন। কাজেই প্রথম দু'একটা ছুরি বোর্ডে এসে গেঁথে যাওয়ার সময় একটু লক্ষ করলে, অন্যান্য গর্তগুলোও ভালোই বুঝতে পারার কথা। পরে শুটিং-এর রাশ দেখে বুঝলাম ঠিক সেটাই হয়েছে।

তাহলে কি দর্শকরা ফাঁকিটা ধরে ফেলবেন?

বাবাকে দুশ্চিন্তার কথা বললাম। কিন্তু বাবা আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'ওই দৃশ্যটায় এতটাই টানটান উত্তেজনা থাকবে, ছোট্ট ভুলটা দর্শকের চোখেই পড়বে না।'

সত্যিই কি তাই হবে? সন্দেহ একটু রয়েই গেল। ছবি রিলিজ করল। এবং অবাক হয়ে দেখলাম ছুরির দাগগুলো সত্যিই কারও নজরে এল না। আর সত্যি কথা বলতে, বাবার এই দুর্দান্ত এফেক্টের ফাঁকিটা গত ২৬ বছরেও কেউ ধরতে পারেননি। পারেননি বলেই সেদিনের ঘটনা এমন জমিয়ে লেখার সুযোগ আজ হল।

আসলে একেই বলে আত্মবিশ্বাস। শুটিং-এর পরে যে খুঁতটা আমার চোখে

ধরা পড়েছিল, বাবা সেটাকে হয়তো পরিকল্পনার স্তরেই আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু চলচ্চিত্রের কারিগরি বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান এবং দীর্ঘদিন ওতপ্রোতভাবে এই মাধ্যমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার অভিজ্ঞতাতেই উনি বুঝেছিলেন, খুঁতটা মোটেই দর্শকদের চোখে পড়বে না।

আর একটা কথা তো বলাই হয়নি। রিভার্স মোশনে সিনেমার ছবি তুললে, তা দেখার সময় অভিনেতার অভিব্যক্তি উলটো হয়ে যায়। অর্থাৎ, হয়তো কেউ গম্ভীর মুখ থেকে হেসে ফেললেন। রিভার্সে ছবি তুললে মনে হবে হাসি গুটিয়ে গিয়ে মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ছুরি খেলার দৃশ্যটায় সন্তোষদার অভিব্যক্তি কিন্তু যথাযথই লেগেছিল। আসলে বাবা ওঁকে বলে দিয়েছিলেন তক্তা থেকে প্রতিবার ছুরি খুলে বেরিয়ে আসার সময় উলটো 'রিঅ্যাকশন' দিতে। এটা প্রচণ্ড শক্ত একটা কাজ। কিন্তু ঠিক কতটা নিখুঁতভাবে সন্তোষদা কাজটা করেছিলেন, সেই দৃশ্যটা দেখলেই বোঝা যায়।

অভিনয়ের প্রতি সন্তোষদার 'কমিটমেন্ট' ছিল সাংঘাতিক। ঠিক যেমন 'ডিটেলস'-এর বিস্তর গোঁজামিল সত্ত্বেও লোমহর্ষক সাহিত্য রচনায় জটায়ুর নিষ্ঠা। জবাব নেই। এবং সে কথাটা বাবা জয় বাবা ফেলুনাথ উপন্যাসের একেবারে এই দৃশ্যটাতেই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রাণ হাতে করে যখন জটায়ু অর্জুনের ছুরির মুখোমুখি হতে চলেছে, তখন তার মুখ থেকে এই কথাটা বেরিয়ে আসে, 'বেঁচে থাকলে....প প-প্লটের আর....চি-হি-হিন্তা নেই।' সিনেমায় অবশ্য এই সংলাপটা ব্যবহার করা হয়নি।

এরপরেও সাহিত্যিক জটায়ুর সম্বন্ধে নাক কোঁচকানো উচিত হবে?

* * *

'গোঁসাইপুর সরগরম' এর সম্পাদনার কাজ হচ্ছিল ছবিটার প্রযোজকের স্টুডিওতে। এর আগে 'বাক্স রহস্য' গল্পটা নিয়ে ছবি করেছি। সম্পূর্ণ নতুন ফেলু, তোপসে আর জটায়ুকে সেই ছবিতে দেখা গিয়েছে। নতুন 'ট্রায়ো'কে নিয়ে এটা দ্বিতীয় ছবি। শুটিং শেষ হয়েছে। ছবিটার সম্পাদনার জন্য ওই প্রযোজকের স্টুডিওতে ক'দিন ধরে যাতায়াত করছিলাম।

সময়টা সম্ভবত দুপুরের দিকে হবে। সব্যসাচী, রবিকাকা এবং শাশ্বতকে নিয়ে একটা বেশ জটিল দৃশ্যের এডিটিং চলছে। এমন সময় ছবিটার প্রযোজক এলেন। প্রোডাকশান সংক্রান্ত কয়েকটি কথাবার্তা হল। এরপর উনি হঠাৎই বললেন,

'শুনেছেন, রবি ঘোষ মারা গেছেন।'

প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি। এতটাই আকস্মিক, সাধারণ এবং সাবলীলভাবে কথাটা উনি বললেন, বক্তব্যটা আমার মাথার ওপর দিয়েই গেল। তার পরেই যেন একটা বড় ঝটকা। কী বললেন উনি? ঠিক বললেন তো?

নিশ্চিত হওয়ার জন্য এবার আমিই জিজ্ঞেস করলাম, কে মারা গেছেন?

—রবি ঘোষ।

চোখের সামনে যেন অন্ধকার দেখলাম। একটু সামলে ওঠার পরেও মুখে কথা জোগাচ্ছিল না। রবিকাকার সঙ্গে আমাদের গোটা পরিবারের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক। ওঁর মৃত্যু সংবাদে আমার ভিতর নিজের লোক হারানোর মতো শূন্যতা তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু, বলতে দ্বিধা নেই, ওই মুহূর্তেও একটা অত্যন্ত 'প্রোফেশনাল' প্রশ্ন প্রকট হল। এবার জটায়ু কে করবেন? দূরদর্শনের সিরিজ তো দেখানো শুরু হয়ে গেছে।

তখনও এডিট শ্যুটের ভিতরেই সবাই বসে ছিলাম। হঠাৎ ভিডিও মনিটরগুলোর দিকে চোখ পড়ল। চমকে উঠলাম। দুটো মনিটরেই রবিকাকা। আশ্চর্য লাগল! যে মানুষটা আমার সামনে টিভির পরদায় রয়েছেন, কয়েকদিন আগেও যাঁকে সঙ্গে নিয়ে হইহই করে হেতমপুর থেকে 'গোঁসাইপুর সরগরম' ছবিটার শুটিং করে এলাম, সেই রবিকাকাই হঠাৎ নেই। বিশ্বাসই হয় না।

রবিকাকার সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্পর্ক সেই '৬২ সাল থেকে। সে বছরেই 'অভিযান' ছবিটার শুটিং হয়। ছবিটা মুক্তি পায় ওই বছরেই। এরপর ধীরে ধীরে রবিকাকা আমাদের বাড়িরই একজন হয়ে উঠতে থাকেন। আমাদের সঙ্গে এত ওতপ্রোত সম্পর্ক এক সৌমিত্রকাকা ছাড়া আর কারও ছিল বলে আমার মনে হয় না।

বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন অনেকেই আমাদের বাড়িতে নিয়মিত আসতেন। কেউ পেশার খাতিরে, কেউ বা নিছক সম্পর্কের টানে। কেউ কেউ আবার এই দুটো কারণেই। রবিকাকা পড়তেন এই শেষের গোত্রে। তাঁর উপস্থিতি আমাদের বাড়িতে একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাবা চলে যাওয়ার পর কিন্তু অনেকেই আমাদের বাড়িতে আসা যাওয়াটা কমিয়ে দেন। যাঁরা আগে প্রতি সপ্তাহে বাবার বসার ঘরে মুখ দেখিয়ে যেতেন, তাঁরা কদাচিৎ আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করতে আসতেন। এক নম্বর বিশপ লেফ্রয় রোডের সেই জমজমাট পরিবেশ অনেক ফিকে হয়ে এসেছিল।

ব্যতিক্রম কিন্তু রবিকাকা। উনি প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে নিয়ম করে আসতেন। প্রত্যেকের খোঁজ খবর নিতেন। বেশ বুঝতে পারতাম, বাবার অবর্তমানে এটাকে উনি নিজের দায়িত্ব হিসেবে ধরে নিয়েছেন।

আগেকার তুলনায় আমাদের বাড়িটা অনেক চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রবিকাকা যখনই আসতেন, মুহূর্তের মধ্যেই বাড়ির আবহাওয়াটাই যেন বদলে যেত। আমাদের ফ্ল্যাটটা বাড়ির তিন তলায়। লোকজনের আসা-যাওয়া চলে, তাই ফ্ল্যাটের মূল দরজাটা অনেক সময়েই আধখোলা করে রেখে দেওয়া হয়। রবিকাকা, এখনও স্পষ্ট যেন শুনতে পাই, সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওই দরজার বাইরে থেকেই তাঁর সেই মার্কামারা ভঙ্গিতে জোরে ডাক দিতেন, 'কই..বাবু....।'

ব্যাস। প্রায় ম্যাজিকের মতো আমাদের বাইরের বসার ঘরের আবহাওয়ার যেন একটা 'ক্যাটাগরিক্যাল চেঞ্জ' ঘটে যেত।

'অভিযান' ছবিতে ড্রাইভার নরসিং'য়ের শাগরেদ হিসেবে রবিকাকার অভিনয় ভোলার নয়। এই প্রসঙ্গেই আসে ওঁর 'ফিজিক্যাল অ্যাকটিং' এর কথা। বাবাও রবিকাকার এই গুণটা খুব পছন্দ করতেন। আসলে অল্পবয়েসে রবিকাকা রীতিমতো শরীরচর্চা করতেন। ডাম্বেল ভাঁজার অভ্যেস ছিল। তাই শরীর ছিল অত ফিট। তাছাড়া থিয়েটার করতেন। থিয়েটারের ভালো অভিনেতাদের 'ফিজিক্যাল অ্যাক্টিং' ভালোই রপ্ত থাকে।

'বাক্স রহস্যয়' রবিকাকার 'জটায়ু'কে দেখে অনেকেরই বিশেষ পছন্দ হয়নি। আসলে দর্শকদের মনে তখনও গেঁথে ছিলেন সন্তোষ দত্ত। তাই তুলনাটা বারবার এসেছে। তবে রবিকাকা তাঁর নিজের মতো করে অভিনয় করে যাচ্ছিলেন।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, প্রথম ছবিটায় জটায়ু চরিত্রটা আত্মস্থ করতে ওঁর একটু অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু ঠিক পরের ছবিতেই উনি কিন্তু বেশ স্বাভাবিক হয়ে এসেছিলেন। আরও কয়েকটা ছবিতে যদি এই চরিত্রটা করার সুযোগ পেতেন, তাহলে হয়তো জটায়ুর ক্যানভাসে আরও কয়েকটা নতুন রংয়ের প্রলেপ পড়ত। সেটা আর সম্ভব হল না।

'ফেলুদা'র ছবির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও আর একটা বিশেষ ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। এটা 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির শুটিংয়ের কিছুদিন আগেকার কথা। তখন আমি অনেক ছোট, স্কুলে পড়ি। পরে বাবার কাছে এই প্রশ্নটা শুনেছিলাম।

গু গা বা বা ছবিটার প্রযোজক পেতে খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছিল

বাবাকে। আসলে তখন পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে। কোনও প্রযোজকই টাকা লগ্নি করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। তৎকালীন ফিল্ম ফাইনান্স কর্পোরেশন ছবিটার প্রযোজনায় সাহায্য করবে বলে জানিয়েছিল। কিন্তু সে সম্ভাবনাও বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ শুটিংয়ের জন্যে তখন বাবা একদম তৈরি।

এর কিছুদিন আগে মুম্বইয়ের এক অভিনেতা তথা প্রযোজকের সঙ্গে বাবার আলাপ হয়েছিল। তিনি বাবার কোনও ছবি 'শর্তহীন' ভাবে প্রযোজনা করতে চান বলে জানিয়েছিলেন। গু গা বা বা তিনি প্রযোজনা করবেন কি না জানতে চেয়ে বাবা সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই উত্তর এসে গেল। ভদ্রলোক ছবিটা প্রযোজনা করতে রাজি। কিন্তু তাঁর ভাই এবং বাবাকে ছবিটার দুই মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে দিতে হবে।

অথচ তখন বাঘার চরিত্রে রবিকাকার নির্বাচন হয়ে গেছে। তপেনকাকার গুপী চরিত্রে অভিনয় করাটাও একরকম নিশ্চিত। প্রযোজকের শর্ত মানলে এই দু'জনকে বাদ দিতে হয়।

বাবা ওই প্রযোজকের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। মুম্বইয়ের অভিনেতাদের গুপী ও বাঘা সাজিয়ে ছবিটার সর্বনাশ তিনি করতে চাননি।

অথচ তখন পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে কলকাতার যা পরিস্থিতি, তাতে আবার কবে প্রযোজক পাওয়া যাবে তার স্থিরতা নেই। এই প্রেক্ষিতে ওই প্রযোজকের প্রস্তাব ফেরানোটা একটু শক্ত কাজই ছিল। অন্তত একজন স্বাধীন পরিচালক হিসেবে আমার আজ তাই মনে হয়।

বাবার 'কনফিডেন্স লেভেল' ছিল সাংঘাতিক। যা করবেন বলে মনস্থির করেছিলেন, তার একচুল এধার ওধার হল না। আসলে এর আগে বাবার দুটো ছবিতে অভিনয় করেছেন রবিকাকা। 'অভিযান' ও 'মহাপুরুষ'। ওই দুটো ছবিতে ওঁর পারফরমেন্স বাবাকেও অবাক করেছিল। পরে গু গা বা বা-র চিত্রনাট্য যখন তিনি লিখতে বসেন, তখন বাঘা হিসেবে রবিকাকার নামই সম্ভবত প্রথম থেকে ভেবে রেখেছিলেন। সে জায়গায় মুম্বইয়ের অভিনেতা নেওয়ার কথাটা উনি ভাবতেই পারেননি।

রবিকাকা যখন মারা গেলেন, তখন দূরদর্শনে ফেলুদাকে নিয়ে সিরিজটা যে চলছে, সেটা আগেই বলেছি। আরও কয়েকটা গল্পের তখনও চিত্রায়ন বাকি।

খুব তাড়াতাড়ি নতুন জটায়ু খুঁজে বের করা দরকার। তখন টিভিতে দেখানো হচ্ছে বাক্স রহস্য, এডিটিং চলছে 'গোঁসাইপুর সরগরম'-এর এবং 'শেয়াল দেবতা রহস্য'র শুটিং শেষ হয়েছে। পরিকল্পনা ছিল, 'বাক্স রহস্য'র পর শেয়াল দেবতা রহস্য দেখানোর। কিন্তু রবিকাকার স্মৃতিতে উৎসর্গ করে আমরা 'গোঁসাইপুর সরগরম'কেই এগিয়ে আনলাম। এতে একটা সুবিধাও হল। 'শেয়াল দেবতা রহস্য'য় জটায়ু নেই। অর্থাৎ নতুন জটায়ুকে দেখার আগে দর্শকরা কিছুটা সময় পাচ্ছেন। কোনও চরিত্রে আকস্মিকভাবে অভিনেতার পরিবর্তন হলে মেনে নিতে একটু অসুবিধে তো হয়েই থাকে।

তখনই কেউ একজন আমাকে বিভু ভট্টাচার্যের নামটা বলেছিলেন। কিন্তু তখন আবার উনি গোপাল ভাঁড়ের অভিনয় করছেন টিভিতে। আমার মনে হয়েছিল, বিভুদাকে তখন আমাদের ইউনিটে নিলে গোপাল ভাঁড় হিসেবে ওঁর খ্যাতিটা জটায়ুর ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সেটা একটু অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াত। তাছাড়া ওই সিরিয়ালটার জন্যেই আমাদের সময় দিতে উনি সমস্যায় পড়তে পারতেন। তবে ওঁর চেহারাটা যে জটায়ুর পক্ষে বেশ মানানসই, সেটা তখনই দেখে নিয়েছিলাম।

এরপর অনেকেই অনুপকুমারের নাম করেছিলেন। আমি একটু ইতস্তত করেছিলাম। কারণ ওঁর চেহারাটা তখন আবার জটায়ুর পক্ষে একেবারেই মানানসই ছিল না। বরং 'সোনার কেল্লা'র আগে বাবা জটায়ুর যে সব ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন, সেগুলোর সঙ্গে অনুপদার অল্পবিস্তর মিল ছিল। তবে তখন আর বেশি চিন্তা ভাবনা করার নেই। অনুপকুমারকেই জটায়ুর ভূমিকায় নেওয়া হল। নইলে দূরদর্শনকে পর পর এপিসোডের জোগান দেওয়াটা সম্ভব হত না।

কিন্তু জটায়ুর চরিত্রে অনুপকুমারকে দর্শকদের একেবারেই পছন্দ হল না। আমিও বুঝেছিলাম, উনি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও জটায়ু-সুলভ ব্যাপারটা ঠিক আসছে না। দু-তিনটে বিষয় অনুপকুমারের সামনে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রথমত, উনি আগে কোনওদিন আমাদের ইউনিটে কাজ করেননি। ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগছিল। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত জীবনে সব্যসাচী এবং শাশ্বতর সঙ্গে রবিকাকার যে দারুণ সম্পর্কটা ছিল, সেটা পর্দায় ফেলু, তোপসে আর জটায়ুর বোঝাপড়াটাকে খোলতাই করতে অনেক সাহায্য করত। অনুপকুমারের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। তৃতীয়ত, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অনুপদার শরীরটা সেই সময়ে অত্যন্ত খারাপ যাচ্ছিল। জটায়ুর চরিত্রে অভিনয়ের যে 'ফিজিক্যাল'

অংশ, সেটা করতে ওঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল।

'বোসপুকুরে খুনখারাপি'র দৃশ্যগ্রহণের সময়েই লক্ষ করেছিলাম, ওঁকে খুব ক্লান্ত লাগছে। বেশি হাঁটাহাঁটি করতে অসুবিধে। মাঝেমধ্যে তো এমন হয়েছে, ক্যামেরা চলছে, অথচ শটের মাঝখানে অনুপদা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন আবার ওঁকে জাগিয়ে দিয়ে নতুন করে শটটা নিতে হয়েছে।

'ফেলুদা ৩০' সিরিজেই 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' গল্পটা আবার বাংলায় চিত্রায়িত করা হয়। হিন্দিতে এই ছবিটা যে এখানকার দর্শক তেমন পছন্দ করেননি, সেটা আগেই বলেছি। এখানকার দর্শকদের কথা ভেবেই বাংলায় ছবিটা করার আগে আমার অনেক নতুন পরিকল্পনা ছিল। তাদের মধ্যে একটা হল, কাঠমাণ্ডুর আকাশে বিমানের ভেতর ফেলু তোপসে এবং জটায়ুকে নিয়ে একটা মজার দৃশ্যের শুটিং করা। কিন্তু অনুপকুমারের অসুস্থতার জন্যই সেটা বাতিল করতে হয়।

তবে অস্বীকার করার উপায় নেই, জটায়ুর চরিত্রে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন অনুপকুমার। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ছবিতে কমেডিয়ানের কাজ করে করে ওঁর অভিনয়ে কতকগুলো 'টিপিক্যাল' ম্যানারিজম চলে এসেছিল। সেগুলোর থেকে উনি মুক্তি পাচ্ছিলেন না। আর শারীরিক অসুস্থতা তো ক্রমশ ওঁকে নির্জীব করে দিচ্ছিল। সিরিজটা শেষ হওয়ার কিছুদিন পরে তো উনিও চলে গেলেন।

অনুপকুমার মানুষটি কিন্তু বড় ভালো ছিলেন। বড় হৃদয়বান মানুষ। হয়তো জটায়ুর চরিত্রটা পরে উনি আরও ভালোভাবে করতে পারতেন। কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না।

অনুপকুমার চলে যাওয়ার পর যখন ফের ফেলুদাকে নিয়ে সিরিজ করার সুযোগ এল, তখন বিভু ভট্টাচার্যর সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয়। ওঁকে আমার বাড়িতে আসতে বলি। দেখা করতে এসে বিভুদা বললেন, 'আমি আগে আপনাদের ইউনিটে কাজ করেছি!'

আমি তো অবাক। উনি আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন, অথচ আমি জানি না, এটা কী করে হয়? পরে যা বললেন তাতে বুঝলাম আমার জানার কথাও না। 'অপুর সংসার' ছবিতে তিনি ছিলেন 'মাস্টার বিভু' নামে। অপু বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে যে পৌরাণিক ছবিটা দেখতে গেছে, তাতেই এক দৃশ্যে প্রহ্লাদের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি।

বিভুদার অভিনয় এর আগে আমি তরুণ মজুমদারের সিরিজ 'চিরকুমার সভা'

দেখেছিলাম। ওঁকে সামনাসামনি দেখে, কথা বলে মনে হল জটায়ুর চরিত্রটা করতে পারবেন। অন্তত ওঁকে নিয়ে একটা চেষ্টা করা যায়।

টেলিভিশনে বিভুদার জটায়ু হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর কিছু সমালোচনা হয়। আমি ওঁকে বলেছিলাম, মন খারাপ করবেন না, মানুষের মনে এখনও সন্তোষ দত্ত রয়ে গেছেন, আপনি নিজের মতো অভিনয় করে যান। আর বলেছিলাম ক্যামেরার সামনে স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখুন। অভিনয় করছেন বলে যেন মনে না হয়।

'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' গল্পটা জটায়ু কেন্দ্রিক। ততদিনে ওঁর জটায়ু হিসেবে পরিচিতি হয়েছে। বড়পর্দায় যখন গল্পটা নিয়ে ছবি করার সুযোগ এল, ভাবলাম এবার ওঁকে নিয়ে একটা ঝুঁকি নেওয়া যায়। উনি আমার মুখ রেখেছেন। ছবিটায় ওঁর অভিনয়ের যথেষ্ট প্রশংসা হয়েছে।

একটা কথা ঠিক। জটায়ুর ভূমিকায় আর কেউই সন্তোষ দত্তর উচ্চতায় উঠতে পারেননি। আসলে, পর্দার বাইরের সন্তোষদার হাঁটাচলা কথাবার্তার মধ্যেও কিছু ব্যাপার ছিল একদম 'ইউনিক'। বাবা সেটাকেই পর্দায় দুর্দান্তভাবে জটায়ুর চরিত্রে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু কি এই? 'সোনার কেল্লা'র পরে সমস্ত ফেলু-কাহিনির ইলাস্ট্রেশনে তো বটেই, চরিত্রচিত্রণেও জটায়ুকে তিনি ধীরে ধীরে সন্তোষ দত্তর আদল দিয়েছেন বলে মনে হয়।

একটা কথা তাই বলাই যায়। সোনার কেল্লায় জটায়ুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সন্তোষদা, আর 'জয় বাবা ফেলুনাথে' তাঁকে অনেকটা নিজের ভূমিকাতেই অভিনয় করতে হয়েছে। তো, সেই অভিনয় ওঁরই তো সবচেয়ে ভালো করার কথা। তাই নয় কি?

মগনলাল মেঘরাজ!

'দো ঘুলঘুলিতে দো রিভলভার আপনার দিকে তাক করা আছে মিস্টার মিত্তার, কাজেই আপনি আমার কথার উপর কথা বলবেন না। আপনি ঝামেলা না করেন তো এইবার আপনার কোনও ক্ষেতি হোবে না—আপনার আঙ্কেলের ভি হোবে না। কিন্তু এর পরে আপনি যা করবেন, ঘোষালবাড়িতে ইনভেস্টিগেশন যা চালাবেন, সেখানে আপনার সেফটির গ্যারান্টি আমি দিব না। এই কথা সাফ বলে দিলাম আপনাকে।'

শুনলেই যেন গা হিম হয়ে যায়। বলে দেওয়ার দরকার পড়ে না, কথাগুলো বেরিয়েছে ফেলুদার চিরশত্রু মগনলাল মেঘরাজের মুখ থেকে। কাশীর জ্ঞানবাপীতে মগনলালের ডেরায় গিয়ে হাজির ফেলু তোপসে আর জটায়ু। মগনলাল ফেলুকে চাপ দিচ্ছে ঘোষালবাড়ির গণেশমূর্তি চুরির তদন্ত ছেড়ে দেওয়ার জন্য। ফেলু রাজি হচ্ছে না। ফেলুকে ভয় দেখাতে মগনলাল জটায়ুকে নিশানা বানিয়ে নাইফ থ্রোয়িংয়ের খেলা দেখানোর বন্দোবস্ত করেছে। তাতে ফেলু বাধা দিতেই মগনলালের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে ওই হুমকি। এই সংলাপটা অবশ্য জয় বাবা ফেলুনাথ ছবির চিত্রনাট্য থেকে তুলে দেওয়া। মূল উপন্যাসে ওটা একটু অন্যভাবে এসেছে।

জয় বাবা ফেলুনাথেই ফেলু ও মগনলালের পয়লা নম্বর টক্কর। দ্বিতীয় সংঘাত 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' উপন্যাসে। তৃতীয় এবং শেষবারের মতো 'গোলাপী মুক্তো রহস্য'য়। ফেলুর আর কোনও প্রতিপক্ষ তাকে বার বার এভাবে বিপাকে ফেলেনি। আর মগনলালই যে তার সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ, সেটা ফেলু বার কয়েক স্বীকারও করে নিয়েছে। জয় বাবা ফেলুনাথে যেমন, রহস্য সমাধান করার পর তোপসেকে সে বলছে, 'এই রকম একজন লোকের জন্যই অ্যাদ্দিন অপেক্ষা করছিলাম রে তোপসে। এ সব লোকের সঙ্গে লড়ে জিততে পারলে সেটা বেশ একটা টনিকের কাজ দেয়।'

স্যার আর্থার কনান ডয়েলের অমর গোয়েন্দা চরিত্র শার্লক হোমসের প্রভাব

যে ফেলুর চরিত্রে রয়েছে সেটা আগেই বলেছি। হোমসের বেশ কয়েকটি কাহিনিতে তার একজন সাংঘাতিক শত্রু ঘুরে ফিরে এসেছে। প্রফেসর মরিয়র্টি। শার্লক হোমসও তাঁর অনুচর ওয়াটসনের কাছে বেশ কয়েকবার বলেছিলেন, মরিয়র্টির সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে তাঁর মস্তিষ্ক যে পুষ্টি লাভ করে, সেটা আর অন্য কারও ক্ষেত্রে হয় না। এই মরিয়র্টির সঙ্গে হাতাহাতি করতে করতেই সুইজারল্যান্ডের রাইসেনবাখ জলপ্রপাতের ওপর থেকে হারিয়ে যান হোমস। সে গল্পের নাম 'দ্য ফাইনাল প্রবলেম'। পরে অবশ্য পাঠকদের বিপুল চাহিদায় হোমসকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন লেখক।

হোমসের সঙ্গে মরিয়র্টির হাড্ডাহাড্ডিটা পাঠকদের কাছে ঠিক কতটা জনপ্রিয় ছিল, সেটা আজ আর তাই নতুন করে বলার দরকার হয় না। আসলে ভিলেন জবরদস্ত না হলে তো নায়কের কেরামতি দেখানোর তেমন সুযোগ থাকে না। কাহিনি এবং প্রেক্ষিত আলাদা হলেও, চেনা প্রতিপক্ষ যদি বারবার ফিরে আসতে থাকে, তাহলে পাঠকরা ধরেই নেন এবার দারুণ শ্বাসরোধকারী ব্যাপার স্যাপার ঘটতে থাকবে। এইভাবে পাঠকের মনযোগ টানতেও লেখকের বেশ সুবিধা হয়ে যায়। সম্ভবত এই থিয়োরি মেনেই মরিয়র্টি বারবার ফিরেছে কনান ডয়েলের কলমে। ফিরেছে মগনলাল মেঘরাজও, ফেলদার মুখোমুখি হতে।

নামের আদ্যাক্ষর এবং কিছুটা তত্ত্বগত সাদৃশ্য ছাড়া মরিয়র্টি এবং মগনলালের মধ্যে কিন্তু আর বিশেষ সাদৃশ্য নেই। বরং অমিলই বেশি। মরিয়র্টি অত্যন্ত শিক্ষিত, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারি, শার্লক হোমসের জটিল চক্রান্তের জালে জড়াতেই তার আনন্দ। অন্যদিকে মগনলালের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানার উপায় নেই। তবে তাকে 'শিক্ষিত' বলার উপায় যে একেবারেই নেই, সেটা স্পষ্ট। চক্রান্তের জাল বুনে নয়, মগনলাল তার শিকার ধরে টাকা এবং পেশিশক্তির প্রভাব খাটিয়ে। কথাবার্তাও তার মরিয়র্টির মতো শাণিত নয়। বরং একটা অসৎ চাতুর্যের ব্যাপার রয়েছে। সে হুমকি দিতে ভালোবাসে। পছন্দ করে ভয়ংকর ধরনের রসিকতা করতে, আর অবধারিতভাবেই সেই রসিকতার পাত্রটি হলেন রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু।

এই রসিকতার সূত্র ধরেই মগনলাল ফেলুদার ছবিতে ও গল্পে বেশ কিছুটা কমিক রিলিফ নিয়ে আসে। মগনলাল আর জটায়ু মুখোমুখি হলেই মজার মজার সিচ্যুয়েশন তৈরি হয়। আসলে ভিলেনদের মধ্যে কিছুটা 'কমিক এলিমেন্ট' মেশানোর কাজটা বাবা সোনার কেল্লা ছবি থেকেই করেছেন। তাতে দেখানো

হয়েছে দুই ভিলেন লুডো খেলছে। ঠাণ্ডা মাথায় শয়তানি করলেও, মন্দার বোসের কথাবার্তা শুনেও বেশ হাসি পায়। মগনলালের ক্ষেত্রে এই ব্লেন্ডিংটা একদম নিখুঁত হয়েছে। বাকি ক্রেডিটটা অবশ্যই অভিনেতা উৎপল দত্ত'র।

মগনলালকে এভাবে জীবন্ত করে তোলার কাজটা উৎপলদা ছাড়া আর কেউ করতে পারতেন বলে আমার মনে হয় না। জয় বাবা ফেলুনাথের কাস্টিংয়ের সময় ওই চরিত্রে উৎপলদার কথাই বাবা ভেবে রেখেছিলেন। মগনলাল হিন্দির টানে বাংলা বলে। হিন্দি ভাষাটা যে বাঙালি অভিনেতা খুব ভালো বলেন, একমাত্র তিনিই ওভাবে ভাঙা বাংলায় কথা বলতে পারতেন। উৎপলদার হিন্দি বলায় আশ্চর্য দক্ষতা ছিল। এটা একেবারে নিজে নিজেই উনি রপ্ত করেছিলেন।

অনেকেই জানেন না, ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু ভাষাতেও অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন উৎপলদা। তাই কথা হিন্দির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন পাঞ্জাবী টানকে উনি প্রশ্রয় দিতেন। এক পত্রিকার সাক্ষাৎকারেই উনি বলেছিলেন সে কথা।

উৎপলদার অভিনয় প্রতিভা কিংবা বিভিন্ন ভাষায় তাঁর দক্ষতা নিয়ে অনেক জায়গায় অনেক কথা লেখা হয়েছে। এখানে সে সব আর নতুন করে বলার কোনও অর্থ হয় না। তাই ওঁকে নিয়ে কয়েকটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই এখানে বলব।

পথের পাঁচালী ছবিটা মুক্তি পায় ১৯৫৫ সালে। ছবিটা কলকাতার এক প্রেক্ষাগৃহে দেখার পরই উৎপলদা বাবাকে একটা চিঠি লেখেন। সম্ভবত তখনও দুজনের মুখোমুখি আলাপ হয়নি। চিঠিটা এখনও আমার কাছে যত্ন করে রাখা আছে।

ইংরেজিতে লেখা ওই চিঠিতে উৎপলদা বলেছেন, 'পথের পাঁচালি' দেখার পর ছবিটার স্মৃতি তাঁর মনকে একদম আচ্ছন্ন করে রাখে যে, উনি দু'রাত ঘুমোতে পারেননি। আরও লিখেছিলেন, ছবিটা বাংলা ছবির জগতে একটা উৎকর্ষের নজির হয়ে রইল। সত্যিকারের চলচ্চিত্র এবং তার ব্যাকরণের সঙ্গেও বাঙালি চলচ্চিত্রপ্রেমীদেরও প্রথম পরিচয় ঘটল।

অথচ এই উৎপলদাই, অনেক পরে, যখন নিজের সবচেয়ে পছন্দের ছবিগুলোর নাম করেছিলেন, সেই তালিকায় পথের পাঁচালি ছিল না। সে জায়গায় এসেছিল 'দেবী'। আরও যে সব ছবির কথা উনি বলেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, আইজেনস্টাইনের ইভান দা টেরিব্‌ল, চ্যাপলিনের দ্য গ্রেট ডিক্টেটর এবং মঁসিয়ে ভার্দু, আকিরা কুরোসাওয়ার সেভেন সামুরাই ও হাই অ্যান্ড লো ইত্যাদি।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনায় হয়তো উনি পথের পাঁচালির চেয়ে দেবীকেই বেশি প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেছিলেন।

বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস রাখতেন উৎপলদা। থিয়েটারকে উনি সেই মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার হাতিয়ার বলে মনে করতেন। পরে সিনেমাকেও উনি এই মর্যাদাটা দেন। একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ওঁকে সিনেমায় বহু হাবিজাবি চরিত্রে অভিনয় করতে হয়, কারণ সিনেমা থেকে রোজগারটা ওঁকে থিয়েটারের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার রসদ জোগায়। থিয়েটারের মাধ্যমে রাজনৈতিক বার্তা ছড়ানোর কাজে ওঁকে বহুবার বহু অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তেমন একটা স্মৃতি অস্পষ্টভাবে এখনও রয়ে গিয়েছে আমার মনে।

তখন আমি খুব ছোট। বছর সাত আট বয়স হবে বোধ হয়। মনে আছে, কয়েকটা রাতে আমাদের ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠেছিল।

ঘুম থেকে উঠে টেলিফোনে কথা বলেই সেই গভীর রাতে বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে তৈরি হতেন বাবা। মা তো বেশ ঘাবড়ে যেতেন। কোথায় যাচ্ছেন, জিজ্ঞেস করলে বাবা ছোট্ট করে যে জবাবটা দিতেন, সেটা হল, 'উৎপলকে আবার পুলিশে ধরেছে। ছাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

খুব সম্ভবত ওই সময়টাতেই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। উৎপলদার প্রথম থিয়েটার 'অঙ্গার'-এর অভিনয়ও সম্ভবত ওই সময়েই শুরু হয়। ওই বয়সে আর উৎপলদাকে পুলিশে ধরার কারণটা বাবাকে জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পরে বড় হয়ে যা শুনেছি, তাতে মনে হয় ওই নাটকের সঙ্গে ওঁর গ্রেপ্তার হওয়ার সম্পর্ক ছিল।

অনেকটা এই সূত্রেই বাবার প্রতি উৎপলদার একটা বিশেষ ক্ষোভের কথা বলা যায়। উৎপলদা চাইতেন, সত্যজিৎ রায়ের মতো শক্তিমান পরিচালক পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়, অথবা সত্তরের দশকের টালমাটাল পরিস্থিতি নিয়ে ছবি করুন। কিন্তু বাবা এই 'পিরিয়ড' ফিল্মের বিষয়ে কোনওদিনই বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। উনি মনে করতেন, একটা সময়ের পর ছবিগুলো প্রাসঙ্গিকতা হারাতে পারে। এই জন্য কোনও একটা বিশেষ সময়ের ছাপ তিনি ছবিতে রাখার বিরোধী ছিলেন। এবং সেটা এতটাই, অভিনেতাদের পোশাক ডিজাইন করতে গিয়েও সমসাময়িক ফ্যাশনকে অনুসরণ করতেন না। একটা সময়ে কলকাতায় বেলবট্‌স পরার চল ছিল। ধৃতিমানদা বা অন্য কয়েকজন অভিনেতাকে ওই ধরনের ট্রাউজার্স পরতে দেখেছি। বাবা কিন্তু তাঁর ছবিতে

কোনওদিন এই ধরনের পোশাক দেখান নি।

শেকসপিয়ারের গভীর অনুরাগী ছিলেন উৎপলদা। অনুরাগ না বলে 'কমিটমেন্ট' বলাই ভালো। এই কমিটমেন্টের জন্যই উৎপলদা অভিনয় জীবনের প্রথম দিকটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। জিওফ্রে এবং জেনিফার কেন্দাল, এই ব্রিটিশ দম্পতি পঞ্চাশের দশকে শেকসপিয়ারের নাটক নিয়ে প্রায় গোটা ভারতবর্ষ ঘুরেছিলেন। বিভিন্ন মিশনারি স্কুল, হিল রিসর্ট, এবং প্রতিষ্ঠানে এঁরা শেকসপিয়ারের নাটকের বিশেষ 'শো' করতেন। ভারতবর্ষে আজ শেকসপিয়ার নিয়ে যেটুকু সচেতনতা, তার অনেকটাই এঁদের কল্যাণে। কেন্দালদের দলে ভিড়েছিলেন উৎপলদাও।

পরে উৎপলদা একটা লেখায় স্বীকার করেছিলেন, শেকসপিয়ার সম্বন্ধে তিনি যেটুকু শিখেছেন, তাঁর সিংহভাগই জিওফ্রে কেন্দালের সৌজন্যে। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। শেকসপিয়ারের নাটক নিয়ে কেন্দালদের এই ভারতবর্ষ চষে বেড়ানোর বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা ছবি করেন পরিচালক জেম্‌স আইভরি। আর ছবিটার জন্য সংগীত রচনা করেন বাবা। সিনেমাটার নাম অনেকেই জানেন, 'শেকসপিয়ারওয়ালা'।

জয় বাবা ফেলুনাথ ছবিটা ১৯৭৮ সালে মুক্তি পায়। আর উৎপলদাকে ফের মগনলাল মেঘরাজ সাজিয়ে যখন হিন্দিতে 'কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কা'র শুটিংয়ের জন্য ক্যামেরার সামনে আনলাম, তখন মাঝে আটটা বছর কেটে গিয়েছে। সেটা সম্পূর্ণভাবেই আমার ছবির শুটিং। উৎপলদাকে 'হ্যান্ডল' করার পুরো দায়িত্বটাই আমার, কারণ বাবা দূরদর্শনের ওই টিভি সিরিজের শুটিং চলাকালীন সেটে বিশেষ থাকতেন না।

বেশ টেনশন হত। বাবার সঙ্গে ওঁর আগাগোড়া যে সম্পর্কটা ছিল, সেটা উৎপলদার সঙ্গে 'কমিউনিকেট' করতে প্রাথমিকভাবে আমাকে অনেক সাহায্য করেছিল। কিন্তু অন্য অভিনেতাদের কাছে তখন আমার যে স্বাধীনতাটা ছিল, ওঁর ক্ষেত্রে তা পাওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। বড়ই গুরুগম্ভীর মেজাজের মানুষ। কেউ ওঁকে ঘাঁটাতে তেমন সাহস পেত না। আমিও না।

ওঁকে নিয়ে প্রথম দিনের শুটিং হয়েছিল কাঠমাণ্ডুর একটা হোটেলে। প্রথম শটটা দিতে ওঁর কিন্তু একটু অসুবিধা হল। আট বছর আগে উনি যতটা সাবলীল ভাবে মগনলালের চরিত্র অভিনয় করেছিলেন, ঠিক সেই ব্যাপারটা আসছে না। অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।

তখন বেশ ভয়ে ভয়ে ওঁকে বললাম, আপনি জয় বাবা ফেলুনাথের কথা

স্মরণ করুন। উনি গম্ভীর হয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন। ঠিক পরের শটেই আশ্চর্য কাণ্ড। ক্যামেরার সামনে ফিরে এল অবিকল পুরনো মগনলাল।

অভিনয়ের এই 'লেভেল' বদলে ফেলার কাজটা উনি এতটাই সাবলীলভাবে করতেন, দেখে তাক লেগে যেত। দূরদর্শনের জন্য এর আগের সিরিজ, অর্থাৎ 'সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস' করতে গিয়েও ওঁর এই ক্ষমতাটা অবাক হয়ে উপলব্ধি করেছিলাম। 'ভুতো' গল্পটাকে নিয়ে ছবির শুটিং। প্রধান অভিনেতা দু'জন। পঙ্কজ কাপুর এবং উৎপলদা। পঙ্কজ প্রায় 'আন্ডার অ্যাক্টিং' করেন। উৎপলদার সঙ্গে ওঁর প্রথম শটের একটা রিহার্সাল হল। সেটা দেখার পর আমি বেশ অস্বস্তিতে পড়লাম। পঙ্কজের পাশে উৎপলদার অভিনয় অত্যন্ত চড়া দাগের বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু উৎপলদাকে সে কথা বলার সাহস আমাদের কারওরই নেই। যা থাকে কপালে ভেবে নিয়ে প্রথম শটটা নিলাম। এবং অবাক কাণ্ড। পঙ্কজের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে ব্যালান্স করলেন উৎপলদা। লেভেলটা ঠিক ততটাই নামিয়ে ফেললেন, যাতে পঙ্কজের নিচু মাত্রার অভিনয়ের পাশে ওঁকে বেমানান না লাগে।

আসলে যে চরিত্রটায় অভিনয় করতেন, সেটা নিয়ে ওঁর ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড চিন্তা ভাবনা চলত। কিন্তু সেটা বাইরে থেকে তা একদম বোঝার উপায় থাকত না। শুটিংয়ে প্রচুর বইপত্র নিয়ে আসতেন। বিভিন্ন শটের ফাঁকে ফোকরে সেগুলো পড়তেন। বইগুলো অধিকাংশ সময়েই হত অত্যন্ত জটিল বিষয়ের। মাঝে মাঝে আমি ভাবতাম, এতটা মনযোগ এইসব জটিল বিষয়ে দেওয়ার পরের মুহূর্তে উনি এত সাবলীলভাবে শট দিচ্ছেন কী করে?

'কিসসা কাঠমাণ্ডুকা'র শুটিংয়ের সময় ওঁকে মন দিয়ে স্তানিশ্লভস্কি পড়তে দেখেছি। আবার শট দেওয়ার সময় উনি পুরোপরি মগনলাল মেঘরাজ। এই 'স্যুইচ ওভার'টা এত নিখুঁতভাবে হত, যা কল্পনাই করা যায় না। আজ বলতে বাধা নেই, শুটিংয়ের সময় আমি অনেকবার ভেবেছি, এত ভারী ভারী বই পড়ছেন, ডায়ালগ মনে আছে তো উৎপলদার? বলাই বাহুল্য, আশঙ্কটা প্রতিবারেই ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। থিয়েটারটাই ওঁর প্রথম 'প্যাশন' ছিল, তাই হয়তো ডায়ালগ মুখস্থ রাখাটা এত সহজ ছিল ওঁর কাছে।

শেষ করব উৎপলদাকে নিয়ে একটা মজার ঘটনা লিখে। এটা ওই 'ভুতো' গল্পের চিত্রগ্রহণের সময়ের ঘটনা। টি ভি-তে 'সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস' দেখানো শুরু হয়েছে। কলকাতায় শুটিং চলছে। উৎপলদাকে নিয়ে কাজ করছি। একদিন সকালে সেটে এসে হঠাৎ শুনলাম, উনি মারা গিয়েছেন।

আমার তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। উৎপলদা চলে গেছেন সেটা একটা বিরাট ক্ষতি, কিন্তু সেই মুহূর্তে ওঁকে হারানোর দুঃখকে ছাপিয়ে স্পষ্ট হল একটা অত্যন্ত পেশাদারি প্রশ্ন। ভুতো ছবিটার কী হবে? অর্ধেক শুটিং তো হয়ে গিয়েছে।

খুব সম্ভবত সেদিন উৎপলদার কাজ ছিল না। কিছুক্ষণ পরে আমাদের ইউনিটের কয়েকজন উৎপলদার বাড়িতে দৌড়লেন, শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। সঙ্গে সাদা ফুলটুলও নিয়ে গেলেন। এবং সেখানে তাঁদের দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানালেন স্বয়ং উৎপলদা।

আসলে উৎপলদার মৃত্যু সংবাদ রটে গিয়েছিল ওই ভুতো গল্পটার চিত্রগ্রহণের সূত্র ধরেই। ওতে একটা দৃশ্যে ছিল, ভেন্ট্রিলোকুইস্ট পঙ্কজ কাপুর খবরের কাগজে তার গুরু উৎপলদার মৃত্যু সংবাদ দেখছে। তারপর সেই খবরটা কেটে তার সংগ্রহে রেখে দিচ্ছে।

গোটা সিরিজেই যিনি হিন্দিতে সংলাপ লিখেছিলেন, সেই অক্ষয় উপাধ্যায়ের সঙ্গে হিন্দি 'সন্মার্গ' কাগজের কয়েকজনের ভালো জানাশোনা ছিল। অক্ষয়ই আমাদের বলেছিলেন, উৎপল দত্তের মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়েছে, এমন হিন্দি খবরের কাগজের একটা পাতার 'ডামি' তিনি সন্মার্গ থেকে আমাদের করিয়ে দেবেন। তাতে মেক আপ নেওয়া উৎপলদার ছবিও থাকবে। এই ডামিটা তৈরির সময়েই হয়েছিল যত গণ্ডগোল। সন্মার্গ অফিসের কেউ হয়তো সেটাকে ওপর ওপর দেখে সত্যি করেই উৎপলদার মৃত্যু সংবাদ ভেবেছিলেন। তাঁর থেকেই খবরটা ছড়িয়ে গিয়েছিল।

কথায় বলে, ভুল মৃত্যু সংবাদ মানুষের আয়ু বাড়ায়। এর পরেও উৎপলদা আরও অনেকদিন বেঁচেছিলেন। বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। বাবার আগন্তুক ছবিতে ওঁর অভিনয় তো কোনওদিন ভোলার নয়।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে
ট্রেনের সঙ্গে ফের দৌড়

প্রায় পঁচিশ বছরের বেশি সময় পর ফেলুদাকে নিয়ে আবার বড়পর্দার ছবি। পঁচিশ বছর মানে একটা গোটা শতাব্দীর প্রায় সিকিভাগ, সময়টা নেহাত কম নয়। ভেবে দেখলাম এর মধ্যে মানুষের জীবন অনেকটাই বদলে গেছে, সিনেমার ভাষাও পালটেছে। কাজেই, গোয়েন্দা ফেলুকে নিয়ে নতুন যে ছবি হবে, তাতে অনেক 'পেস' দরকার। তরতরে গতির সঙ্গে প্রয়োজন সাসপেন্স, আর কিছুটা অ্যাকশনও। নইলে এখনকার দর্শকদের ভালো লাগবে না।

'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, এই ছবির একটা টানটান অংশ হল ক্লাইম্যাক্সে ট্রেনের দৃশ্যটা। এই গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যটাকে যে একটু বিশেষভাবে তুলতে হবে, সেটা আমরা আগে থাকতেই স্থির করে রেখেছিলাম। এখানে ওই দৃশ্যটার শুটিং-এর কথাই বলা যাক।

'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' বাবা লেখেন ১৯৭৬ সাল নাগাদ। বাবার উপন্যাসে ওই ট্রেন-কাণ্ড ঘটছে লোনাভালা-খাণ্ডালা যাওয়ার রেলপথে। তখনও ওই লাইনে স্টিম ইঞ্জিন যাতায়াত করত। কিন্তু শুটিং শুরু হতে বুঝলাম, মহারাষ্ট্রে ওই দৃশ্যের শুটিং করতে সমস্যা হবে। এর একটা প্রধান কারণ অবশ্যই ছবির বাজেট। মুম্বই এবং সন্নিহিত যে কোনও এলাকায় একটা ছোটখাট শুটিং করতে গেলেই অসম্ভব বেশি 'চার্জ' গুনতে হয়। যেটা একটা বাংলা ছবির পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। সেখানে একটা গোটা ট্রেন নিয়ে একটা রেলপথ আটকে শুটিং করা।

তাছাড়া মুম্বইয়ে ছবি তুলতে গেলে প্রত্যেক জায়গায় তিন-চারবার করে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছিল। সে আর এক বড় ঝামেলা। মুম্বই সন্নিহিত এলাকায় ট্রেনের দৃশ্যটার শুটিং করার ইচ্ছে অতএব বাদ দিতে হল। তখন আমরা এমন আর একটা জায়গা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে শুরু করলাম, যেখানকার সঙ্গে ওই লোনাভালা-খাণ্ডালার একটা ভৌগোলিক মিল অন্তত পাওয়া যায়।

গল্পের খাতিরেও ওই পরিবর্ত জায়গাটার আর একটা বৈশিষ্ট্য আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। রেল লাইনের একটা ধার বরাবর বাঁধানো রাস্তা। গল্পতে আছে, ওই রাস্তার ওপরেই থাকবে 'জেট বাহাদুর' ছবির শুটিং-এর চলন্ত জিপ। তার ওপর ক্যামেরা, এবং তাতে চোখ লাগিয়ে ক্যামেরাম্যান 'ফলো' করবে ট্রেনের পাশাপাশি ঘোড়ার ওপর সওয়ার স্টান্টম্যান ভিক্টর পেরুমলকে। এমন একটা দুর্দান্ত দৃশ্যের লোকেশন খুঁজে বের করার কাজে আমাদের ছবির প্রযোজক অর্থাৎ উষাকিরণ মুভিজ-এর লোকজনও আমাদের অনেকটাই সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা বেশ কিছু পছন্দসই জায়গার ভিডিও ছবি তুলে এনে আমাদের দেখিয়েছিলেন। আমরা নিজেরাও বেশ কয়েকটি জায়গা দেখেছিলাম।

উষাকিরণ মুভিজ অন্ধ্রপ্রদেশের সংস্থা। সংস্থার তরফ থেকে আমাদের বলা হয়েছিল, ট্রেন নিয়ে শুটিং করতে যেহেতু বেশ কিছু সরকারি বাধ্যবাধকতা থাকে, ওঁদের রাজ্যে শুটিং হলে সেগুলো তাঁরা সহজেই মিটিয়ে ফেলতে পারেন। কারণ উষাকিরণ তথা রামোজি ফিল্মসিটির মালিক রামোজি রাওয়ের অন্ধ্রের সরকারি স্তরে কিছুটা সুনাম আছে। এমনকি অন্ধ্রে না হয়ে শুটিংটা পাশের রাজ্য কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে বা কাছাকাছি কোথাও হলে পরিস্থিতি তাঁদের আয়ত্তে থাকে।

শেষপর্যন্ত বহু জায়গায় ঘোরাঘুরি করে, বেশ কিছু অঞ্চলের ভিডিও ছবি দেখে যে জায়গাটা আমরা পছন্দ করলাম, সেটা আরাকু ভ্যালিতে গোরাপুর স্টেশনের কাছাকাছি একটা এলাকা। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' দেখলেই বোঝা যাবে, জায়গাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। ওখানে পৌঁছনোর জন্যে ভাইজাগ থেকে কয়েক ঘণ্টার যে রেলযাত্রা সেটাও অতি মনোরম। আর ওই লোকেশনের সঙ্গে লোনাভালা-খাণ্ডালা এলাকার যে একটা দৃশ্যগত মিল রয়েইছে, সেটা আর বলার প্রয়োজন হয় না।

'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'র শুটিং-এর কথা বলতে বসে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে বাবার সোনার কেল্লা ছবির কথা। সেখানেও ট্রেন নিয়ে একটা রোমাঞ্চকর দৃশ্যের ছবি তুলতে হয়েছিল। লোকেশনটা যোধপুর-জয়শলমির লাইনের মাঝামাঝি পোখরান থেকে আরও কুড়ি মাইল পশ্চিমে। রেল লাইনের পাশে সেখানেও ছিল পাকা রাস্তা। গোটা শুটিং পর্বটাই ছিল নানারকম চমকপ্রদ ঘটনায় পরিপূর্ণ। তবে আমার মনে হয়, সোনার কেল্লা-র ট্রেনের দৃশ্যটা 'শুট' করার জন্য বাবাকে খুব বেশি ঝুটঝামেলা পোয়াতে হয়নি। এত রকম অনুমতি-টনুমতি নেওয়ার ব্যাপারও তখন ছিল না। রেলের কর্তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাবা তো একটা আস্ত

ট্রেনই জোগাড় করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র জ্বালানি খরচা দেওয়ার শর্তে। আর আমাদের বেলায় প্রতি ঘণ্টা হিসেবে রেলকে যে টাকাটা দিতে হল সেটা একটা বিরাট অঙ্ক। অন্তত কোনও বাংলা ছবির বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে।

তো, বোম্বাইয়ের বোম্বেটের কাহিনিকাল আমি ছবির খাতিরে গল্পের চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে আনলেও, ট্রেনের দৃশ্যটায় স্টিম ইঞ্জিনই চেয়েছিলাম। আরাকু ভ্যালির মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে স্টিম ইঞ্জিনের 'কম্বিনেশন'টা বড় পর্দায় বেশ ভালো খুলবে বলেই মনে হয়েছিল। খোঁজখবর করে হায়দরাবাদে একটা স্টিম ইঞ্জিন পাওয়া গেল। কিন্তু শুনলাম সেটার আর বগি টানার ক্ষমতা নেই। তখন রেলের স্থানীয় এক কর্তা পরামর্শ দিলেন, অচল স্টিম ইঞ্জিনের পিছনে একটা ইলেকট্রিক ইঞ্জিন তিনি জুড়ে দেবেন, পিছনের বগিগুলোকে টানবে সেটাই। স্টিম ইঞ্জিনের চুল্লিতে কয়লা পুড়িয়ে নকল ধোঁয়াও ওড়ানো হবে। শুধু আমরা যদি ছবি তোলার পর এডিটিং-এর কারিকুরিতে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনটা সিনেমায় বাদ দিতে পারি।

কিন্তু পরে কল্পনা করে দেখলাম, সামনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যাচ্ছে স্টিম ইঞ্জিন, পিছনে ইলেকট্রিক ইঞ্জিন, সব মিলিয়ে ব্যাপারটা অত্যন্ত বীভৎস হয়ে দাঁড়াবে। পর্দাতেও ট্রেনটাকে দূর থেকে দেখাতে সমস্যা। দুটো ইঞ্জিন কোনও না কোনও সময় দেখা যাবেই। কাজেই মত বদলে স্টিম ইঞ্জিন বাদ দেওয়াই স্থির হল।

লোকেশন হল, ট্রেন হল, এবার শুটিং। এবং এই পর্যায়টায় এসেই আমার আরও একবার সোনার কেল্লার ট্রেনের দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের কথা মনে পড়ছে। আগেই বলেছি, পোখরানের কাছে একটা জায়গায় ওই দৃশ্যটার শুটিং হয়েছিল। ঠিক ছিল, আমরা জয়সলমির থেকে একশো মাইল রাস্তা মোটরে গিয়ে পোখরানে ওই ট্রেনটায় উঠব। ট্রেনটা আমাদের ইউনিটের সবাইকে নিয়ে শুটিং স্পটে যাবে। কিন্তু পোখরানে আমরা পৌঁছে দেখলাম ট্রেনই আসেনি। কাজের সময় যেখানে আগে থেকে হিসেব করে ঘণ্টা মিনিটের মাপে ভাগ করা থাকে, সেখানে দশ পনেরো মিনিট এদিক ওদিক হলেই হিমসিম খেতে হয়। আমাদের ট্রেন এল প্রায় তিনঘণ্টা পরে। এই তিন ঘণ্টা বাবা যে কী উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটিয়েছিল সেটা আর বলার দরকার পড়ে না।

অনেকটা এমনই উৎকণ্ঠা আমাদেরও সহ্য করতে হল, যখন বিশাল ইউনিট নিয়ে গোরাপুরে পৌঁছে আমরা দেখলাম স্টেশন থেকে ট্রেন আর নড়ে না।

আগেই বলেছি ট্রেন ভাড়া করাটা অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ, তার ওপর ওই বিশাল ইউনিটের লটবহর। কাজেই শুটিং করতে না পারলে পুরো ব্যাপারটাই মাটি। অথচ আট ঘণ্টার শুটিং শিফটে ট্রেনটা কেবল স্টেশনেই দাঁড়িয়ে রইল ছয় ঘণ্টা। জানা গেল, ঊষাকিরণ মুভিজের পক্ষ থেকে স্থানীয় রেলকর্তাদের যে চিঠি লেখা হয়েছিল, তাতে ট্রেনটাকে নিয়ে যে ঠিক কী করতে হবে, তা স্পষ্টভাবে লেখা হয়নি। অথচ আমি কলকাতা থেকে প্রযোজকদের আমার প্রয়োজনের কথাটা যথাযথভাবে লিখে জানিয়েছিলাম। এখন আমার মনে হয়, কলকাতা থেকে হায়দরাবাদ, এই বিশাল দূরত্বটার জন্যে ছোটখাট কাজেও এত চিঠিচাপাটি লিখতে হয়েছে, কয়েকটা 'কমিউনিকেশন গ্যাপ'-এর ঘটনা তাতে স্বাভাবিকভাবেই হয়ে গিয়েছিল। রেল বিভ্রাটটাও হয়তো ওই গোত্রে পড়ে।

যাই হোক, ট্রেন সেই স্টেশনেই দাঁড়িয়ে রইল। আমাদের ইউনিটের তরফ থেকে স্থানীয় রেল কর্তৃপক্ষকে বোঝানো, এদিক ওদিক ফোন করা ইত্যাদি চলল। পরে সমস্যাটা একটু মেটার মতো হতেই রেলকর্তাদের তরফ থেকে আমাদের লোকেশনে চলে যেতে বলা হল। ওঁরা বললেন, লাইন দিয়ে একটা গুড্স ট্রেন বেরিয়ে গেলেই আমাদের ট্রেনটাও শুটিং স্পটে গিয়ে হাজির হবে। সেইমতো আমরা লোকেশনে গিয়ে হাজির হলাম। ততক্ষণে অর্ধেক শিফট কাবার। তার ওপর আবার মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে ততক্ষণে দুঃস্বপ্নের মতো ঠেকতে শুরু করেছে।

ক্লাইম্যাক্সের শুটিং বলে আমি তিনটে ক্যামেরার ব্যবস্থা করেছিলাম। তাতে তিনটে দৃষ্টিকোণ থেকে একসঙ্গে ছবি তোলা যাবে। সেগুলোকে রেডি করার কাজ শুরু হল। ঘোড়া এবং তাদের সওয়াররাও হাজির। রেডি ফেলু, জটায়ু এবং তোপসে, ভিক্টর পেরুমল, ফিল্ম ডিরেক্টর পুলক ঘোষালও। শুধু ট্রেনের দেখা নেই।

তবে এখন মোবাইল ফোনের সুবিধাটা রয়েছে। স্টেশনে একটা ফোন করতে জানানো হল, আর একটা গুড্স ট্রেন গেলে স্টেশন থেকে নড়বে আমাদের ট্রেনটা। বিরক্ত হলে চলবে না। যতটুকু সম্ভব কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। একটা ইনস্পেকশন ট্রলি জোগাড় করে কয়েকটা ছোটখাট শট নেওয়া হল। তারপরে দেখা মিলল ট্রেনের। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। বেলা শেষ হয়ে আসছে, এবং মাত্র দু'ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ট্রেন-ঘোড়া-জিপ নিয়ে ওই বিশেষ দৃশ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কো-অর্ডিনেশন করা গেল না। কাজেই 'প্যাক আপ'।

ঘোড়া নিয়ে ট্রেন তাড়া করার দৃশ্যটা তোলার জন্য তাই আমাদের আর একবার আরাকু যেতে হল। সেটা দু-একমাসের মধ্যেই। নইলে বর্ষা পেরিয়ে যেত এবং আগেকার তোলা দৃশ্যের সঙ্গে পরেরগুলো মেলানো যেত না। বর্ষার আকাশে সূর্য আর মেঘের লুকোচুরিতে যে মৃদু আলো তৈরি হয়, এবং যা রঙিন ফোটোগ্রাফির পক্ষে একেবারে আদর্শ, সেটাও পাওয়া যেত না। বাবা এই আলোটা ভীষণ পছন্দ করতেন।

প্রথমবারের ভয়ানক অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিল অনেক কিছু। এবারে রেল কোম্পানিকে প্রযোজক ট্রেন ভাড়া করার জন্য যে চিঠি পাঠালেন, সেটা আমি আগে ভালো করে দেখে নিয়েছিলাম। ফল হল এই, দ্বিতীয় পর্বে খোদ রেলের কয়েকজন বড় কর্তা শুটিং দেখতে হাজির হলেন। এবং তাঁরা থাকার জন্যই হয়তো ট্রেনটাও খুব ভদ্র ব্যবহার করল। ট্রেন-ঘোড়ার দুর্দান্ত দৃশ্যটাও উতরে গেল সহজেই।

ছবি তুলতে
কত তোড়জোড়

সোনার কেল্লা, জয় বাবা ফেলুনাথ এবং বোম্বাইয়ের বোম্বেটে—এই তিনটে ছবিতেই একটা ছোট মিউজিক 'পিস' ঘুরে ফিরে এসেছে। ওটাই ফেলুদা সিরিজের 'থিম মিউজিক'। এখন তো মোবাইল ফোনের রিং টোন হিসেবেও এই থিমটা মাঝে মধ্যে শুনতে পাই। অবশ্য রিং টোনটা যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁরা থিমটার কপি রাইট নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে চাননি। অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি।

জেমস বন্ড সিরিজের থিম মিউজিকটা তো খুবই পরিচিত। গড ফাদার কিংবা হালফিলের স্পাইডারম্যান ছবির সিরিজেও এমন থিম মিউজিক ঘুরে ফিরে আসে। আসলে কোনও একটা ছবি বা সিরিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে এই ছোট ছোট আবহগুলো খুব সাহায্য করে। একটা গোটা চলচ্চিত্রের ঘটনাক্রমকেও তা বেঁধে রাখতে পারে, অবশ্যই তার ব্যবহারটা যথাযথ হতে হবে। প্রফেসর শঙ্কুর গল্প নিয়ে ভবিষ্যতে যদি কোনও ছবি করি, তবে তাতেও থিম মিউজিক থাকবে। অথচ আমার ভাবতে অবাক লাগে, অন্যান্য বাংলা ছবিতে এর ব্যবহারটা এখনও কেউ সেভাবে করার প্রয়োজনই মনে করলেন না।

ফেলুদার থিম মিউজিকটা বাবাই কম্পোজ করেছিলেন। ওঁর সংগীত রচনার ধরনটা ছিল অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা। খুব ভালো শিস দিতে পারতেন। সংগীতের প্রাথমিক খসড়াটা উনি শিস দিয়েই তৈরি করতেন। গভীর রাতে বহুদিন বাবার ঘর থেকে মৃদু শিসের আওয়াজ পেয়েছি। আসলে বাড়িতে সারাদিন বহু মানুষের আনাগোনা লেগে থাকত। তাদের সামনে তো আর শিস দিয়ে সুর ভাঁজা যায় না। রাতে পরিবেশ অনেক শান্ত হয়ে আসত। অখণ্ড মনযোগ সংগীতে দিতে পারতেন বাবা।

শিস দিয়ে সুরের কাঠামোটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর বাবা সেটাকে পিয়ানোতে বাজাতেন। তারপর তৈরি হত স্বরলিপি। একটা ছোট মিউজিক পিসের মধ্যেও

চার পাঁচ রকমের যন্ত্রের ব্যবহার থাকতে পারে। এ রকম ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা যন্ত্রের জন্য আলাদা আলাদা করে 'স্কোর' তৈরি করতেন বাবা। এবং তা এতটাই নিষ্ঠার সঙ্গে, কল্পনা করা যায় না।

স্বরলিপির প্রসঙ্গ যখন এল, তখন আর একটা ঘটনার কথা বলা প্রয়োজন। এর থেকে বোঝা যাবে ওঁর 'অ্যাডাপ্টেবিলিটি', অর্থাৎ কাজের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কী সাংঘাতিক ক্ষমতা ছিল।

সংগীত নিয়ে বাবার পড়াশোনার পরিধি ছিল বিরাট । আর সংগীতের চর্চা যেটা ছিল, সেটা পুরোপুরি নিজে নিজে আয়ত্ত করা। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে থাকার সময় থেকেই উনি পাশ্চাত্য সংগীতে ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। রাত্রে ওয়েস্টার্ন সিম্ফনির স্কোর নিয়ে শুতে যেতেন, গভীর রাত পর্যন্ত সেটাকে বিশ্লেষণ করা ছিল ওঁর ওই সময়ের অন্যতম 'হবি'।

আগে কলকাতায় বড়বড় রেকর্ডের দোকানে ওয়েস্টার্ন নোটেশনে সংগীত রচনার উপযোগী ফাঁকা 'স্কোর শিট' কিনতে পাওয়া যেত। বাবা সেই স্কোর লেখার কাগজ কিনে আনতেন প্রায়ই। এরপর বাড়িতে বসে কোনও মিউজিক শুনতে শুনতে তার স্কোরটা তিনি ওই কাগজে লিখে ফেলতেন। স্বরলিপি তৈরির চর্চাটা এইভাবেই বজায় রেখেছিলেন।

ওয়েস্টার্ন মিউজিকের পথে হেঁটে যাঁর সংগীত জগতে প্রবেশ, সংগীত রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর পাশ্চাত্য পদ্ধতিই অবলম্বন করাই উচিত। সেটাই স্বাভাবিক। বাবার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। উনি সংগীত রচনা করতেন 'ওয়েস্টার্ন নোটেশনে'। ভারতে কিন্তু ব্যবহৃত হয় 'ইন্ডিয়ান নোটেশন'। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের জটিল রাগ রাগিণীও উনি ওয়েস্টার্ন নোটেশনেই তুলে আনতেন। তাতে কিন্তু এখানকার যন্ত্রীদের একটু অসুবিধা হত।

সংগীত রেকর্ডিং এর সময় একজন দক্ষ মিউজিক অ্যারেঞ্জারের প্রয়োজন হয়। অ্যারেঞ্জারের কাজ হল, রচয়িতার ভাবনা অনুযায়ী সংগীতশিল্পী এবং যন্ত্রীদের নিয়ে ঠিকঠাক সংগীতটা নির্মাণ করা। বাবার মিউজিক অ্যারেঞ্জার ছিলেন অলোক নাথ দে। একজন অত্যন্ত দক্ষ এবং গুণী মানুষ। ওঁর ছেলে তপনও এখন নামকরা অ্যারেঞ্জার। তপন আমার বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ছবিতে কাজ করেছেন।

ওয়েস্টার্ন নোটেশনে বাবা যে সংগীত রচনা করতেন, অলোকদা সেটাকে ইন্ডিয়ান নোটেশনে লিখে দিতেন। তাতে মিউজিসিয়ানদের খুব সুবিধা হয়ে যেত। কারণ অনেকেই ওয়েস্টার্ন নোটেশনের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। আবার বাবা ইন্ডিয়ান নোটেশনটা তেমনভাবে জানতেন না।

এইভাবেই যা হোক করে চলছিল। কিন্তু বাবা প্রথম বড়সড় অসুবিধার মুখোমুখি হলেন গুপি গাইন বাঘা বাইন ছবিতে। ওটা পুরোপুরি মিউজিক্যাল ছবি। প্রচুর গান, আবহের ব্যবহার রয়েছে। গানগুলোয় আবার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাগ রাগিণীর ছোঁওয়া। এবং বাবা সেগুলোকে যথারীতি ওয়েস্টার্ন নোটেশনে ভেঙে শব্দযন্ত্রীদের বোঝাতেই অলোকদা হিমশিম খেয়ে গেলেন। সময়ও প্রচুর গেল, যা একটা বাংলা ছবির বাজেটের পক্ষে সত্যিই অসুবিধাজনক।

এরপর অবাক কাণ্ড। রাতারাতি বাবা ইন্ডিয়ান নোটেশনে স্বরলিপি তৈরি করা শিখে নিলেন। পরের ছবিগুলোতে উনি যে সংগীত রচনা করেন, তার সবই ভারতীয় মতে লেখা। এত দ্রুত কী করে যে উনি এই নোটেশনে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তা আজ বসে ভাবতেও অবাক লাগে।

প্রযুক্তির উন্নতির জন্য সাউন্ড রেকর্ড করার কাজ এখন অনেক সোজা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ যন্ত্রানুষঙ্গের গুণমান এখন আর কারওর ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের ওপর ততটা নির্ভর করে না। অনেক ত্রুটি যান্ত্রিকভাবে পুষিয়ে দেওয়া যায়। বাবার সময়ে কিন্তু কাজটা অনেক শক্ত ছিল। তবে অলোকদার মতো সহযোগী পেয়ে ওঁর অনেক সুবিধা হয়ে গিয়েছিল।

অলোকদা ঠিক কতটা দক্ষ ছিলেন? একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। একটা ছোট্ট আবহ সংগীতও অনেক রকম গতিতে বাজানো এবং রেকর্ড করা যায়। একটা সুর দ্রুত বাজবে না ধীর লয়ে, সেটা নির্ভর করে তার মাত্রার ওপর। অর্থাৎ মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে সংগীতের 'পেস' বদলানো যায়।

সংগীত রেকর্ডিংয়ের সময় 'মেট্রোনম (metronome)' বলে একটা ছোট যন্ত্রের ব্যবহার হয়, যেটা মিউজিক অ্যারেঞ্জারের কানের কাছে 'ক্লিক ক্লিক' করে আওয়াজ করে তাঁকে সংগীতের মাত্রাটা ধরিয়ে দেয়। আগে কিন্তু এই আওয়াজটা কানের পাশে হেডফোনে শোনা যেত না। রেকর্ডিংয়ের আগে মেট্রোনমে একবার মাত্রাটা শুনে নিতেন অ্যারেঞ্জার। তারপর রেকর্ডিংয়ের সময় সেটাকে স্মরণ করেই তাঁকে কনডাক্ট করতে হত। ধরা যাক কোনও ছবির এক বিশেষ দৃশ্যের জন্য একটা পাক্কা এক মিনিট সাত সেকেন্ডের ছোট আবহ প্রয়োজন। আবহের দৈর্ঘ্য একচুল এদিক ওদিক হলে কিন্তু ওই দৃশ্যে সেটাকে আর ব্যবহার করা যাবে না। কারণ আবহের দৈর্ঘ্য স্থির করা হয়েছে ছবিতে কোনও একটা বিশেষ মুহূর্তের দৈর্ঘ্য মেপে। এই ধরনের রেকর্ডিংয়ের সময় একাধিক 'টেক' নেওয়া হয়। তিন চারটে তো কম করে। অবাক হয়ে দেখেছি, এই প্রত্যেকটা টেকই অলোকদা শেষ করতেন

নিখুঁত সময়ের মাপে। এটা একদম অনন্য একটা দক্ষতা। বাবাও এটার খুব কদর করতেন। এখন অবশ্য পুরো ব্যবস্থাটাই অনেক বদলে গিয়েছে। আবহের দৈর্ঘ্য কিছুটা এদিক ওদিক হলেও সেটাকে ব্যবহার করার অনেক উপায় বেরিয়েছে।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ছবিতে আমরা ডিজিটাল সাউন্ড করেছি। পরে সেটাকে ডলবিতে তোলা হয়। গোটা ব্যাপারটা কিন্তু বেশ জটিল। একটা ছোট ঘটনার কথা বলি, তাতেই শব্দগ্রহণের ঘনঘোর চরিত্র কিছুটা বোঝা যাবে।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটের টাইটেল রোল আসার আগে, ছবির একদম প্রথমের দিকে, একটা গাড়ি বিস্ফোরণের দৃশ্য আছে। ওই আওয়াজটায় অনেকেরই শুনেছি বুক কেঁপে গিয়েছে। ছবিটা রিলিজের আগে আমিও খুব চিন্তায় ছিলাম, ওই আওয়াজ শুনে কেউ আবার না হলের মধ্যে হার্ট ফেল করে বসেন! ছবিটা হায়দরাবাদের রামোজী ফিল্ম সিটিতে তৈরি, পোস্ট প্রোডাকশনের সমস্ত কাজও ওখানেই হয়েছে। একদিন স্টুডিওতে এক্‌জন টেকনিশিয়ান বললেন, বিস্ফোরণের আওয়াজটা একটু শুনে যান।

একটা ঘরে গিয়ে শুনলাম। কিন্তু তাতে বিস্ফোরণ কী হল সেটা বিশেষ বুঝলাম না। আমি জিজ্ঞেস করতে স্টুডিওর একজন বললেন, এটা তো বিস্ফোরণের সময় যে হাওয়া বইবে, তার শব্দ। তাহলে আসল বিস্ফোরণের শব্দটা কোথায়? পাশের ঘরে গেলাম, সেখানে শুনি পাখির কিচিরমিচির। এটা আবার কোথা থেকে এল? শুনলাম, বিস্ফোরণের শব্দে ভয় পেয়ে পাখি উড়ে যাবে জঙ্গলের গাছ থেকে। এটা তার শব্দ। অগত্যা তার পাশের ঘরে গেলাম বিস্ফোরণের আসল শব্দটা খুঁজতে।

আসলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে আজকাল একটা সাধারণ শব্দও অনেকগুলো ট্র্যাকে, অনেকগুলো শব্দের মিশেলে তৈরি হয়। তাই প্রত্যেকটা শব্দই এত নিখুঁত লাগে। বিস্ফোরণের শব্দটা যেমন। ওর রেকর্ডিংয়ে যতই হয়রান হই না কেন, পরদায় যে ওটা চমকে দিয়েছিল সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই।

এই ধরনের সাউন্ড সিস্টেমে কাজ করার অভিজ্ঞতা এর আগে আমাদের বিশেষ ছিল না। কলকাতা থেকে অনুপ মুখোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। উনি এই কাজে একজন বিশেষজ্ঞ, এন এফ ডি সি তে ছিলেন। আগে উনি আমাদের ছবিতে কাজ করেছেন, তবে এবার আমাদের ইউনিটে ছিলেন না। বোম্বাইয়ের বোম্বেটের প্রাথমিক পর্যায়ের সম্পাদনা শেষ হওয়ার পর ওঁকে আমরা ছবিটা দেখিয়েছিলাম। তখনও ছবিটা পুরোপুরি নির্বাক। উনি দেখে

বললেন, 'এত রকম চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার স্যাপার রয়েছে, আমার এই কাজটা করতে খুব ইচ্ছে করছে।'

ওঁর মতো একজন অভিজ্ঞ লোক দলে আসায় আমাদের তো খুব সুবিধা হয়ে গেল। হায়দরাবাদেও দেখলাম সাউন্ড রেকর্ডিস্টরা ওঁকে 'স্যার স্যার' বলে ডাকছে। শব্দ পুনর্যোজনার টেকনিক্যাল দিকটা উনিই সামলালেন। কাজটা তো কম ঝক্কির নয়। অভিনেতাদের সংলাপ ডাবিং থেকে শুরু করে আবহ সংগীত, হাঁটাচলা, মারামারি এবং অন্যান্য বহু শব্দ।

আবহ সংগীত রেকর্ড করা হয়েছিল কলকাতায়। হায়দরাবাদের স্টুডিওতে বিভিন্ন ধরনের শব্দের একটা আর্কাইভের মতো রয়েছে। ওখান থেকেও বেশ কিছু শব্দ ব্যবহার করা হল। আমরাও বেশ কিছু স্টক সাউন্ডের ক্যাসেট এবং সি ডি নিয়ে গিয়েছিলাম। ওগুলো বাবা বিদেশ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

মারামারির দৃশ্যগুলোর জন্য আমি সাউন্ড এক্সপার্টদের বলেই দিয়েছিলাম, ঘুঁষোঘুঁষির আওয়াজ সামান্য প্রকট হবে, কিন্তু কখনওই বাজার চলতি সাধারণ ছবির মতো উৎকট নয়। ওঁরা কিন্তু সেটাই ঠিকঠাক করে দেখিয়েছেন। শব্দ তৈরির কাজটা পুরোপুরি হয়ে যাওয়ার পর গোটা ছবিটায় সেটাকে 'মাস্টারিং' করার প্রয়োজন হয়। এটাই শব্দের চূড়ান্ত সম্পাদনা, কোথায় তা বেশি হবে বা কম, তীক্ষ্ণতা কোথায় কী হবে, কোন আওয়াজটা বাদ যাবে কোনটা থাকবে, সবকিছু ঠিক হয় এই মাস্টারিংয়ের সময়। এই সিস্টেমে আরও একটা ব্যাপার থাকে। মূল আওয়াজটা ছবিতে অনেকগুলো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। অর্থাৎ কিনা, ছবিতে পর্দার ডান দিকে একটা দরজা হয়তো বন্ধ হল। সিনেমা হলে সে আওয়াজটা পাওয়া যাবে ডানদিকের সাউন্ড সিস্টেম থেকেই। এই জটিল কাজটাও মাস্টারিংয়ের সময় চূড়ান্তভাবে করা হয়। গোটা ছবিতে এই বিরাট ঝক্কিটা সামলেছিলেন অনুপদা। পরে এই সাউন্ডকে ডলবিতে তুলে নিয়েছিলেন মুম্বইয়ের এক প্রবাসী বাঙালি প্রোফেশনাল। বলাই বাহুল্য, তিনি ডলবি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত।

ভারতে অধিকাংশ ছবিতেই ডাবিং করা হয়। অর্থাৎ শুটিংয়ের সময়কার শব্দ ছবিতে ব্যবহৃত হয় না, সেটাকে একটা 'গাইড ট্র্যাক' হিসেবে রেকর্ড করা হয়। পরে ডাবিং থিয়েটারে এই গাইড ট্র্যাকের সঙ্গে মিলিয়ে এবং মনিটরে নিজেদের অভিনয়ের সময়ের অভিব্যক্তি দেখে অভিনেতা অভিনেত্রীরা সংলাপ বলেন। সেটাই ছবিতে ব্যবহৃত হয়। হলিউডের অধিকাংশ ছবিতেই কিন্তু শুটিংয়ের সময়ের শব্দই ছবিতে রাখা হয়। এটাকে বলা হয় 'সিঙ্ক সাউন্ড'। মজার কথা,

আগে আমাদের এখানে যে সব ছবি হত, তাতে কিন্তু এই সিঙ্ক সাউন্ডই ব্যবহৃত হত। পথের পাঁচালীও পুরোপুরি সিঙ্ক সাউন্ডে তোলা।

আমাদের এখানে সিঙ্ক সাউন্ডের ব্যবহার যে একটা সময়ে প্রায় বন্ধ হয়ে আসে, তার কারণ কিন্তু ক্যামেরা। অধিকাংশ ক্যামেরাই অত্যন্ত পুরনো, চললে একটানা শব্দ হয়। সেই সব ক্যামেরা ব্যবহার করলে সিঙ্ক সাউন্ড করা যাবে না।

একটা সময়ের পর থেকে বাবা পুরোপুরি অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরায় কাজ করেছেন। আমিও করেছি। ফেলুদার সব ছবিই অ্যারি-তে তোলা। অ্যারির বিশেষ কয়েকটা মডেলে কিরকির করে একটা মৃদু শব্দ হয়। তাতে শুটিংয়ের শব্দ নিতে অসুবিধা হয়ে যায়। তাই বাধ্য হয়ে পরে ডাবিং করতে হয়েছে। তবে ব্লিম্প (blimp) নামে একটা জ্যাকেটের মতো জিনিস আছে, যেটা ক্যামেরার গায়ে পরিয়ে দিলে ওই শব্দটা আর বাইরে থেকে শোনা যায় না। তখন সিঙ্ক সাউন্ড করতে আর অসুবিধা থাকে না। আমরা বেশ কয়েকটা ছবিতে এইভাবে কাজ করেছি। গণশত্রু, শাখাপ্রশাখা, আগন্তুক ছবিতে শুটিংয়ের মূল আওয়াজই ছবিতে রাখা হয়েছে। ডাবিং করলে আওয়াজ অনেক পরিষ্কার হয় ঠিকই, তবে সিঙ্ক সাউন্ডের কোনও বিকল্প নেই। স্টুডিওতে তৈরি শব্দে তো আর পুরোপুরি স্বাভাবিকত্ব আসে না।

ক্যামেরার কথা যখন এল, তখন 'স্টেডি-ক্যামে'র প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া অত্যন্ত অনুচিত হবে। হলিউডে তো বটেই, মুম্বইয়ের ছবিতেও বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে এই বিশেষ ব্যবস্থাটি। স্টেডিক্যাম কিন্তু কোনও ক্যামেরা নয়, একটি বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যার সঙ্গে এককটি মুভি ক্যামেরাকে লাগানো যায়। একটি হাইড্রলিক জাতীয় যন্ত্র ক্যামেরাটিকে ধরে থাকে, এবং তার জন্য ক্যামেরাম্যান বিস্তর হাঁটাচলা দৌড়োদৌড়ি করলেও ক্যামেরায় একটুও ঝাঁকুনি লাগে না। বোঝাই যাচ্ছে, 'চেজিং' এর দৃশ্যের জন্য এই জাতীয় ক্যামেরা একদম আদর্শ। সাধারণ মুভি ক্যামেরার নড়াচড়ার জন্য ট্রলি, ক্রেন ইত্যাদি লাগে। কিন্তু যেখানে মুভমেন্ট খুব বেশি, এবং এলোমেলো, সেখানে এই পদ্ধতিতে কাজ করা বেশ ঝক্কির। এই সব দৃশ্যে স্টেডি-ক্যাম ব্যবহার করা যায়। এটিকে ক্যামেরাম্যানের কোমরের সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ক্যামেরাম্যান যেমন খুশি ক্যামেরাকে ঘোরাতে পারবেন। তবে স্টেডি-ক্যাম খুব ভারী হয়। যে ক্যামেরাম্যানের বয়স বেশি, তাঁর পক্ষে এটি চালানো শক্ত। একনাগাড়ে বহুদিন স্টেডি-ক্যাম চালালে শরীরেরও ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে।

সবশেষে বলি বোম্বাইয়ের বোম্বেটের স্পেশাল এফেক্টের কথা।

শিবাজী কাস্‌ল বাড়িটাকে ঘিরেই তো ছবিটার যত কাণ্ড কারখানা। ফেলু তোপসে জটায়ু যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন ক্যামেরা 'টিল্ট আপ' করে, দেখা যায় বহুতলের বিশাল সাইনবোর্ডটা। শুটিংয়ের সময় কিন্তু বাড়িটার গায়ে ওই ধরনের কোনও সাইন বোর্ড লাগানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু বোর্ড না থাকলেও মুশকিল। তাই ওটাকে পরে কম্পিউটর গ্রাফিক্সের সাহায্যে তৈরি করে দেওয়া হল।

এফেক্ট আরও আছে। শিবাজী কাস্‌ল-এর লিফ্‌টের ভিতর মারামারিটার কথা মনে আছে? নিমোর ঘুঁষি খেয়ে সেখানে একজন কাচের দেওয়ালে আছড়ে পড়বে, কাচ ভেঙে চুরমার হবে। এই দৃশ্যগুলোয় সত্যি কাচ ব্যবহার করলে রক্তারক্তি হওয়ার সম্ভাবনা, তাই এক বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সব ব্যবস্থা নিয়েও কাচ ভাঙাটা ঠিক আমার মনের মতো হচ্ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত কোনও কিছু না ভেঙেই দৃশ্যটা শ্যুট করা হয়। পরে গ্রাফিক্সের সাহায্যে কাচ ভাঙা দেখানো হয়।

গাড়ি বিস্ফোরণের দৃশ্যেও আছে গ্রাফিক্স। বিস্ফোরণের শব্দে ভয় পেয়ে উড়ে গেল পাখির দল। পাখিগুলো কম্পিউটারে তৈরি।

তবে ভাগ্য ভাল, কেউই এই সব ফাঁকিগুলো ছবি দেখার সময় ধরতে পারেন নি। এখন রহস্য ফাঁস করে দিলাম।

চলচ্চিত্রের আনাচে কানাচে এমন বহু রহস্য লুকিয়ে থাকে। সিনেমার পরদায় আমরা ছবির যে প্রোজেকশন দেখি, সেটাও তো একটা বড়সড় এফেক্ট। আসলে তো সব ফ্রেমই 'স্টিল'। কিন্তু একের পর এক মুহূর্তের এমন বহু 'স্টিল' যখন পরপর আমাদের চোখের সামনে দিয়ে যায়, সংলাপ সংগীত শোনা যায়, তখন একটা 'ইলিউশন' তৈরি হয়। মনে হয় সত্যিই যেন ছবিটা নড়ছে, কথা বলছে। আর এই ইলিউশনটাই তো সিনেমা, 'দ্য গ্রেটেস্ট ফার্ম অব আর্ট'।

বাবা আর ফেলুদা

ফেলুদাকে নিয়ে লেখালিখি বলতে গেলে হঠাৎই শুরু করেন বাবা। আগে থাকতে সে রকম কোনও প্রস্তুতি ছিল না। সন্দেশ পত্রিকা নতুন করে প্রকাশিত হওয়ার পর ওঁকে এক রকম বাধ্য হয়েই কলম ধরতে হয়। আবির্ভাব হয় প্রফেসর শঙ্কুর। এর বহু আগে উনি চলচ্চিত্র বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। দেশি, এমনকী সাইট অ্যান্ড সাউন্ডের মতো বিদেশি পত্রিকাতেও। দুটো গল্প লিখেছিলেন ইংরেজিতে, শেডস অব গ্রে এবং অবস্ট্রাকশন। সে দু'টো অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এই দুই গল্পের বঙ্গানুবাদ 'জবর বারো' সংকলনে গ্রন্থিত হয়েছে।

বাঙালি পাঠকদের মনে ফেলুদার জন্যে আজ ঠিক যে জায়গাটা তৈরি হয়েছে, তার কোনও আভাস কিন্তু গোড়ার দিকে বাবার পরিকল্পনায় ছিল বলে আমার একেবারেই মনে হয় না। প্রথম ফেলুদা কাহিনি যেটা লিখলেন ১৯৬৫ সালে, তার নাম 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'। সেই গল্পে ফেলুর বয়স সাতাশ, তোপসের সাড়ে তেরো। সাতাশ বছর বয়সের এক বুদ্ধিমান যুবকের হাবভাব ঠিক যেমন হওয়া উচিত, ফেলু ঠিক তাই। অথচ বয়সোচিত চাপল্য তার মধ্যে থেকে তখনও উবে যায়নি, মাঝে মধ্যে তোপসেকে গাঁট্টাও মারে। এরপর 'বাদশাহী আংটি'। এই উপন্যাসেও ফেলুর স্বভাব প্রায় একই, এবং বাবা জানিয়েছেন সে একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি নিয়েছে। অর্থাৎ গোয়েন্দাগিরিকেই পাকাপাকি ভাবে পেশা করে নেওয়ার পরিকল্পনাটা সে তখনও নেয়নি।

হয়তো বাবার মনেও এমন সম্ভাবনা তখনও উঁকি দেয়নি, অন্তত 'বাদশাহী আংটি' প্রকাশের আগে। কিন্তু লখনউ-এর পটভূমিকায় ফেলুর প্রথম উপন্যাসটা প্রকাশিত হতেই চারদিকে যেমন সাড়া পড়ে গেল, বাবা তাকে নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু করতে প্রায় বাধ্য হলেন। পরের উপন্যাস 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' এবং সেখানে ফেলু দস্তুরমতো পাকা গোয়েন্দা।

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি থেকে গ্যাংটকে গণ্ডগোল পর্যন্ত বাবার আঁকা সমস্ত ইলাস্ট্রেশন খুঁটিয়ে দেখলেও এই বিষয়টা বোঝা যায়। বাদশাহী আংটি পর্যন্ত ফেলুর মাথার চুল এলোমেলো, মুখে বেশ একটা সারল্যের ছাপ, পোশাক-আশাকও ততটা স্মার্ট নয়। অথচ গ্যাংটকে গণ্ডগোল থেকেই ফেলু অন্যরকম। কথাবার্তা, পোশাক আশাক চোস্ত, বন্ধ হয়েছে তোপসেকে গাঁট্টা মারাও। এবং ঠিক এই পর্যায়টা থেকেই বাবা ক্রমশ তাঁর নিজের চরিত্রের অনেক কিছু গোয়েন্দাকে ধার দিতে শুরু করলেন। ফেলুর মধ্যে আবছা ফুটে উঠতে লাগল বাবার অনেক অভ্যেস, পছন্দ অপছন্দ, এবং কখনও বাস্তবায়িত না হওয়া নিজের বেশ কিছু পরিকল্পনা। তবে সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' কীভাবে লেখা হয়েছিল, সেই গল্পটা বলা যাক।

১৯৭০ সালের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বী ছবিটা নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েন বাবা। ছবিটা রিলিজ করেছিল সে বছর অক্টোবর মাসে। এর ঠিক আগের বছর, অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে বাবার প্রথম সংকলনটা প্রকাশিত হয়। বইটা বেরনোর কয়েক দিন পরে বাবা প্রযোজক আর ডি বনশলের ছেলের বিয়ের রিসেপশন পার্টিতে গিয়েছিলেন। ওখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় 'দেশ' পত্রিকার তখনকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে।

শঙ্কুর বইটা সাগরবাবু এর মধ্যেই পড়ে ফেলেছিলেন। এবং সেটা তাঁর এতই ভালো লেগেছিল, তিনি দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় একটা গোয়েন্দা উপন্যাস লেখার জন্য বাবাকে অনুরোধ করে বসলেন।

বাবা তো এই প্রস্তাব শুনে অবাক, শেষটায় হেসেই ফেলেন। ওই পত্রিকা মোটামুটিভাবে প্রাপ্তমনস্কদের জন্য, কিন্তু বড়দের জন্য তো উনি বিশেষ লেখেন না। বাবা বোঝানোর চেষ্টা করলেন, বড়দের জন্য তেমন কোনও পরিকল্পনা মাথায় এলে তার থেকে তিনি উপন্যাস লিখবেন না, ছবি করবেন। কাজেই তাঁকে দিয়ে লেখানোর আশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু সম্পাদক মশাই শুনলে তো!

আমার আবছা মনে আছে, সাগরবাবু এর পর থেকে বাড়িতে ঘনঘন টেলিফোন করতেন। বাবা তখন প্রতিদ্বন্দ্বী ছবির শুটিং শুরু করে দিয়েছেন। তাই প্রতিবারই সম্পাদকের প্রস্তাবে না করতে হচ্ছে। তবু টেলিফোন আসতেই থাকে। এরপর একদিন সশরীরে আমাদের বাড়িতে হাজির সাগরময় ঘোষ, হাই ব্লাড

প্রেসার নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে সোজা আমাদের তেতলার বসার ঘরে। বেশ হাঁপাচ্ছেন। বাবা তো ওঁকে ওই অবস্থা দেখেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

শেষতক সাগরবাবুর জেদের কাছে এক রকম হার স্বীকার করেই বাবা একটা রফায় এলেন। সাগরবাবুকে বললেন, ছোটদের জন্য গোয়েন্দা উপন্যাস যদি চলে, তাহলে উনি ভেবে দেখতে পারেন। সে প্রস্তাব মেনে নেন সাগরবাবু। তিনি জানান, পুজো অক্টোবরে, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লেখা দিলেই চলবে।

এর পর অবাক কাণ্ড। বাবা লেখা শুরু করার আগেই ফলাও করে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেল, পুজো সংখ্যায় সত্যজিৎ রায় গোয়েন্দা উপন্যাস লিখবেন।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে বাবা উপন্যাসের প্রথম খসড়াটা শেষ করলেন। তখন নাম ছিল 'গ্যাংটকে ফেলুদা'। মা আর আমাকে পড়ালেন। লেখাটা পড়ে ছোটখাটো দু'একটা খটকা মায়ের লেগেছিল, বাবা সেগুলো ঠিক করে দিলেন। তারপর খসড়া থেকে 'ফেয়ার' করে সেটা পত্রিকা অফিসে পাঠিয়ে দিলেন। উপন্যাসের নামটাও বদলে গেল। সেটা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ।

উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে প্রচণ্ড জনপ্রিয় হল, এবং এক ধাক্কায় অনেকটা বদলে গেল যেন ফেলুদাও। এই প্রথম আমরা মোটামুটি 'ম্যাচিওর্ড' ফেলুকে পেলাম। আমার ধারণা, পত্রিকার পরিবর্তনের জন্যই এটা সচেতনভাবে ঘটিয়েছিলেন বাবা। কারণ দেশ পত্রিকায় যে উপন্যাস বেরচ্ছে, তা তো ছোটদের সঙ্গে বড়রাও পড়বে। সেখানে 'বালখিল্য' ভাবটা ফেলুর মধ্যে রাখলে চলবে কী করে?

একটা কথা বলে রাখা দরকার। সাগরবাবু বাবার লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বাবার লেখা নেওয়ার জন্য ওঁর নাছোড়বান্দা মনোভাবের আরও একটা বড় কারণ ছিল। গোয়েন্দা ব্যোমকেশের স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মারা যান ওই ১৯৭০ সালের প্রথমের দিকেই। ওঁর রহস্য উপন্যাসগুলো বাঙালির কাছে ঠিক কতটা জনপ্রিয় ছিল, সেটা আর নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। অনেকে ফেলুদার মধ্যে ব্যোমকেশের প্রচ্ছন্ন প্রভাব দেখতে পান। ব্যোমকেশের শেষ রহস্যোপন্যাস 'শজারুর কাঁটা' সাগরবাবুর পত্রিকাতেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় চলে যাওয়ায় বাংলা রহস্য উপন্যাসের প্রায় অনাথ হওয়ার অবস্থা হয়েছিল। সাগরবাবুর ব্যক্তিগত ধারণা ছিল, এই শূন্যস্থানকে নতুন চেহারা দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র বাবারই আছে।

ক্রমশ বাবার বেশ কিছু ব্যক্তিগত লক্ষণও পরের পর কাহিনিতে ফেলুদার মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখটা কাটতেন না বাবা। ফেলুদাও না। গোয়েন্দা চরিত্রের সঙ্গে বাবার শারীরিক সাদৃশ্য যে ক'টা ছিল, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। এর পরেই আসছে উচ্চতার ব্যাপারটা। বাবা ছিলেন ছ'ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি। ফেলুকেও উনি ছ'ফুটের ওপরেই রেখেছেন। ছ'ফুট দুই। তার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। আর চোখদুটো খুবই ঝকঝকে। বাবারও দৃষ্টি ছিল প্রখর। গভীর ব্যক্তিত্ব। সরাসরি ওঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলার মতো মানুষ আমি কমই দেখেছি।

চোখের প্রসঙ্গ যখন এল, তখন একটা মজার ঘটনার কথা না বলে পারছি না। সোনার কেল্লা ছবিটার শুটিংয়ের ঠিক আগেকার কথা এটা। সৌমিত্রকাকাকে ফেলুদা সাজিয়ে স্ক্রিন টেস্ট নেওয়ার পর প্রোজেকশন দেখে একটু চিন্তায় পড়লেন বাবা। ফেলুদার চোখ দুটো যতটা উজ্জ্বল হওয়া উচিত, ততটা লাগছে না।

এমনিতে সৌমিত্রকাকার চোখ বেশ ঝকঝকে। কিন্তু বাস্তব আর পরদার মধ্যে ফারাক তো একটা থাকেই। আবার চোখদুটো ঠিকমতো না হলে পরদায় ফেলুদার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারাটা ঠিক খুলবে না।

পরে লক্ষ করে দেখা গেল, সৌমিত্রকাকার চোখের পাতা অত্যন্ত কম হওয়ার জন্যই এমনটা লাগছে। এই 'আইল্যাশ'ই ছবিতে চোখের 'আউট লাইন' তৈরি করে। তাই ওঁর চোখদুটো পর্দায় নিষ্প্রভ লাগছে।

তখন ঠিক হল, ওঁর চোখে নকল আইল্যাশ পরানো হবে। সাধারণত এটা মহিলা শিল্পীদের মেক আপের জন্যই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কী আর করা যাবে!

আইল্যাশ পরানোর পর কিন্তু সৌমিত্রকাকার মুখটা যা দেখতে হল, সে আর কী বলব! আসলে ফিল্ম মেক আপের জিনিসপত্র তখন কলকাতায় খুব একটা ভালো পাওয়া যেত না। আইল্যাশগুলো ছিল বেশ মোটা মোটা। কিন্তু ওই বিদঘুটে জবরজং মুখ তো আর ফেলুদা হতে পারে না। কাজেই আইল্যাশ কোনও কাজে লাগল না। এই ব্যাপারেই একটা আপসোস আজও আমার মনে রয়ে গিয়েছে। আইল্যাশ পরা সৌমিত্রকাকার একটা স্টিল ছবি আমার সেদিন তুলে রাখা উচিত ছিল। কেন যে তা করিনি, সেটা এখন আর ঠিক মনে পড়ে না!

শেষ পর্যন্ত সৌমিত্রকাকার নিজের চোখের পাতার ওপরেই ভারী করে

হাইলাইট করে দেওয়া হল। তাতেই যা হোক করে কাজ চালিয়ে নিলেন বাবা।

এবার ফেলুদার পছন্দের পোশাকের কথা বলা যাক। সবচেয়ে পছন্দের পোশাক ট্রাউজার্স এবং শার্ট। বাবাও এই কম্বিনেশনটা অত্যন্ত পছন্দ করতেন। বিশেষ করে শ্যুটিংয়ের সময় এই পোশাকটাই ওঁকে বেশি পরতে দেখেছি। শীতকাল হলে কাজের সময়ে একটা হালকা ধরনের জ্যাকেট চড়াতেন। লক্ষ করার বিষয়, ওঁর বহু ইলাস্ট্রেশনে ফেলুদাও জ্যাকেট পরেছে। এবং তার ধাঁচ অনেকটা বাবার জ্যাকেটের মতোই।

ট্রাউজার্সের ওপর শার্ট ছাড়াও প্রায়ই পাঞ্জাবি পরে ফেলুদা। বাবা অবশ্য এই পোশাকটা কোনওদিনই পরেননি। বাড়িতে ওঁর প্রিয় পোশাক ছিল পাঞ্জাবি আর পায়জামা। অনেক আগে গেরুয়া রঙের লম্বা পাঞ্জাবির ওপর ওঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বাবা অবশ্য কোনওদিন জিনসও পরেননি, যেটা ফেলুদা খুবই পরেছে।

উৎসবে অনুষ্ঠানে কিন্তু বাবা ছিলেন খাঁটি বাঙালি। ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। ফেলুদাও সময় সুযোগ হলেই ধুতি পাঞ্জাবি পরে। 'গোলাপী মুক্তো রহস্য' কাহিনিতে তার গণ-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও সে এই পোশাকই পরেছে। আর তোপসের বয়ান অনুযায়ী, ধুতি পাঞ্জাবিতে তাকে নাকি দিব্যি মানিয়ে গিয়েছে।

এ তো গেল বহিরঙ্গের কথা। বাবা তাঁর গোয়েন্দাকে নিজের চরিত্র এবং স্বভাবেরও অনেককিছু উপহার দিয়েছেন। আমরা দেখেছি, ফেলুদার মাথাটা অত্যন্ত ঠান্ডা। সহজে ঘাবড়ায় না, বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে 'মগজাস্ত্র'-এর ধার ভোঁতা হয় না। চট করে রাগেও না। বাবার মধ্যেও এই গুণটা ভীষণভাবে ছিল। অত্যন্ত ঠান্ডা মেজাজের মানুষ তো বটেই, ওঁকে সেভাবে কোনওদিন রাগতেও দেখিনি। আমাকে একবার বলেছিলেন, শান্তিনিকেতনে থাকার সময় শিল্পী নন্দলাল বসুর মানসিক স্থৈর্য নাকি ওঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। নন্দলাল বসুর ড্রয়িংয়েরও ভীষণ ভক্ত ছিলেন বাবা। প্রথম জীবনে বাবা ওরিয়েন্টাল আর্টের রীতি মেনে যে সব ছবি এঁকেছেন, তাতে নন্দলাল বসুর শৈলীর প্রভাব রয়েছে। তবে এই নান্দনিক দিক ছাড়াও স্রেফ একজন মানুষ হিসেবে যে নন্দলাল বসু বাবাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, সেটা ভাবতেই আমার ভীষণ 'ইন্টারেস্টিং' লাগে।

বাবার পড়াশোনার পরিধি নিয়ে তো আর নতুন করে বলার কিছু নেই। ব্ল্যাক

ম্যাজিক থেকে বিগ ব্যাং, পড়াশোনার বিষয়ের বৈচিত্র্য যে ঠিক কতটা ছিল সেটা ওঁর ঘরে একবার ঢুকলেই এখনও বোঝা যায়। দেশি বিদেশি পত্রপত্রিকা প্রচুর পড়তেন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, লাইফ, ওমনি, সাইন্টিফিক অ্যামেরিকান, সাইট অ্যান্ড সাউন্ড ইত্যাদি কয়েকটি নাম এখনই মনে আসছে। এর বাইরেও রয়েছে প্রচুর পত্রপত্রিকা। ডাকযোগে বহু স্থানীয় পত্রিকার কপিও বাড়িতে আসত, এবং তার বেশির ভাগই যেত বাজে কাগজের ঝুড়িতে।

বাবার মতো এতটা না হলেও, ফেলুর পড়াশোনার 'রেঞ্জ'ও নেহাত কম নয়। এই পত্রিকাগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ফেলুদাও পড়ে। ফেলুদাকে বিশেষভাবে টানে ভ্রমণকাহিনি। কোনও জায়গায় তদন্তে যাওয়ার আগে সেখানকার সম্বন্ধে ভালো করে পড়াশোনা করে নেওয়াটা হল ফেলুদার বরাবরের অভ্যেস। আসলে বাবাও ঠিক এটাই করতেন। সোনার কেল্লা বা জয় বাবা ফেলুনাথে রাজস্থান ও বেনারসের এমন অদ্ভুত বর্ণনা উঠে এসেছে, যে স্রেফ ওই দুটো বই হাতে নিয়েই বোধহয় ওই জায়গাগুলো ঘুরে আসা যায়। জেনে ফেলা যায় তাঁদের ইতিবৃত্ত। কোনও জায়গার ভূগোল ইতিহাসের কথা বাবা গল্প বলার ফাঁকে এমনভাবে বলতেন, মনেই হত না কেউ কোনও শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

আসলে পাঠকদেরও বাবা তাঁর চিন্তাভাবনার শরিক করতে চাইতেন। যখনই কোনও নতুন জিনিস দেখতেন বা নতুন কিছু পড়তেন, এবং সেটা যদি ওঁর ভালো লাগত, ফেলুদা অথবা শঙ্কুর কাহিনিতে সেটা লেখার চেষ্টা করতেন। একটা উদাহরণ তো আমার এখনই মনে আসছে।

কল্পবিজ্ঞান লেখক মাইকেল ক্রিকটনের লেখা 'জুরাসিক পার্ক' উপন্যাসটা থেকে ছবি করেছিলেন স্পিলবার্গ। এর আগে ক্রিকটন দুর্দান্ত একটা উপন্যাস লিখেছিলেন, 'কঙ্গো'। সেটা পড়ে বাবার খুব ভালো লেগেছিল। এরপরেই তিনি শঙ্কুর অভিযান কঙ্গোতে নিয়ে গিয়ে ফেললেন, 'শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান'।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, দেশ বিদেশের যে সমস্ত জায়গা থেকে বাবা সশরীরে ঘুরে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকগুলোই ফেলুদার কাহিনির পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার ঘটছে সেই সমস্ত জায়গায়, যেখানে ওঁর যাওয়ার ইচ্ছা ছিল খুবই, কিন্তু সে ইচ্ছা আর বাস্তবায়িত হয়নি। শঙ্কুর কাহিনিগুলোয় ফ্যান্টাসির প্রভাব বেশি বলেই হয়তো তার ঘটনাস্থল নিয়েও পুরোপুরি কল্পনার ওপরেই ভরসা রাখতেন।

ক্রিস্টনের উপন্যাস পড়ে তো কঙ্গো নিয়ে খুবই উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন বাবা। অন্যদিকে লখনউ, দার্জিলিং, বেনারস, লন্ডন ছিল ওঁর অত্যন্ত পছন্দের জায়গা। ফেলুদার প্রথম দিককার তদন্তগুলো এই সব জায়গাতেই।

ফেলুদার কাহিনিগুলো লেখার সময় তাই কোনও জায়গার রেফারেন্স নিয়ে ওঁকে তেমন সমস্যায় পড়তে দেখিনি। যেটা খুবই হত শঙ্কুকে নিয়ে লেখার সময়। তখনও ইন্টারনেট আসেনি, সামান্য তথ্য খোঁজার জন্যও প্রচুর পড়াশোনা করতে হত। সব সময়ে বইপত্রও হাতের কাছে থাকত না। তবু এতটা পরিশ্রমের জন্যই শঙ্কুর কাহিনিতে ওঁর না দেখা জায়গার বিবরণ এত জীবন্ত, মানুষজন রাস্তাঘাটের নাম বা ভৌগোলিক বর্ণনাও একেবারে যথাযথ। সিনেমা হোক বা সাহিত্য, ডিটেইল নিয়ে ওঁর চিন্তাভাবনা সত্যিই ছিল দেখে শেখার মতো।

এখানেই শেষ নয়। শঙ্কুর কাহিনির ইলাস্ট্রেশন করতেও ওঁকে এই রেফারেন্সের সমস্যায় পড়তে হত। ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক, নেচার ইত্যাদি পত্রিকাগুলো থেকে কিছুটা সাহায্য মিলত ঠিকই, কিন্তু তাতে পুরো প্রয়োজন মিটত না। একটা জায়গার বিবরণ বইয়ে পড়লেও তার হুবহু চেহারাটা বুঝতে কিন্তু সবচেয়ে আগে দরকার ছবি, যেটা সবসময় হাতের কাছে থাকত না। তবে বিদেশে ওঁর প্রচুর বন্ধুবান্ধব ছিলেন। তাঁদের অনুরোধ করতেন কোনও বিশেষ জায়গার ছবি বা পিকচার পোস্টকার্ড পাঠানোর জন্য। সে সব যখন ডাক মারফত হাতে এসে পড়ত, একেবারে ছোট ছেলের মতো আনন্দ করতে দেখেছি ওঁকে। ওই ছবিগুলোকে রেফারেন্স মেনে এরপর ঝটপট ইলাস্ট্রেশনের কাজ সেরে ফেলতেন।

ডিটেইল নিয়ে এত চিন্তাভাবনা করতেন বলেই টিনটিনের কমিকস এত প্রিয় ছিল বাবার। টিনটিনের স্রষ্টা হার্জের সহজ সরল আঁকার ভঙ্গিতে বিভিন্ন দেশ বা শহরের ছবি হুবহু উঠে এসেছে। হার্জের ইলাস্ট্রেশনের ভক্ত ছিলেন বাবা। প্রথম দিকে তো এই ফরাসি কমিকসের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। পরে, ছ'য়ের দশকের শেষের দিকেই হবে বোধহয়, দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়ে একটা বইয়ের দোকানে হঠাৎই টিনটিনের ইংরেজি অনুবাদ আবিষ্কার করে ফেলি। হার্ড কভার এডিশন, স্পাইনে লাল কভার দেওয়া। বোধ হয় চার পাঁচ টাকা দাম ছিল। সেটা নিয়ে যখন হোটেলে ফিরলাম, বইটা দেখামাত্র উনি আমার হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে গোগ্রাসে পড়ে ফেললেন। টিনটিনের পরের বইগুলোর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে, অর্থাৎ আমার আগেই বাবা পড়ে নিয়েছেন।

ফেলুদাও কিন্তু টিনটিনের কমিকসের ভীষণ ভক্ত।

আমার ধারণা, এতটা শিশুসুলভ কৌতূহল এবং আগ্রহ শেষ বয়েস অবধি বাবার মধ্যে ছিল বলেই ওঁর সৃষ্টির সম্ভার এত বিচিত্র। আর ছিল একটা ভীষণ খোলা মন, অটুট ধৈর্য, লেগে থাকার ক্ষমতা, এবং খুঁটিনাটি কাজেও অসম্ভব যত্ন। অনেকেই জানেন না, প্রত্যেকটা গল্প বা উপন্যাসের খসড়া থেকে ফেয়ার করার কাজটা উনি নিজেই করতেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটা কাহিনির একাধিক খসড়া তৈরি করতেন। শেষের দিকে ওঁর শরীর যখন বেশ খারাপ, আমি বহুবার বলেছি, খসড়া থেকে ফেয়ার কপি আমি না হয় করে দিই। রাজি হননি। কারণ ফেয়ার করার সময়েও বহু খুঁটিনাটি পরিবর্তন উনি করতেন। সেটা অন্যের হাতে দিলে সম্ভব হবে কী করে? এত যত্ন যাঁর, তাঁর রচনা তো অন্যদের থেকে আলাদা হবেই।

পেশাদারি ব্যাপারে, অর্থাৎ টাকাপয়সার বিষয়ে বাবা চিরকালই অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। এক একটা ছবির পিছনে অক্লেশে কত পরিশ্রমই না করেছেন। মনের আনন্দেই করেছেন। একটা ভালো ছবি করার পর শিল্পী হিসেবে যেটুকু মানসিক তৃপ্তি, সেটাই সব ছিল ওঁর কাছে। কাজের বিনিময়ে পয়সাকড়ি কী পাওয়া গেল সেটা নিয়ে কোনওদিনই মাথা ঘামাননি।

তাছাড়া ঠিক কোন পরিচয়ে ওঁর টাকা নেওয়া উচিত হত? পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, লেখক, সংগীত পরিচালক, নাকি পোস্টার ডিজাইনার? আর সব মিলিয়ে ধরলে তো একটা বিশাল পারিশ্রমিক দাঁড়ায়। কোনওদিনই তো পরিচালনার পাশাপাশি অন্যান্য কাজের জন্যে টাকাপয়সা দাবি করেননি। কোনও প্রযোজকও এ বিষয়ে ভাবেননি, আজ বলতেই হয়।

কী যে সব অবিশ্বাস্য কম বাজেটে এক একটা ছবি করেছেন, আমার তো আজকাল ভাবতেই অবাক লাগে। বাড়িতেও সাংসারিক হিসাবনিকাশ নিয়ে ভাবতেন না। টাকাপয়সার হিসেব থাকত না। কোথাও যাওয়ার হলে মায়ের কাছে গিয়ে টাকা চাইতেন। কারণ সংসারের সব হিসেব মা-ই রাখেন বরাবর। ফেলুদাও কিন্তু পয়সাকড়ির ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন। নির্লোভ। শুধু কাজের চরিত্র নিয়েই ভাবে। প্রথমের দিকে তার দক্ষিণা হাস্যকর রকমের কম। পরে সেটা বেড়ে পাঁচশো হয়েছে, আরও পরে পাঁচ হাজার। হত্যাপুরী উপন্যাসে তোপসে তো বলেই দিয়েছে, 'কেস জমাটি হলে রোজগার হল কি না হল সেটা

ফেলুদা ভুলে যায়।'

এইভাবেই চলছিল। কিন্তু ফেলুদা আর শঙ্কুর ফরমায়েশি লেখা লিখতে বাবা যে ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, সেটা বেশ বুঝতে পারতাম। অনেক সময়েই মাথায় সে রকম প্লট আসত না, কিন্তু জোর করে লিখতে হত। তাতে লেখাটার প্রতিও সুবিচার করা যেত না। এই কথা শেষের দিকে ফেলুদার কাহিনিতে লিখেওছেন বাবা। লেখা নিয়ে যে কষ্টের মধ্যে রয়েছেন, সেটা ওঁর সঙ্গে কথা বললেই বেশ বোঝা যেত।

এই সময়েরই একটা কথা আমার এখনও মনে আছে। বাবার শরীর তখন বেশ ভেঙে পড়েছে। বসার ঘরে ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে আসছে। হঠাৎ উনি বললেন,

'ভাবছি এবার শঙ্কুকে মেরে ফেলব।'

বাবার মুখ থেকে যে এই ধরনের কথা কোনওদিন বেরোতে পারে, আমি ভাবতে পারিনি। মনটা এক মুহূর্তেই বেশ খারাপ হয়ে গেল। চুপচাপ বসেছিলাম, কোনও কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না।

বাবা সেটা লক্ষ করে আবার বললেন, 'কোনও নতুন প্লট মাথায় আসছে না। বুঝতে পারছি না আর কোন নতুন জায়গায় নিয়ে গিয়ে শঙ্কুকে ফেলব। তাছাড়া শঙ্কুর বয়েস হয়ে গিয়েছে, সে তো মারা যেতেই পারে।'

—কিন্তু শঙ্কুর কাছে তো মিরাকিউরল রয়েছে। সে তো মরতে পারে না।

আমার কথাটা শুনেই যেন সংবিৎ ফিরল বাবার।

কিছুক্ষণ থেমে থেকে বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'সে কথাও তো ঠিক। শঙ্কু মরতে পারে না।'

বাবার কাছে মিরাকিউরল ছিল না। যখন চলে যাওয়ার সময় এল, বহু চেষ্টা করেও আমরা তাঁকে রাখতে পারলাম না।

বেলভিউয়ে যখন শেষের ক'টা দিন কাটছে, তখন যতবারই ওঁর ঘরে ঢুকেছি, টেবিলের ওপর বই, কাগজপত্র ছড়ানো দেখে মনে হয়েছে হঠাৎ কোনও দরকারে বেরিয়েছেন, ফিরে এসে আবার কাজে বসবেন।

জীবিত অবস্থায় আর বাড়িতে ফেরা হয়নি ওঁর।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, নার্সিং হোমে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন আগেই নিজের দুই প্রিয় চরিত্রকে নিয়ে কাজ উনি শেষ করেছিলেন। প্রথমটা ফেলুদার কাহিনি

'রবার্টসনের রুবি'। দ্বিতীয়টা ইংরেজিতে, অপুকে নিয়ে জীবনের এক বিরাট পর্যায়ের গল্প, 'মাই ইয়ার্স উইথ অপু।'

খসড়া অবস্থায় শেষ না হয়ে পড়ে ছিল কয়েকটা গল্পও। উনি চলে যাওয়ার কিছুদিন পর থেকে 'রবার্টসনের রুবি' এবং 'মাই ইয়ার্স উইথ অপু'র ফেয়ার কপিগুলো খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে বুঝলাম ও দুটো চুরি হয়েছে।

ওই ইংরেজি লেখাটার খসড়া থেকে বহু চেষ্টায় একটা ফেয়ার তৈরি করেন মা। সেটাই প্রকাশিত হয়েছে।

খুবই আশ্চর্যের কথা, পরে আমাদের বাড়ি থেকে রবার্টসনের রুবি'র একটা দ্বিতীয় খসড়া পাওয়া গেল। এটার থেকে সংশোধন করেই বাবা চূড়ান্ত কপিটা তৈরি করেছিলেন, যেটা চুরি যায়। এই দ্বিতীয় খসড়া তৈরির কাজটা কিন্তু শারীরিক অবনতির জন্যেই উনি বহুদিন আগে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এখনও ঠিক বুঝতে পারি না, কেন ওই কাহিনির দুটো খসড়া তৈরি করার দরকার হয়েছিল। তাহলে কি ফেয়ার কপিতে কাহিনিতে বড়সড় কোনও পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন? অন্য চেহারা পেয়েছিল রবার্টসনের রুবি?

ফেলুদার শেষ কাহিনি ঘিরে এই রহস্যটা সমাধানের অপেক্ষায় রইল।

সমাপ্ত

শুধু গোয়েন্দা নয়, 'ফেলুদা' নামটা শুনলেই আরও যে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সেটা হল একজন ঝকঝকে, শিক্ষিত, রুচিশীল বাঙালি যুবক, যার 'মগজাস্ত্র' কখনওই ব্যর্থ হয় না। বাঙালির এই 'আইডলে'র সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ এবং তাকে নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরির কিছু কাহিনি আমাদের শুনিয়ে গিয়েছেন তার স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়। কিন্তু বেশিরভাগই প্রকাশিত হয়নি। এই বইয়ে ফেলুদাকে নিয়ে সেই সব অজানা গল্প বলেছেন সন্দীপ রায়, যাঁর হাতে 'ফেলুদা'র প্রত্যাবর্তন ঘটেছে চলচ্চিত্রের পর্দায়।

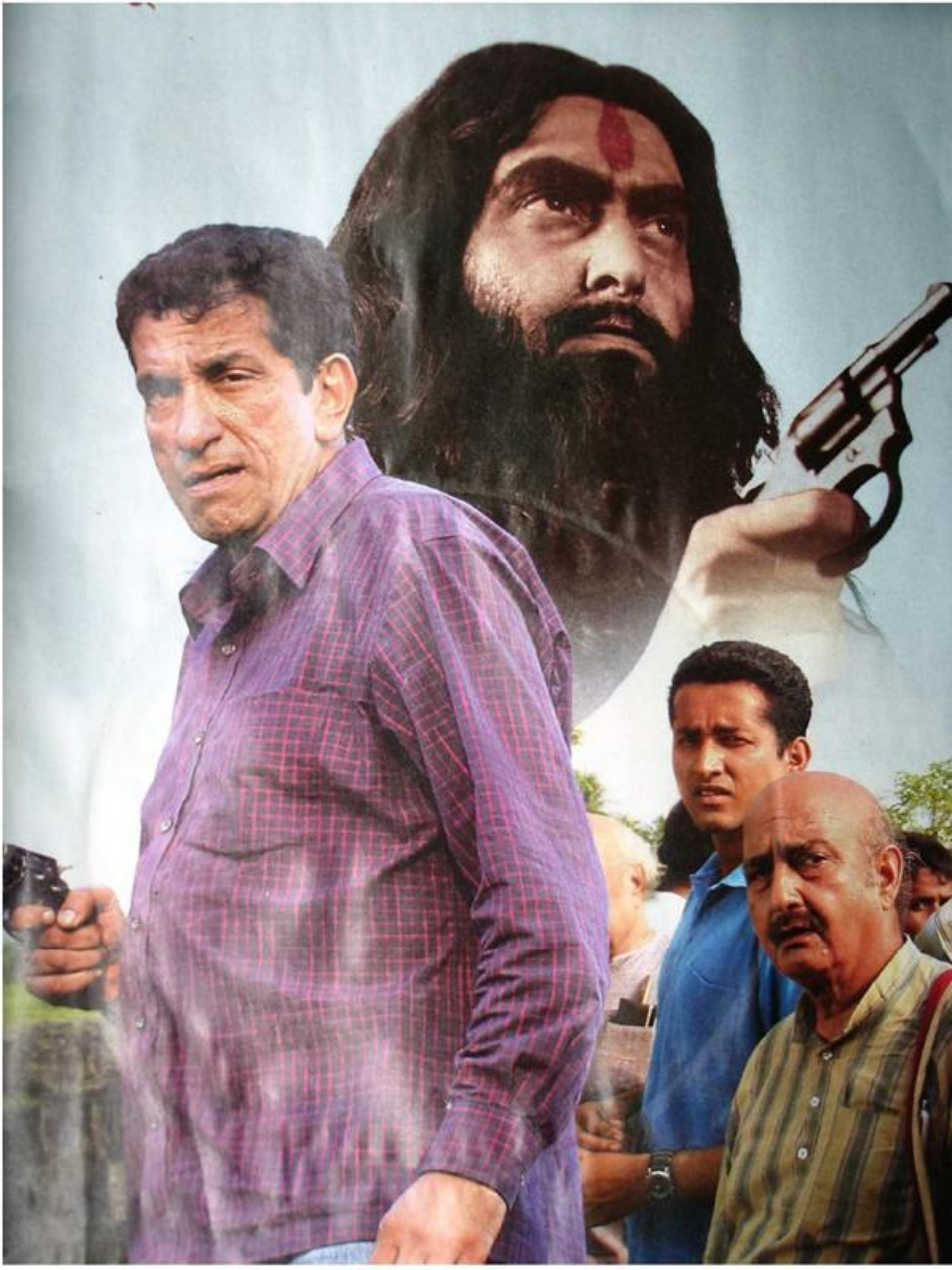

ফেলুদার চরিত্রে সৌমিত্রর সঙ্গে সব্যসাচীর কতটা তুলনা চলতে পারে?

অসাধারণ এক চরিত্র সত্যজিৎ রায়ের গোয়েন্দা ফেলুদা। অসম্ভব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, স্মার্ট, আবার বাঙালি। অন্যান্য গল্পের গোয়েন্দাদের মতো আকাশ থেকে পড়া নয়, ফেলুদা যেন আমাদের পরিবারেরই একজন। ঠিক সেই ফেলুদাকে খুঁজে পাওয়া যায় অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে। জয়বাবা ফেলুনাথ তাই এতটা জনপ্রিয়। ফেলনা নয় ফেলুদা সব্যসাচীও। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব্যসাচীর ফেলুদা একটু অ্যাকশনধর্মী। কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি, স্মার্টনেস এবং বাঙালিয়ানায়ও কম যান না ফেলুদা সব্যসাচী। কৈলাসে কেলেঙ্কারীতেও তাই ফেলুদাপ্রিয় বাঙালির এমন উপচে পড়া ভিড়। সন্দেহ নেই বলিষ্ঠ অভিনেতা দুই ফেলুদাই—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সব্যসাচী চক্রবর্তী। ফেলুদার চরিত্রে এঁরা কে কেমন? বিশ্লেষণ করেছেন সত্যজিৎতনয় পরিচালক

সন্দীপ রায়

তর্কপ্রিয় বাঙালি

কিছু কিছু বিষয় নিয়ে বাঙালিদের মধ্যে চিরকাল, প্রজন্মের পর প্রজন্ম তর্ক হয়ে চলেছে। যেমন উত্তমকুমার না সৌমিত্র, হেমন্ত না মান্না, ইষ্ট বেঙ্গল না মোহন বাগান। এসব তর্কের কোনও শেষ নেই, হার জিত নেই, এরকম তর্ক চলতেই থাকবে। ঠিক সেরকমই ফেলুদার চরিত্রে কে সেরা? সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় না সব্যসাচী চক্রবর্তী! বাঙালি সিনেমাপ্রেমীদের কাছে এ এক নতুন তর্কের বিষয়। সত্যি কথা বলতে কী এরকমভাবে দুজন অভিনেতার অভিনয় নিয়ে তুলনা করা যায় না, সম্ভব নয়। জেমস বন্ডকে নিয়ে যখন সিনেমা করা হল তখন জেমস বন্ডের ভূমিকায় প্রথম দেখা গিয়েছিল শন কনারিকে। বিপুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল জেমস বন্ডের ছবিগুলো, জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন শন কনারিও। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শন কোনারিকে জায়গা ছেড়ে দিতে হল, এলেন রজার মুর, তারপর রজার মুরকেও সরে দাঁড়াতে হল। তারপর একে একে আরও বেশ কিছু অভিনেতার হাত ঘুরে জেমস বন্ড চরিত্রটি এখন ড্যানিয়েল ক্রেগের হস্তগত। অভিনেতা বদলের ফলে কিন্তু জেমস বন্ডের সিনেমার জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র কমেনি। যাঁরা পুরনো মানুষ, শন কনারিকে জেমস বন্ডের চরিত্রে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের মনে শন কনারি দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে গেছেন। জেমস বন্ডের চরিত্রে বিভিন্ন অভিনেতাদের নিয়েও তর্ক হয়েছে, তাতে বয়স্করা হয়তো শন কনারির পক্ষে গলা ফাটিয়েছেন। আবার আধুনিক প্রজন্মের দর্শকদের কাছে ভ্যানিয়েল ক্রেগই সেরা জেমস বন্ড। দুজন আলাদা আলাদা অভিনেতার অভিনয় ক্ষমতার তুল্যমূল্য আলোচনা করা যায় না। ফেলুদার চরিত্রের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক সেরকমই।

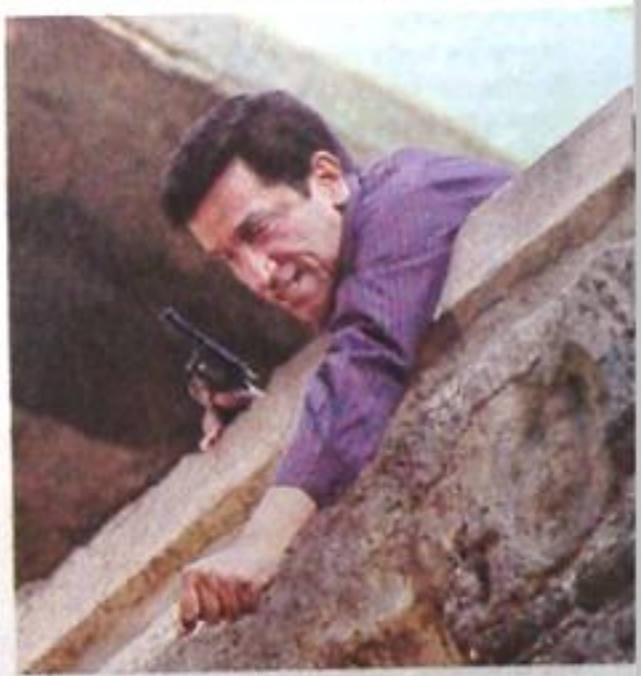

জেমস বন্ডের চরিত্রে বিভিন্ন অভিনেতাদের নিয়েও তর্ক হয়েছে, তাতে বয়স্করা হয়তো শন কনারির পক্ষে গলা ফাটিয়েছেন। আবার আধুনিক প্রজন্মের দর্শকদের কাছে ভ্যানিয়েল ক্রেগই সেরা জেমস বন্ড। দুজন আলাদা আলাদা অভিনেতার অভিনয় ক্ষমতার তুল্যমূল্য আলোচনা করা যায় না। ফেলুদার চরিত্রের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা ঠিক সেরকমই।

বাবার করা সোনার কেল্লা আর জয়বাবা ফেলুনাথ ছবি দুটিতে সৌমিত্রকাকু ফেলুদার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। তারপর ন্যাশনাল নেটওয়ার্কের জন্য হিন্দিতে হল কিস্‌সা কাঠমাণ্ডুকা। তাতে ফেলুদা সাজলেন শশীকাপুর। লালমোহনবাবু হলেন মোহন আগাসে। তবে কিস্‌সা কাঠমাণ্ডুকার ব্যাপারে বলি, এটা ঠিক ফেলুদার ছবি হয়নি, একটা থ্রিলার হয়ে গিয়েছিল। যাইহোক এরপর বিভাস চক্রবর্তী কলকাতা দূরদর্শনের জন্য ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা আর গোলকধাম রহস্য গল্প দুটি নিয়ে টেলিছবি বানালেন। সেখানে সৌমিত্রকাকুই ফেলুদা সেজেছিলেন। এরপর কিন্তু টেলিভিশনের জন্য আমি অসংখ্য ফেলুদার কাহিনি চিত্রায়িত করেছি যেগুলোতে বেণুই ফেলুদা। বেণুকে ফেলুদা করে করা টেলিছবিগুলো নন্দন দুই-এ আলাদাভাবে রিলিজও করেছে এবং বোধহয় টেলিছবির আলাদাভাবে মুক্তি পাওয়া সেই প্রথম ঘটল। তারপরে তো বোম্বাই-এর বোম্বেটে আর এখন চলছে কৈলাসে কেলেঙ্কারি দুটোতেই বেণু (সব্যসাচী চক্রবর্তী) ফেলুদার ভূমিকায়। বোম্বেটে যেমন ভালো চলেছিল, কৈলাসে কেলেঙ্কারিও তেমনি জনপ্রিয় হয়েছে। এরপর তৈরি হচ্ছে টিনটোরেটোর যিশু যেটা আগামী ডিসেম্বরে মুক্তি পাবে এবং ফেলুদার টিম অর্থাৎ বেণু, পরমব্রত আর বিভুদা (বিভু ভট্টাচার্য) অটুট থাকছে। তারপর হয়তো আরও দুটো কি তিনটে ছবিতে এই টিমটাকে ধরে রাখা যাবে কিন্তু তারপর ফেলুদার জন্যে আবার নতুন মুখ খুঁজতে হবে, বদলে যাবে তোপসেও, লালমোহনবাবু হয়তো একই রইলেন। আসলে সবারইতো বয়স বাড়ছে। ঠিক একদিন যেমন সৌমিত্রকাকুর বদলে বেণু এসেছিল তেমনি বেণুর বদলে অন্য কেউ আসবে। কে আসবে এখনও জানি না, সেরকম কেউ এখনও আমার চোখের সামনে নেই।

ফেলুদা ভার্সেস ফেলুদা

সৌমিত্রকাকুর করা ফেলুদা আর বেণুর করা ফেলুদার চরিত্রের মধ্যে কিন্তু কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। পরিচালক হিসেবে কিছু পার্থক্য আমি সচেতনভাবে ঘটিয়েছি আর কিছু পার্থক্য আছে দুজনের শারীরিক বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব আর উপস্থিতিতে। সৌমিত্রকাকুর চেহারায় একটা বাঙালি সুলভ কমনীয়তা বা সফটনেস পাওয়া যায়। '৭২ সালে বাবা যখন প্রথম ফেলুদার ছবিতে হাত দিলেন তখন সময়টা অন্যরকম ছিল। অনেক সহজ সরল সময় ছিল সেটা। কিন্তু আজ ২০০৮ সালে সমাজ, পারিপার্শ্বিক, মানুষের মন, চিন্তাভাবনা ইত্যাদি দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই সময়টা ভীষণ গতিময়, আজকালকার সিক্স সেভেনে পড়া ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি বোঝে, অনেক বেশি জানে, তারা অনেক বেশি পরিণত, এতে ক্ষতির দিকও খানিকটা আছে। আমাদের সময়ে কিন্তু ক্লাস সিক্স সেভেনে পড়া ছেলেমেয়েরা এত জানত না, এতটা পরিণত ছিল না। ভিলেনির কায়দাটাও বদলেছে, তখনকার ৭২-৭৩ সালের দুশমনরা এতটা দুর্ধর্ষ ছিল না। এখন মানুষ মারতে হাত কাঁপে না, কথায় কথায় বন্দুক পিস্তল বেরিয়ে আসে, মানুষ খুন হয়ে যায়। ফলে ফেলুদাকে একটু রাফ টাফ হতেই হবে, শারীরিকভাবে সক্ষম হতে হবে, তাই আমি চেয়েছি ফেলুদা একটু অ্যাকশন করুক। সত্যজিৎ রায়ের লেখায় কিন্তু ফেলুদার শারীরিক সক্ষমতার এবং মারপিট করার কথা উল্লেখ আছে। সৌমিত্রকাকুর বদলে এই মুহূর্তে কিন্তু বেণু ছাড়া ফেলুদা করার মতো অন্য কোনও লোক নেই। বেণুর উচ্চতা, গলার আওয়াজ, ব্যক্তিত্ব, হাঁটাচলা, দিল্লিতে মানুষ হবার ফলে হিন্দি ইংরেজিতে কথা বলার সাবলীলতা, স্মার্টনেস এসবই ফেলুদার চরিত্রের সঙ্গে মানানসই, তাছাড়া ফেলুদার যে টিপিক্যাল বাঙালিয়ানা সেও ষোলো আনা উপস্থিত ওর মধ্যে। বেণুকে কিন্তু ফেলুদা হিসেবে প্রচুর মানুষ মেনে নিয়েছেন। আসলে আমরা বাঙালিরা পুরানোর বদলে নতুন কিছু গ্রহণ করতে, মেনে নিতে একটু সময় নিই। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনীত ফেলুদাও বাঙালির তেমনই একটা মেন্টাল ব্লক, তবে সব্যসাচী চক্রবর্তীও ফেলুদা হিসেবে বাঙালিদের মধ্যে ইতিমধ্যে গ্রহণযোগ্য এবং জনপ্রিয়। আমরা চেষ্টা করেছি ফেলুদার ছবিকে আরও আধুনিক এবং সমসাময়িক করে তুলতে এবং তা করতে গিয়েই ফেলুদার চরিত্রে যা কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন তা আনতে হয়েছে। ফেলুদা যথেষ্ট অ্যাকশন করেছে। তবে তা অবশ্যই অবাস্তব এবং মাত্রাতিরিক্ত নয়। অনেক ছবিতে যেমন দেখা যায় নায়ক একাই দশজনকে ঘায়েল করে দিল তা আমরা করতে চাইনি। এখনকার দুষ্টলোক, ভিলেনদের শায়েস্তা করতে গিয়ে যতটুকু বাস্তবতার দরকার ঠিক সেই অনুপাতে ভায়োলেন্স এসেছে। কৈলাসে কেলেঙ্কারি দেখার পর অনেকেই অভিযোগ করেছেন এ ছবিতে ফেলুদা তার বিখ্যাত মগজাস্ত্রকে ব্যবহার করার বদলে অ্যাকশনই বেশি করেছে। দর্শকদের এ সমালোচনা আমরা গ্রহণ করেছি। আগামী ছবিতে অর্থাৎ টিনটোরেটোর যিশুতে কিন্তু ফেলুদা তার মগজাস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করবে। দর্শকদের সমালোচনা মাথা পেতে নিয়েও বলি কৈলাসে কেলেঙ্কারি গল্পটাই কিন্তু এরকম যে ফেলুদা ক্রমাগত তার দুশমনকে তাড়া করে যাচ্ছে। এখানে মগজাস্ত্রের ব্যবহার স্বভাবতই কম। আবার টিনটোরেটোর যিশুতে রহস্যের জাল অনেক বিস্তৃত, সে রহস্যের জট ছাড়াতে ফেলুদাকে যেমন হংকং-এ ছুটতে হচ্ছে, তেমনি মগজাস্ত্রকেও ব্যবহার করতে হচ্ছে। যদি প্রশ্ন আসে এ রকম পরিবর্তন কি শুধুই সময়কে ধরতে করা হল, আমার উত্তর—অবশ্যই তাই, কারণ বড় পর্দার ছবিতে হু ডান ইট ফরম্যাট ঠিক চলে না। এটা টেলিভিশনে চলতে পারে। কারণ সেখানে একবারই দেখানো হয়। অন্যদিকে বড় পর্দায় ছবি চললে সেখানে এই হু ডান ইট ফরম্যাট রাখলে একই দর্শক কিন্তু দ্বিতীয়বার ছবি দেখতে আসবে না অর্থাৎ রিপিট সেল পাওয়া যাবে না। কারণ গোয়েন্দা ছবির শেষে তার ডিটেকশন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে বলে দিচ্ছে এটা প্রথমবার দেখলে যতটা ভালোই লাগুক, তারপরে কিন্তু আর দেখতে ইচ্ছে করে না। তাই বড় পর্দায় আমার মতে অপরাধী অপরাধ করছে সেটা আগে দেখিয়ে দিয়ে তারপর গোয়েন্দা কীভাবে তাকে পাকড়াও করল সেটা দেখানো হলেই সবচেয়ে ভালো হয়। সৌমিত্রকাকুর অভিনীত ফেলুদা যতটা বাঙালি বেণুর অভিনীত ফেলুদাও কিন্তু ততটাই বাঙালি। কৈলাসে কেলেঙ্কারি ছবির কলকাতা পর্বে ফেলুকে কিন্তু বাঙালি পোশাকেই দেখা গেছে। ফলে আমার মনে হয় না বেণুর অভিনীত ফেলুদা কোনও অংশে সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি করা ফেলুদার চেয়ে আলাদা। হ্যাঁ এরকম হয়েছে যে কিছু বিষয় যেটা হয়তো ফেলুদার নির্দিষ্ট গল্পটিতে নেই অথচ ফেলুদার অন্য গল্পে আছে সেরকম টুকরো টুকরো উপাদান আমরা একত্রিত করে ছবিতে রেখেছি। যেমন কৈলাসে কেলেঙ্কারি গল্পে লালমোহনবাবুর গাড়ি ছিল না, ট্যাক্সির কথা বলা ছিল, ছবিতে কিন্তু আমরা লালমোহনবাবুর নিজস্ব সবুজ গাড়ি দেখিয়েছি। ফেলুদার অনেক গল্পে ফেলুদাকে অ্যাকশন করতে দেখা গেছে তাই এটা প্রতিষ্ঠিত যে শারীরিক সক্ষমতায় ফেলুদা পিছিয়ে নেই, ফলে এটা আমরা ছবিতে দেখিয়েছি।

আর শেষ পর্যন্ত যা বলার তা হল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আর সব্যসাচী চক্রবর্তীর অভিনয়ের তুলনা করা যায় না।

অনুলিখন: স্বস্তিনাথ শাস্ত্রী

ফেলুদা চরিত্রকে নিজের মতো করে তৈরি করে নিয়েছেন সব্যসাচী

অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

মূল প্রসঙ্গে যাবার আগে একটা গল্প শোনাই। আমি যখন সিনেমা জগতে আসি আমার দাদা (সাহিত্যিক বনফুল) বলেছিলেন, যাই করিস তুই শিশির ভাদুড়ির থিয়েটারটা দেখতে ভুলিস না। দাদার কথা মতো শ্রীরঙ্গমে প্রতি শনিবার শিশিরবাবুর চন্দ্রগুপ্ত নাটক দেখতাম। পরে পরিচয় হলে উনি আমাকে ফ্রি পাসের ব্যবস্থা করে দেন। যাইহোক রবিবার সকালে চলে যেতাম কৈলাস বসু স্ট্রিটে পরিমল গোস্বামীর বাড়িতে। ওঁর বাড়ির লাইব্রেরির প্রতি অনেকের আগ্রহ ছিল। আমি যেতাম বিদেশি সাহিত্যের লোভে। আর শিশিরবাবুও আসতেন বই নিতে।

একদিন দেখা হয়ে গেল। শিশিরবাবু বললেন, 'গতকাল শো দেখেছ নাকি?' বললাম, দারুণ হয়েছে। যতবার দেখি মুগ্ধ হই। হঠাৎ গম্ভীর হয়ে শিশিরবাবু বলে উঠলেন, 'তুমি তো দানীবাবুর চন্দ্রগুপ্ত দেখনি! আমি তাঁর পঁচিশ পারসেন্ট পারিনি।' আমি তো হতবাক। শিশির ভাদুড়ি একথা বলছেন!

এরপর শিশিরবাবু বলতে লাগলেন,'আমাদের তখন চন্দ্রগুপ্ত নাটকটির পঞ্চাশতম রজনী অভিনীত হতে চলেছে। সাধ হল এই বিশেষ শোয়ে দানীবাবুকে আনা হবে। আমি নেমতন্ন করতে গেলাম। উনি তখন রংমহলে বিকেলের দিকে স্টেজে বসে রিহার্সাল দেখতেন। আমি গিয়ে তাঁকে বললাম কী জন্য এসেছি। এও বললাম আপনার নাটকের কিছু অংশ আমি আমার নাটকে বাদ দিয়েছি। কারণ মনে হয়েছে ওটা বাড়াবাড়ি গোছের। চন্দ্রগুপ্তর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ শুধুমাত্র নিজের মেয়ের জন্য আবেগপ্রবণ হবে!

দানীবাবু হাসি মুখে আমার কথা শুনলেন। বললেন—না

ভাই আমি বুড়ো হয়েছি। এখন আর কোথাও যাই না। আমি হতাশ হয়ে আবার অনুরোধ করলাম। কিন্তু দানীবাবু কিছুতেই রাজি হলেন না। ফাঁকা হলের মধ্যে সিটের পাশ কাটিয়ে চলে আসছি। যেই বেরবো পেছন থেকে দানীবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—শিশিরবাবু আমি আপনার শো দেখতে যাব। আমি যেমন অবাক তেমন পুলকিত। আনন্দে ছুটে তাঁর কাছে এসে বললাম— আমি কিন্তু গাড়ি পাঠাবো। দানীবাবু বলতে লাগলেন— শিশিরবাবু, আমি যাব এটা বলাতে আপনি নিজেকে ভুলে পড়িমরি করে বেসামাল হয়ে ধাক্কা খেতে খেতে ছুটে এলেন। আর পনের বছর নিখোঁজ মেয়েকে ফিরে পেয়ে একজন পিতা, কৌটিল্য কি আবেগপ্রবণ হতে পারেন না! আমার দৃষ্টি খুলে গেল। বললাম—মাফ করবেন। আমি আপনার যে অংশটি বাদ দিয়েছিলাম সেটা আবার যুক্ত করব'।

একই চরিত্র 'চন্দ্রগুপ্ত'। দুজন দিকপাল আর্টিস্ট সেই চরিত্রে অভিনয় করেছেন। এতে দুরকম ইমেজ তৈরি হয়েছে। তাঁরা তাঁদের মতো করেই অভিনয় করেছেন। পরের ব্যাপারটা দর্শকের হাতে।

বাংলা সিনেমায় এরকম বহু ঘটনাই ঘটেছে। স্টেজে অহীন্দ্র চৌধুরির 'শাজাহান' দারুণ হিট হয়। সিনেমায় সেই একই রোল করে শিশির ভাদুড়ি সাফল্য পাননি। স্টেজে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রিয়বান্ধবী'তে যতটা খ্যাতি পেয়েছিলেন ছবিতে উত্তমকুমার তার ধারে কাছে যেতে পারেন নি। 'দুইপুরুষ' সিনেমায় ছবি বিশ্বাসের নুটুবিহারী যতটা দর্শকের মনে জায়গা পেয়েছিল ততটা পাননি উত্তমকুমার।

স্থানকাল বিশেষে এরকম ঘটনা প্রচুর ঘটে। কিন্তু সাফল্য নির্ভর করে কাকে দর্শক নিয়েছেন। ফেলুদা চরিত্রের প্রসঙ্গেও এ কথা খাটে। বিশ্ব চলচ্চিত্রের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ফ্র্যাঙ্ক কাপরা বলেছিলেন একধরনের অভিনেতা আছেন যাঁরা স্টেট অ্যাকটিং করে যান। আর এক ধরনের শিল্পী আছেন যাঁরা নরম্যাল অ্যাকটিংয়ে সিদ্ধহস্ত। ফ্র্যাঙ্ক কাপরা আর এক ধরনের অভিনেতার কথা বলেছিলেন যাঁরা চলতিধারার বাইরে অন্যরকম অভিনয় করেন। আমরা ফেলুদার ক্ষেত্রে এই অন্যরকম অভিনেতাদেরই দেখতে পেয়েছি। যাঁরা আমাদের অনন্য সাধারণ অভিজ্ঞতার সামনে দাঁড় করিয়ে দেন।

আমরা এ পর্যন্ত তিনজন ফেলুদাকে পেয়েছি। 'সোনার কেল্লা'-য় প্রথম দেখলাম ফেলুদাকে। চরিত্রাভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এই সময়ের সেরা পুরুষ অভিনেতা। ওঁর বুদ্ধিদীপ্ত চেহারাটাকে দারুণভাবে কাজে লাগালেন মানিকবাবু। সাহিত্যে বা পুরনোদিনের ছবিতে বাঙালি গোয়েন্দাদের সম্পর্কেযে ধারণাটা ছিল মানিকবাবুর ফেলুদা হাজির হল অন্য স্বাদ নিয়ে। 'সোনার কেল্লার' পর 'জয় বাবা ফেলুনাথ'। সৌমিত্র এমন ভাবে ওই চরিত্রটিকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বলতেই লোকে ফেলুদা বুঝত। আসল কথা হল অভিনয়। উনি অভিনয় শিখে ছিলেন শিশির ভাদুড়ির কাছে। নানারকম চরিত্র প্রচুর করেছেন। ঝিন্দের বন্দী-তে ওঁর অভিনীত ময়ূরবাহন তো খলচরিত্র। বসন্ত বিলাপ-এ কমিক রোল। আর অপুর চরিত্র তো আছেই।

প্রসঙ্গত বলি গোয়েন্দার আচরণে একটা ভাবনাচিন্তার রেশ

সবময়ে চোরাস্রোতের মতো বইতে থাকে। সাহিত্যে সেই রেশটা ততটা ধরা না গেলেও সিনেমায় ফেলুদার চরিত্রে সৌমিত্র তা পরিষ্কার করে দেখিয়েছেন। মনে করুন সেই দৃশ্যটার কথা। জয়পুরের ওয়েটিংরুমে ফেলুদার বিছানায় মন্দার বোস (কানু মুখোপাধ্যায়) কাঁকড়া বিছে ফেলার পর সৌমিত্রর অভিনয়। গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে মাথায় মাফলার বেঁধে ঘরের একদিক থেকে আর এক দিকে হাঁটছেন আর নিচু গলায় ধীরে ধীরে সংলাপ বলছেন। যা বলছেন সেসবই বিভিন্ন ঘটনার সূত্র যা রহস্যে জট ছাড়াতে সাহায্য করে। বস্তুত এই দৃশ্যই ছবির ক্লাইমেক্স পয়েন্ট। এখান থেকেই ফেলুদার প্রকৃত অভিযান শুরু হয়। এ এক অনবদ্য সিকোয়েন্স। অতুলনীয় মানিকবাবু। 'জয়বাবা ফেলুনাথ'-য়ে ঘোষালবাড়ির চিলেকোঠায় রুকুর সঙ্গে ফেলুদার ছড়া বিনিময়, যার জেরে রুকু ফেলুদাকে বলে ফেলে অ্যান্টিক গণেশটি আছে আফ্রিকার রাজার কাছে। অর্থাৎ দুর্গা ঠাকুরের সিংহের মুখে! আরও একটা ব্যাপার বিশেষভাবে মাথায় রাখতে হবে যে সৌমিত্রর ফেলুদার ভীষণ ভাবে বাঙালিয়ানায় ভরপুর। এতটাই যে বাংলার মধ্যবিত্ত দর্শক এই চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে পারে।

আশির দশকে আর এক ফেলুদাকে দেখলাম হিন্দিতে। দুরদর্শনের ন্যাশনাল নেটওয়ার্কে—'সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস' শিরোনামে। টিভির কাজ হলেও সেই ফেলুদা হয়েছিলেন শশীকাপুর। সত্যি বলতে কি তিনি বাঙালি দর্শকের মন ততটা ভরাতে পারেন নি। হিন্দি ভাষাভাষী দর্শকের কাছে ফেলুদা ততটা জনপ্রিয় নয়। প্রদোষ মিত্তির তাই শশী কাপুরের লিপে বারবার উচ্চারিত হয়েছে প্রদোষ মিটার নামে।

বড় পর্দায় সন্দীপ রায় নিয়ে এলেন নতুন ফেলুদা সব্যসাচী চক্রবর্তীকে। ইনিও মঞ্চ থেকে এলেন টিভি সিরিয়াল 'তেরো পার্বণ'-এ গোরা হয়ে। সব্যসাচীর দারুণ কণ্ঠ। চেহারাও ভালো। 'শ্বেত পাথরের থালা' ছবিতে অপর্ণা সেনের মতো প্রথম শ্রেণির একজন অভিনেত্রীর সঙ্গে যেভাবে পাল্লা দিয়ে সব্যসাচী অভিনয় করেন যে তাঁকে বাহবা না দিয়ে পারা যায় না।

এইবার সব্যসাচীর ফেলুদা দেখলাম 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'-তে। এই ফেলুদা কিছুটা অন্যরকম। ইনি অ্যাকশনে পেশ পটু। বুদ্ধির সঙ্গে তাঁর ক্ষিপ্র গতিবিধি। প্রতিপক্ষের সঙ্গে যে ভাবে কথা বলেন তা বেশ চমকপ্রদ। তারপর বয়েস বেশ কম হওয়ায় সহজেই গল্পের সঙ্গে মানানসই হয়ে গেলেন।

অতি সম্প্রতি 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি'-তে সব্যসাচী আরও বেশি পরিণত। আগের ত্রুটিগুলোকে দারুণ ভাবে ম্যানেজ করেছেন। এবং আরও বেশি স্মার্ট। ওঁর বিশেষত্ব যে সৌমিত্রকে অনুসরণ না করে সেই ইমেজকে এড়িয়ে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা। তা তিনি পেরেছেন।

সব্যসাচীর পাশাপাশি একই সঙ্গে অভিনন্দন জানাতে হয় সন্দীপ রায়কেও। আরও একটা ব্যাপার, সৌমিত্র যে সময়ে ফেলুদা করেন তখন যে ধরনের দর্শক ছিলেন আজ কিন্তু তাঁরা নেই। আজকের দর্শকও নতুন। চারপাশের প্রেক্ষাপটও অনেকটা বদলে গেছে। আর সিনেমা টেকনিক্যালি অনেকটাই উন্নত। আগে যা সাধ্যাতীত মনে হত আজ তা আয়াসসাধ্য। সেই নিরিখে বলা চলে 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'-তে সব্যসাচী প্রথম ফেলুদা চরিত্রে রূপদান করেছেন নিজের মতো করে। কৈলাসে-ও তিনি সফল। তবে তাঁর মধ্যে ততটা প্রকাশ নেই গোয়েন্দার সহজাত অনুসন্ধিৎসা, ব্যগ্রতা। তিনি আধুনিক। তিনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতাকে হয়তো টপকাতে পারেন নি, কিন্তু অভিনয় দিয়ে ফেলুদাকে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতে হয়। ফেলুদা—এই চরিত্রকে নিয়ে নিজের মতো করে একটি স্টাইল তৈরি করেছেন সব্যসাচী। এটাই তো বড় সাফল্য। আর বলব সাহস আছে সন্দীপ রায়েরও। আসলে বাঙালি দর্শক চিরকাল ফেলুদার ভক্ত। যেকোনও চরিত্রে প্রথম যাঁর অভিনয় দেখি তাঁর প্রভাব থাকে প্রচণ্ড। সেই চরিত্রে দ্বিতীয় বা তৃতীয় অভিনেতা চট করে গ্রহণযোগ্য হন না। সেই ধারণাকে ভাঙতে হয় নিজের যোগ্যতা দিয়ে। আর আমার নিজের মনে হয় মানিকবাবুর এই অমরকীর্তি

ফেলুদার আসল অস্তিত্ব সাহিত্যে। কারণ সময়ের কারণে হয়তো আগামী বিশ বছর পরে ফেলুদার চরিত্রাভিনেতা বদলে যাবেন। যেমন শার্লক হোমস কিংবা জেমস বণ্ডের ক্ষেত্রে হয়েছে। প্রসঙ্গত একটা কথা স্পষ্ট বলব ফেলুদার রিপ্লেসমেন্ট যথার্থ হলেও জটায়ুর অভাবপূরণ হয়নি।

বেণু ভালো অভিনেতা কিন্তু ফেলুদার চরিত্রে তত মানানসই নয়

হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়

এটা ভারী কঠিন একটা কাজ, ফেলুদার চরিত্রে সৌমিত্র আর সব্যসাচীর তুলনা করতে হবে। আমার অভিনয় জীবন শুরু পেশাদারি নাট্যমঞ্চে অহীন্দ্র চৌধুরির পরিচালনায়। তা নাট্যজগতের মূল্যবোধ বলে, সহঅভিনেতা বা অভিনেত্রীর কাজের সমালোচনা করা চলে না। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা বলি, বিজয়া নাটকে শিশিরবাবু যেমন রাসবিহারীর চরিত্র করেছিলেন অহীনবাবুও তেমনি রাসবিহারী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। কিন্তু তফাতটা হয়ে যাচ্ছিল অহীনবাবুর অভিনয়ে রাসবিহারী যে খারাপ লোক সেটা বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠছিল। শিশিরবাবু এই কথাটা কিন্তু সরাসরি অহীনবাবুকে বললেন না, তিনি অহীনবাবুকে ডেকে বললেন, যে বিজয়া বেথুনে পড়া মেয়ে সে কি রাসবিহারীর স্বরূপ ধরে ফেলতে পারবে না? এছাড়া আমি অভিনেতা হিসেবেও তেমন খ্যাতিমান কেউকেটা নই, নিতান্তই ছোটখাট মাপের, যাকে বলে স্মল ফ্রাই। তাই এরকম একটা তুলনামূলক আলোচনা করাটা আমার পক্ষে যথেষ্ট বিড়ম্বনার।

আমি একজন সাধারণ দর্শক হিসেবে বড়জোর আমার মতামত দিতে পারি, তাও তা হয়তো হবে নিতান্ত ভুলে ভরা ত্রুটিপূর্ণ এবং অযোগ্য। মানিকদার (সত্যজিৎ রায়) সঙ্গে আমার প্রথম কাজ মহানগর ছবিতে, তারপর একে একে মানিকদার বহু ছবিতে আমি কাজ করেছি, মানিকদার করা ফেলুদা সিরিজের সোনার কেল্লা আর জয় বাবা ফেলুনাথ দুটো ছবিতেই অভিনয় করেছি। পরে বাবুর (সন্দীপ রায়) তৈরি ফেলুদা সিরিজের বাক্স রহস্য এবং কৈলাসে কেলেঙ্কারিতে কাজ করেছি। মানিকদা ছিলেন একজন সম্পূর্ণ মানুষ। যেমন অন্তহীন জ্ঞান, তেমনি তাঁর অভিজ্ঞতা। এক মহাস্রষ্টা ছিলেন উনি। এই লোকটার কাজ আমি বার বার ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। ভুল তো রবীন্দ্রনাথও কিছু করেছেন। মানিকদার জীবনে সেরকম দু একটি ভুল ছাড়া আর কোনও খুঁত খুঁজে পাইনি। ওই ৬ ফুট ৪ ইঞ্চি লোকটার কাস্টিং ছিল নিখুঁত, কোনও আপস তিনি করতেন না এই বিষয়ে। একটা চরিত্র উপযোগী চেহারা পেলে পরিচালকের এবং ওই চরিত্রে অভিনেতার শতকরা ৬০ ভাগ কাজ হয়ে যায়। আর বাকি ৪০ ভাগ কাজ অভিনয়, ক্যামেরা, মেকাপ করে দেয়। সত্যজিৎ রায় সৃষ্ট ফেলুদার চরিত্রে যে টিপিকাল

বাঙালিয়ানা ছিল তা পুরোপুরি উপস্থিত সৌমিত্রর চেহারা ছবিতে। ফেলুদার ব্যায়াম করা চেহারা কিন্তু কাঠখোট্টা গোছের নয়, একটা নরমসরম ব্যাপার রয়েছে তার মধ্যে, সৌমিত্র ঠিক সেরকম। ফেলুদা বুদ্ধিমান, কথা কম বলে, অন্যকে বলতে দেয় বেশি, তীক্ষ্ণ ইন্টেলিজেন্ট লুক—এই সব বৈশিষ্ট্যগুলো মানিকদার পরিচালনা, সৌমিত্রর চেহারা আর অভিনয়ে সার্থকভাবে ফুটে বেরিয়েছে। সোনার কেল্লা এবং জয় বাবা ফেলুনাথ ছবিতে সৌমিত্রর মুখের ক্লোজআপে ফেলুদার বুদ্ধিদীপ্ত চাউনি দারুণ ফুটে উঠেছে। শুধু আমার কল্পনায় বার বার মনে হয় ফেলুদার গলা হবে ভরাট এবং গম্ভীর। উত্তমবাবুকে ফেলুদার ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখলে আমার ভালো লাগত না, কারণ ওঁর বাচনভঙ্গি, চলাফেরা কিছুই ফেলুদাসুলভ নয়, শুধু ওই দানাদার গলাটা—ওইটা ফেলুদার সঙ্গে বেশ মানানসই হত। মানিকদা যে সময়ে ফেলুদার ছবি বানিয়েছেন তখন সৌমিত্রর কোনও বিকল্প ছিল বলে আমার মনে হয় না, কারণ থাকলে মানিকদা ঠিকই তাকে খুঁজে বার করতেন। কাস্টিঙের ব্যাপারে আপস করা তাঁর ধাতে ছিল না। একটা ঘটনা বলি, জয় বাবা ফেলুনাথ ছবিতে আমার বাবার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য একজন অভিনেতা দরকার যাঁর কোনও সংলাপ নেই, তিনি শুধু আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসে থাকবেন এবং তাঁর চেহারা ছবি আমার সঙ্গে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হবে, কারণ তিনি আমার বাবার চরিত্র করছেন। এরকম একজন মানুষকে খুঁজে বার করার দায়িত্ব শেষ অবধি আমার কাঁধেই মানিকদা দিলেন আর আমি আমার বড়মামাকে নিয়ে এলাম, কারণ আমার এবং ওঁর চেহারা মুখশ্রী প্রায় একই রকম।

বাবুর পরিচালনায় আমি বেণুর (সব্যসাচী চক্রবর্তী) সঙ্গে কাজ করেছি বাক্স রহস্য আর কৈলাসে কেলেঙ্কারিতে। কৈলাসে কেলেঙ্কারি হলে দেখতে গিয়ে প্রথমে সিটে হেলান দিয়ে বসে ছিলাম কিন্তু খানিকক্ষণ বাদেই শিড়দাঁড়া সোজা করে বসতে হল এবং ছবি শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি আর আয়েস করে বসতে পারিনি। বাবুর পরিচালনার এমনই গুণ। ও ছবিটাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে বানিয়েছে। ফেলুদা হিসেবে বেণুও ইতিমধ্যে দর্শকমহলে সমাদৃত, বলা যেতে পারে ওয়েল অ্যাকসেপ্টেড, কৈলাসে কেলেঙ্কারি চলছেও ভালো। কিন্তু ফেলুদার কাহিনি আমি যতটুকু পড়েছি তাতে ফেলুদার যে ছবি আমার মনে গেঁথে আছে তাতে একটা ফারাক, কোথাও একটা খামতি আমি পাচ্ছি। আমার এই বিশ্লেষণ হয়তো ভুল, হয়তো আমার দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক নয়, তবু বলি, মূল যে ফারাকটা আমার চোখে পড়ছে তা হল বয়স, বয়সটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। ফেলুদা অতটা লম্বা। চেহারার কাঠিন্য, চাপা গাল, মুখময় দাগ—এসবই ফেলুদার চরিত্রের পরিপন্থী, বিশেষ করে বয়সটা। চেহারার ওপর মানুষের কোনও হাত নেই। আমার এই চেহারায় ফেলুদা কোনও দিন মানাত না, আবার আমাকে যদি দুর্ভিক্ষপীড়িত গ্রামের এক পূজারি বামুনের চরিত্রে কাস্ট করা হয় সেটাও বেঠিক হবে, আমি ৫ কোটি টাকা পেলেও ওই চরিত্রগুলো করব না। এই আলোচনাটা করতে গিয়ে বার বার আমার মানিকদার কাস্টিং-এর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, পথের পাঁচালিতে গ্রামবধূর ভূমিকায় উনি কাস্ট করলেন কাকে? না এক শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা করুণাদিকে। অথচ ঠিক লেগে গেল, এমনকী গ্রামবধূর ঘোমটা গোছানোর কায়দাটাও করুণাদিকে দিয়ে ঠিক ঠিক হল, কখনও মনে হয়নি যে, উনি একজন শহুরে মহিলা। ফেলুদার লুক এবং অ্যাপিয়ারেন্সের কথা উঠলে সৌমিত্র ১০০-তে ৯৭ পাবে। সন্তোষ দত্ত মারা যাওয়ার পর আমি মানিকদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মানিকদা, ফেলুদাকে নিয়ে আর ছবি করবেন না? উনি অননুকরণীয় ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছিলেন, লালমোহনবাবু কোথায় পাব? অভিনয়ের দিক থেকে বেণু মোটামুটি ঠিক আছে, কল্পনাতে খুব তফাত নেই। আমি মাঝে মাঝে কল্পনা করি যে মানিকদা, বাবু, পুলু (সৌমিত্র), বেণু কেউ নেই এমন একটা পরিস্থিতিতে আমার ওপর দায়িত্ব পড়েছে ফেলুদার চরিত্রে একজন অভিনেতাকে বাছাই করার, এটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক একটা পরিস্থিতি। কে হতে পারে ফেলুদা? একটা নাম হাতের কাছেই মজুত আছে, তবে তাকে দু'মাস সময় দিতে হবে খাদ্যপানীয়ের পরিমাণ কমিয়ে শরীরটাকে একটু ঝরিয়ে আসার। ভাবছেন তো সে কে? শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা, ভালো অভিনেতা। আজকাল তো একটা আলোচনা খুবই চলছে যে পরবর্তী ফেলুদা কে? আজকাল বহু ছেলে অভিনয় করতে আসছে, সিরিয়াল করছে, তার মধ্যে একটি ছেলে ঋষি চক্রবর্তী, ও চলতে পারে। এছাড়া গ্রুপ থিয়েটারেও বহু ছেলে অভিনয় করছে, তাদের মধ্য থেকে নিশ্চয় কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে।

যাইহোক সবশেষে আবার বলি, আমার এ আলোচনা, চিন্তাভাবনা হয়তো ঠিক না, হয়তো ভুল। আমি কাউকে আঘাত করতে চাইনি, দয়া করে সংশ্লিষ্ট কেউ ভুল বুঝবেন না।

অনুলিখন: স্বস্তিনাথ শাস্ত্রী

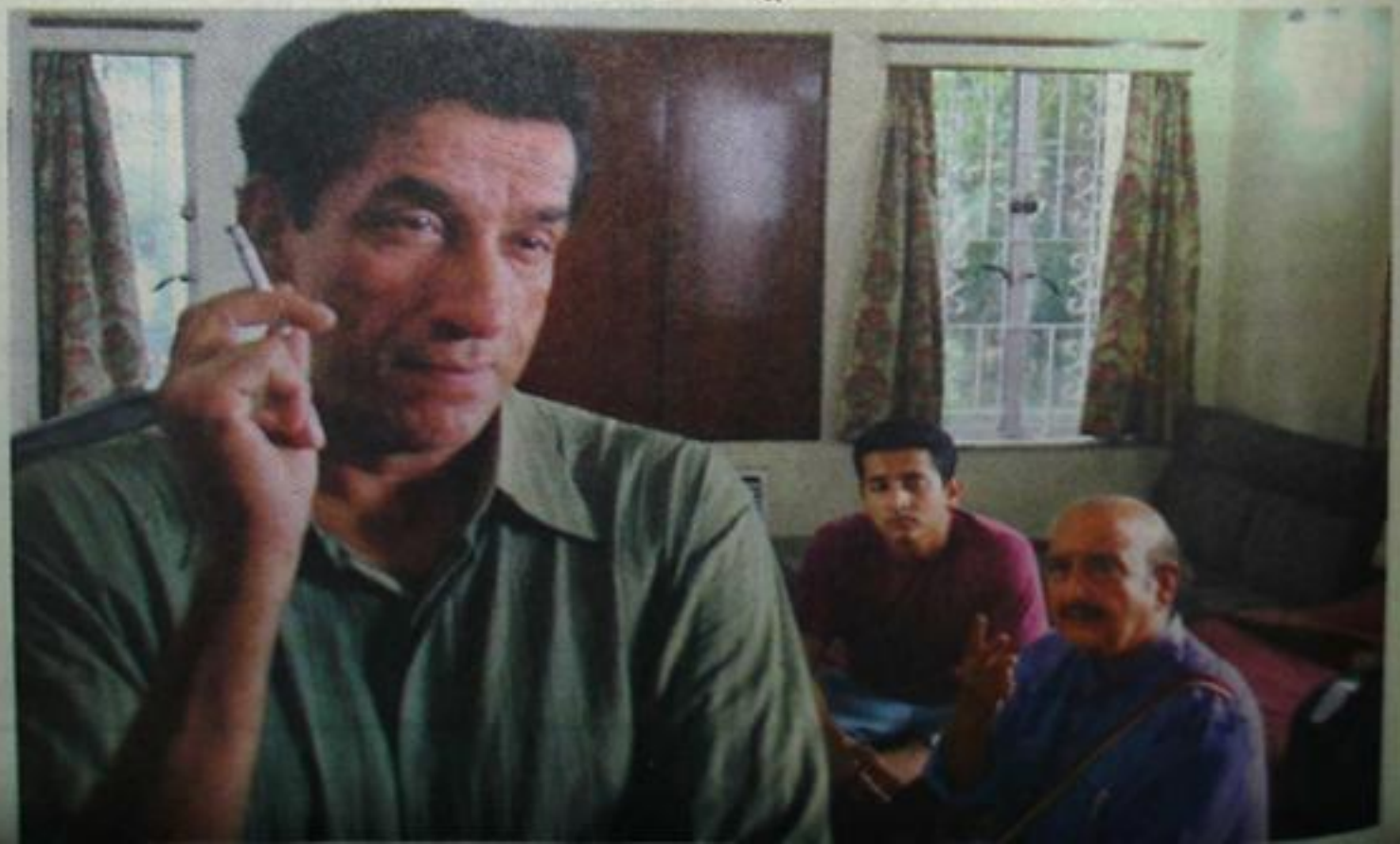

দুই ফেলুদা দুই ধরনের, দুজনকেই দর্শক ভালোবেসেছেন

বীরেশ চট্টোপাধ্যায়

সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টি প্রদোষ চন্দ্র মিত্র ওরফে ফেলুদা চরিত্রে ভারতবর্ষের বেশ কয়েকজন 'বাঘা' অভিনেতা অভিনয় করেছেন এবং এখনও করছেন। সত্যজিৎ বাবুর পরিচালনায় ফেলুদা চরিত্রে অভিনয় করেছেন আমাদের বাংলা ছবির রোমান্টিক নায়ক সুপুরুষ, বুদ্ধিদীপ্ত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এরপর শশী কাপুরকেও দেখা গেছে এই চরিত্রে€। এটি পরিচালনা করেছিলেন সন্দীপ রায়।

পরবর্তীকালে সন্দীপ রায়ের পরিচালনায় ছোট ও বড় পর্দায় ফেলুদা হিসেবে অভিনয় করেছেন ভারতবর্ষের আর এক বলিষ্ঠ চরিত্রাভিনেতা সব্যসাচী চক্রবর্তী। সম্প্রতি এই ফেলুদা সিরিজের একটি ছবি 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' ভীষণই জনপ্রিয় হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল কোন ফেলুদাকে দর্শকরা সবথেকে বেশি পছন্দ করেন? বা কোন ফেলুদা সেরা? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয়। কারণ দুই ফেলুদা অর্থাৎ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সব্যসাচী চক্রবর্তীর মধ্যে কোনও তুলনাই আনা উচিত নয়। কেননা দুজনে দুভাবে ফেলুদাকে পোট্রে করেছেন।

এই প্রসঙ্গে আরও কিছু কথা বলার প্রয়োজন আছে। এজন্য আমাদের অনেকগুলো বছর পিছিয়ে যেতে হবে। সত্যজিৎ বাবু সৌমিত্রদাকে কাস্ট করেই ফেলুদা সিরিজের ছবি তৈরির কাজ শুরু করেন। এবং সৌমিত্রদার করা ফেলুদা প্রথম থেকেই সবার মন কেড়ে নেয়। আসলে একজন গোয়েন্দার যে যে গুণ থাকা দরকার অর্থাৎ বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, উপস্থিত বুদ্ধি প্রভৃতি সবকিছুই ফেলুদার মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে ছিল। ফলে খুব সহজেই ফেলুদা ছোট-বড় সবার মন জয় করে নিতে পেরেছিল।

এই প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায়ের কীর্তির প্রসঙ্গ আসতেই পারে।

এই গোয়েন্দা অর্থাৎ কীর্তিটি কিন্তু দর্শকদের মনে ততটা জায়গা করে নিতে পারেনি। যে কাজটা ফেলুদা পরিপূর্ণ ভাবে পেরেছে। কীভাবে এটা সম্ভব হল? এ ব্যাপারে সত্যজিৎ বাবু ও সৌমিত্রদা দুজনেরই নাম করতে হবে। সত্যজিৎ রায় যেভাবে ফেলুদা চরিত্রটিকে এঁকেছিলেন ঠিক সেইভাবেই সৌমিত্রদা তাকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন বলেই ফেলুদা অত ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। আর এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিল তাঁর ভীষণরকমের বাঙালিয়ানা। এর ফলে ফেলুদা আমাদের আরও কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পেরেছিল। দর্শকরা এই ফেলুদাকে ঘরের মানুষ, কাছের মানুষ, মধ্যবিত্ত মানুষ বলে মনে করতে শুরু করেন। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন ফেলুদা অন্য আর পাঁচজন গোয়েন্দার মতো অহেতুক জটিলতা পছন্দ করেন না।

সত্যজিৎ রায় ফেলুদা হিসেবে যখন সৌমিত্রদাকে নির্বাচন করেন সেইসময় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় রোমান্টিক নায়ক হিসেবে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছেন। ভয়ঙ্কররকমের প্রতিষ্ঠিত নায়ক। সেইঅবস্থায় তাঁকে আমরা একদম ভিন্নধর্মী চরিত্রে পেলাম, এবং তিনিও তাঁর পরিপূর্ণ বাঙালিয়ানা, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা ও সেন্স অফ হিউমার দিয়ে ফেলুদাকে ফুটিয়ে তুললেন। ফলে শুধু শিশুরা নয় পরিবারের সবার মনে জায়গা করে নিতে পেরেছিল সৌমিত্রদার ফেলুদা।

এরপর আমরা বেশ কিছুদিন বাদে সব্যসাচী চক্রবর্তীকে ফেলুদা হিসেবে পেলাম। সব্যসাচীও খুব বড় মাপের অভিনেতা। শুধু বাংলা নয় ভারতীয় ছবির জগতের এক উল্লেখযোগ্য অভিনেতা। তবে তিনি রোমান্টিক নায়ক নন একজন বড়মাপের চরিত্রাভিনেতা হিসেবেই খ্যাত। ভারতের বহু নামী পরিচালক তাঁকে বহুবার তাঁদের ছবিতে নিয়েছেন এবং তিনিও সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। শুধু তাই নয় প্রতিটি ছবিতে দর্শকরা তাঁকে নতুন ভাবে পেয়েছেন।

সৌমিত্রদার মতো রোমান্টিক নায়কের গ্ল্যামার সব্যসাচীর মধ্যে সত্যিই নেই তিনি সেই অ্যাডভানটেজও পাননি। কিন্তু সফল চরিত্রাভিনেতা হিসেবে তিনি দর্শকদের মনে জায়গা করে নিতে পেরেছেন। তবে একথা ঠিক শুধু গ্ল্যামার দিয়ে তো বেশীদিন টিকে থাকা যায়না। উত্তমদা, সৌমিত্রদা বা তার পরবর্তীসময়ে বেশ কয়েকজন অভিনেতাকে দেখেছি যাঁরা গ্ল্যামারাস হিরো হিসেবে বেশ কিছুদিন কয়েকটা ছবিতে কাজ করেছেন। তারপর তাঁদের গ্ল্যামার আর তাঁদের সাহায্য করেনি। কারণ তাঁরা কেউই সম্পূর্ণ অভিনেতা ছিলেন না। কিন্তু সৌমিত্রদা ও সব্যসাচী হলেন সম্পূর্ণ অভিনেতা। বাড়তি হিসেবে সৌমিত্রদার ছিল গ্ল্যামার ও ক্যারিশমা।

আগেই বলেছি সব্যসাচী চক্রবর্তী গ্ল্যামারাস, রোমান্টিক হিরো নন। তিনি হলেন একজন ডাকসাইটে চরিত্রাভিনেতা। সেই সব্যসাচীকে সৌমিত্রদার পর কাস্ট করা হল ফেলুদার চরিত্রে। যেহেতু তিনি একজন সুঅভিনেতা তাই তিনিও তাঁর মতো করে চুটিয়ে এই চরিত্রে অভিনয় করলেন। তিনিও তো কখনই হেরে যেতে চাইবেন না। তিনি জানতেন তুলনা ব্যাপারটা আসবেই। তবে আমার মনে হয় দুজনের মধ্যে কখনই তুলনা করা উচিত নয়। কারণ দুজনে দুভাবে ফেলুদাকে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

কিন্তু কেন তুলনা করা উচিত নয় এ ব্যাপারে আমি পরে আলোচনা করব। তার আগে সব্যসাচী সম্পর্কে আরও কিছু কথা বলার প্রয়োজন আছে। আমরা জানি সব্যসাচীকে সহজে হার মানানো যায় না। যে কোনও কঠিন চরিত্রের মধ্যে তিনি অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারেন। ফলে ফেলুদাকে তিনি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়ে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। এবং তিনি যে সফল তার বড় প্রমাণ ফেলুদা সিরিজের সাম্প্রতিক ছবি' কৈলাসে কেলেঙ্কারি'।

এইবার দুই ফেলুদার মধ্যে কেন তুলনা করা উচিত নয় সেই প্রসঙ্গে আসছি। প্রথমে সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা। নামভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এই ফেলুদার মধ্যে আমরা আসর জমানো একটা মানুষকে খুঁজে পাই। তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বাঙালিয়ানা ও সেন্স অফ হিউমার রয়েছে। এর পাশাপাশি তিনি হলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন স্মার্ট মানুষ। স্ট্রং কমনসেন্স তাঁর অন্যতম এক হাতিয়ার। তিনি প্রতিপক্ষকে অত্যন্ত শান্ত ভাবে মগজ দিয়ে কাবু করেন। অহেতুক মারদাঙ্গা তিনি পছন্দ করেন না।

আমার মনে হয় সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার মধ্যে বাঙালিয়ানা ব্যাপারটা ভীষণভাবে রয়েছে। যেটা সন্দীপ রায়ের ফেলুদার মধ্যে তেমনভাবে নেই। বর্তমান ফেলুদা ভীষণ বুদ্ধিদীপ্ত, তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন স্ট্রং কমনসেন্সের অধিকারী। কাজ নিয়ে তিনি সবসময় মগ্ন হয়ে থাকেন। এফিসিয়েন্ট, ভীষণ স্মার্ট কিন্তু কম কথা বলেন, আড্ডা মারেন না এবং হাসি ঠাট্টা কম করেন। ফলে এই ফেলুদাকে দর্শকরা সম্মান করেন, সমীহ করেন। ফলে সৌমিত্রদার ফেলুদার মতো সব্যসাচীর ফেলুদা দর্শকদের ততটা কাছের মানুষ হয়ে উঠতে পারেন নি বলেই মনে হয়।

সৌমিত্রদার ফেলুদার সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছিল তাঁর লালিত্যময়, আসরজমানো ভাবমূর্তি। আর সব্যসাচীর ফেলুদা স্মার্ট, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, কাজ পাগল চাবুকের মতো চেহারার অসাধারণ এক মানুষ। ফলে দুই ফেলুদা দুই ধরনের মানুষ হলেও দুজনকেই দর্শকরা দুভাবে ভালোবেসেছেন।

আমার মনে হয় সন্দীপ রায় দুজনের মধ্যে একটা তফাৎ তৈরি করার জন্যই বর্তমান ফেলুদাকে এইভাবে দর্শকদের সামনে উপস্থিত করেছেন।

অনুলিখনঃ অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

ফেলুদার সঙ্গে কাশীতে

সেবার অপু, এবার ফেলু। আজ থেকে বাইশ বছর আগে বেনারসে শুটিং করতে যাই অপরাজিত ছবির। তখন কাশীর অলিগলি ঘাট-মন্দির গরু-বাঁদর সাধু-সন্ন্যাসী সবই দেখানো হয়েছিল অপুর চোখ দিয়ে। এবারও সেই একই কাশী, কিন্তু ঘটনা একেবারে আলাদা। জয় বাবা ফেলুনাথ-এ কাশী হল রহস্যের পটভূমিকা। ফেলুদা সেখানে ছুটি ভোগ করতে এসে চুরি আর খুনের তদন্তে জড়িয়ে পড়ছে। কাজেই কাশীকে এবার দেখতে হবে অন্য চোখ দিয়ে।

কাশী যারা দেখেনি, এ শহরের মজা তাদের বলে বোঝানো ভারি শক্ত। গঙ্গার ঘাট কলকাতাতেও আছে, গলিও আছে শ্যামবাজারে, বাগবাজারে, বড়বাজারে। কিন্তু কাশীর মতো ঘাট আর গলি কাশী ছাড়া আর কোথাও নেই।

আগে ঘাটের কথাই বলি। দক্ষিণে অসিঘাট থেকে সুরু করে উত্তরে রাজঘাট পর্যন্ত কত ঘাট যে পর পর সাজানো রয়েছে কাশীর গঙ্গার ধারে তার কোনও হিসেব নেই। এই সব ঘাটের নামে, আর তার আশেপাশে প্রাসাদ আর বাড়িগুলোতে কাশীর বিচিত্র ইতিহাসের একটা চেহারা পাওয়া যায়। যেমন দক্ষিণপ্রান্তে হরিশচন্দ্র ঘাট। এটা হল কাশীর দুটো বড় শ্মশানের একটা। পুরাণের রাজা হরিশচন্দ্র কাশীতে তাঁর স্ত্রী ও ছেলে রোহিতকে এক ব্রাহ্মণের কাছে বিক্রী করে এক বছর এই শ্মশানে এক চণ্ডালের দাস হয়েছিলেন। হরিশচন্দ্রঘাটের কিছু পরেই তুলসীঘাট। ঘাটের উপরেই একটা বাড়িতে বসে তুলসীদাস তাঁর বিখ্যাত হিন্দি রামায়ণ লিখেছিলেন। তুলসীর উত্তরে শিবালা ঘাটের উপর রয়েছে রাজা চৈত সিং-এর প্রাসাদ। ওয়ারেন হেস্টিংস এই রাজাকে গ্রেপ্তার করতে এলে চৈত সিং তাঁর প্রাসাদের জানালা দিয়ে গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে

রেহাই পান।

চৈত সিং ছাড়াও আরও অনেক রাজা-রাজড়া তাঁদের প্রাসাদ ঘাটের উপর তৈরি করাতে এই সব ঘাটের নামকরণ রাজাদের নামেই হয়ে গেছে। মানসরোবর ঘাট অম্বরের রাজা মানসিংহের তৈরি, রাণাঘাট উদয়পুরের রাণার তৈরি, অহল্যাঘাট তৈরি করেছিলেন ইন্দোরের রানী অহল্যাবাই। মানমন্দির ঘাট যে কারণে প্রসিদ্ধ, সেই আড়াইশো বছরের পুরনো মানমন্দিরটি তৈরি করেছিলেন জয়পুর শহরের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ জয়সিংহ। এ ছাড়া দুটো বিখ্যাত ঘাটের নাম তোমরা সকলেই জান; এক হল মনিকর্ণিকা, যেখানে কাশীর আসল শ্মশান, আর আরেক হল দশাশ্বমেধ, যেখানে স্বয়ং ব্রহ্মা নাকি পর পর দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এই দশাশ্বমেধেই দেখা যায় কাশীর বিখ্যাত ছাতা। পাণ্ডারা যে তক্তপোষে বসে তারই উপর রাখা একটা পাথরের মাঝখানে একটা গর্তের ভিতর ছাতার বাঁটটা ঢুকিয়ে সেটাকে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ছাতাটাকে ইচ্ছামতো ঘুরিয়ে সারাটা দিনই ছায়ার ব্যবস্থা করা যায়। এই মার্কামারা বিশাল বাঁশের ছাতা আমি বেনারস ছাড়া আর কোথাও দেখিনি।

আর গলি? গলির সেরা হল অবিশ্যি বিশ্বনাথের গলি। চার হাত চওড়া এই গলি দশাশ্বমেধ রোড থেকে বেরিয়ে এঁকে বেঁকে উত্তরে চলে গেছে সোনার পাতে মোড়া চূড়োওয়ালা বিশ্বনাথের মন্দির পর্যন্ত। এই গলির দুদিকে সারবাঁধা দোকান, সেখানে রাজ্যের জিনিস পাওয়া যায়। তবে বেনারসের দুটি বিখ্যাত জিনিস মিঠাই আর কাঁসার বাসন পেতে হলে যেতে হবে অন্য গলিতে। রাবড়ি মালাই পাওয়া যাবে কচৌরি গলিতে আর কাঁসার জিনিস পাওয়া যাবে ঠঠেরি বাজারের গলিতে। একবার বিশ্বনাথের গলিতে ঢুকলে বড় রাস্তায় না বেরিয়েও শুধু গলিপথ দিয়েই এই সব অন্য গলিতে পৌঁছনো যায়। কাশীতে এমন অনেক গলি আছে যেখানে সারা বছরের কোনও সময়েই সূর্যের আলো পৌঁছয় না। অনেক ধনী লোকের হাভেলি বা অট্টালিকা এই সব অন্ধকার গলিতে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের গল্পের 'ভিলেন' মগনলাল মেঘরাজের বাড়িও খুঁজতে হবে এই রকম একটা অন্ধকার গলিতে। এই সব বাড়ির এক-একটা চার পাঁচতলা উঁচু। সব বাড়িরই মাঝখানে উঠোন, আর এই উঠোনের উপর দিকে চাইলে দেখা যাবে এক ফালি চৌকো আকাশ। এই আকাশটুকু আছে বলেই রক্ষে, নইলে এসব বাড়িতে অষ্টপ্রহর বাতি জ্বালিয়ে রাখতে হত।

কাশীতে দেড়লাখ বাঙালির মধ্যে বেশির ভাগই থাকে বাঙালিটোলার গলিতে। দশাশ্বমেধ রোডের উত্তরে হল বিশ্বনাথের গলি, আর দক্ষিণে হল বাঙালিটোলা। কাশীতে সব সময়ই এত বাংলা কথা শোনা যায়,

রাস্তার দেয়ালে আর দোকানের গায়ে এত বাংলা হরফ দেখা যায়, যে এক এক সময় মনে হয় বুঝি বাংলাদেশের কোনও শহরে এসে পড়েছি। একটা মজা এই যে এখানকার বাঙালির কথায় পশ্চিমা টান প্রায় নেই বললেই চলে— যদিও এখানে এমন অনেক বাঙালি পরিবার আছে যারা আট দশ পুরুষ ধরে কাশীতেই রয়েছে। চৌখাম্বার মিত্তিররা তো রয়েছেন প্রায় চারশো বছর ; অর্থাৎ সেই মোগল আমল থেকে। এই মিত্তিরদের বাড়ির দুর্গাপুজো এখানকার সবচেয়ে পুরনো পুজো। এদের দুর্গা লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক আর গণেশ আলাদা আলাদা ডুলিতে করে ঘাটে নিয়ে গিয়ে ভাসান দেওয়া হয়। বাড়ি হল গলির মধ্যে, বাইরে থেকে দেখে কিছুই বোঝার জো নেই, ভিতরে গেলে দেখা যায় মহলের পর মহল জুড়ে ছড়িয়ে আছে।

এই কাশীর ঘাটে আর গলিতে ঘুরে ঘুরে ফেলুদাকে রহস্যের সমাধান করতে হবে। শুটিং করার আগে জায়গাটাকে একবার ভাল করে ঘুরে দেখে নিতে হয়, কোন কোন জায়গায় কাজ হবে, সেখানে কোন সময় কেমন আলো থাকে, সেই আলোয় ছবি তোলা যায় কিনা, সেখানকার লোকজন আপত্তি করবে, না সহায়তা করবে। আগে থেকে জেনে না এলে পরে কাজের অসুবিধা হয়। শুটিং শুরু করার আগেই তাই আমরা তিনদিনের জন্য কাশী গেলাম জায়গাটাকে সার্ভে করতে আর স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে।

জয় বাবা ফেলুনাথ-এর ঘটনা পুজোর পাঁচটা দিনে ঘটছে। গল্পে দুর্গা প্রতিমার একটা ব্যাপার আছে ; সেই প্রতিমা আমাদের গড়াতে হবে কাশীতেই। আমরা প্রথম দিনই রওনা দিলাম বাঙালিটোলার গণেশ মহল্লার উদ্দেশে, কারণ জানতাম যে সেখানে কয়েক ঘর কুমোর বাস করে। এখানে গোধুলিয়ার মোড়ের কথাটা না বললে চলে না, কারণ এই গোধুলিয়া থেকে বেরোনো চারটে রাস্তার একটা ধরেই গণেশ মহল্লায় যেতে হয়। কলকাতায় যেমন শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড় বা ধরমতলা-চৌরঙ্গির মোড়, তেমনি কাশীর হল গোধুলিয়ার মোড়। রাস্তায় লোক চলাচলটা যখন একটু জমে উঠেছে, তেমন একটা সময় এই গোধুলিয়ার মোড়ে হাজির হলে মনে হবে কাশীর আঠারো হাজার সাইকেল রিকশার সব কটাই যেন একসঙ্গে সেখানে মিলে চতুর্দিকে একরাশ সচল ও সশব্দ পাঁচিলের সৃষ্টি করেছে, যেগুলো ভেদ করে পথচারীর রাস্তা পেরোনোর কিছুমাত্র আশা নেই। আর শুধু যে সাইকেল-রিকশা তা তো নয়, তার সঙ্গে মানুষ গরু টাঙ্গা মোটরগাড়ি আর এমনি দু-চাকার সাইকেল। এই জনসমুদ্র আর যানসমুদ্রের মধ্যে লাল পাগড়িধারী (যেমন আগে কলকাতায় ছিল), পুলিশকে দেখা যাচ্ছে মাঝে মাঝে হাত নেড়ে অঙ্গভঙ্গি করতে, কিন্তু সেদিকে বিশেষ কেউ দৃকপাত

করে না। বোঝা যাচ্ছে পুলিশও তার কাজটাকে বেশ হালকাভাবেই নেয়, কারণ তাদের কটাক্ষপাতের মতো অনেক ঘটনাই রাস্তায় হামেশাই ঘটছে— মোটরগাড়ি সাইকেল-রিকশাকে ধাক্কা মারছে, সাইকেল রিকশা মারছে সাইকেলকে অথবা মানুষকে— অথচ কেউই তাতে খুব একটা বিচলিত হচ্ছে বলে মনে হয় না। পুলিশ তো নয়ই।

এই গোধুলিয়ার চৌমাথা থেকে যে রাস্তাটা দক্ষিণে চলে গেছে সেটা দিয়ে মাইল দেড়েক গিয়ে বাঁয়ে পড়ে গণেশ মহল্লার গলির মুখ। সেখানে আমাদের ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে আমরা গলির ভিতর প্রবেশ করলাম। মিনিট খানেকের মধ্যেই কয়েকটি স্থানীয় বাঙালি ছেলে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে পড়ল। সকলের মুখেই এক প্রশ্ন— 'কী বইয়ের শুটিং হবে দাদা?' (ফিল্মের বাংলা প্রতিশব্দ হিসাবে 'বই' কথাটা বাঙালিদের মধ্যে যে কী করে চালু হল এটা আমার কাছে একটা রহস্য। 'বই'য়ের বদলে 'ছবি' বলতে আপত্তি কী?) সকলেরই শুটিং দেখার আগ্রহ, অথচ ব্যাপারটা কিন্তু আসলে বেশ ক্লান্তিকর, কারণ ছবিতে যে দৃশ্য হয়তো এক মিনিট চলবে সেটা তুলতে অনেক সময় লেগে যায় এক ঘণ্টারও বেশি। কিন্তু এই কথাটা বলেও আগ্রহটা দাবিয়ে রাখা যায় না। যাই হোক, এরা যখন এখানকার লোক, তখন এদের সাহায্য নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

কুমোরের কথা জিগ্যেস করাতে তারা বলল— চলুন ফেলুদার বাড়ি দেখিয়ে দিচ্ছি। কথাটা শুনে ভাবলাম এরা বুঝি ঠাট্টা করছে। ফেলুদার সঙ্গে কুমোরের কী সম্পর্ক? শেষটা কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা ঠাট্টা নয়। গণেশ মহল্লায় সত্যিই এক ঠাকুর-গড়িয়ে থাকেন যাঁর ডাক নাম ফেলু। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপও হল। নিরীহ মানুষ, একগাল দাড়ি, যদিও বয়স ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। সলজ্জ হাসি হেসে বললেন, 'আমার নামটার জন্য টিটকিরি সহ্য করতে হয়। ফেলুদার গল্প এখানে অনেকেই পড়ে।'

কুমোরের নাম ফেলুদা হওয়াটা খুবই আশ্চর্য ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু শুটিং করতে গিয়ে এরকম ঘটনা আগেও অনেকবার ঘটেছে। অপরাজিত ছবি তুলতে বেনারসে আসার পরদিনই একটি বাঙালি ছেলে আমাদের সঙ্গ নেয় যার ভাল নাম অনুপম আর ডাক নাম অপু। তার পরের বছর নিমতিতার পদ্মার ধারে চৌধুরীদের বাড়িতে জলসাঘর ছবি তুলতে গিয়ে দেখি সে বাড়ির এক ছোকরা চাকরের নাম তুফান। জলসাঘরের জমিদার বিশ্বম্ভর রায়ের প্রিয় ঘোড়ার নামও তুফান। আরও আশ্চর্য এই যে খান দশেক পুরনো জমিদার বাড়ি দেখে বাতিল করে শেষটায় নিমতিতার চৌধুরীবাড়ি দেখে যেই সেটা পছন্দ হয়ে গেল তখন শুনলাম যে এই বাড়িরই এক জমিদারের কথা শুনে তারাশঙ্কর

বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বম্ভর রায়ের চরিত্র তৈরি করেছিলেন।

ফেলু পটুয়া ছাড়া আরেকজন পটুয়ার সঙ্গে এই প্রথমদিনেই আলাপ হল যাঁর নাম বংশী পাল। জয় বাবা ফেলুনাথ-এর পটুয়ার নাম দিয়েছিলাম শশী পাল। এই কাছাকাছি মিলটাও বেশ আশ্চর্যের।

কুমোর ছাড়া আরও দুটো জিনিস আমাদের দরকার ছিল শুটিং-এর জন্য। এক হল গল্পের ভণ্ড সাধু মছলিবাবার জন্য ঘাটের ধারে-কাছে একটি গোপন আস্তানা ; আর দুই হল, যে ঘোষালদের আড়াই ইঞ্চি লম্বা সোনার গণেশ চুরি নিয়ে রহস্য, তাদের জন্য মানানসই একটা পুরনো বাড়ি। প্রথম দিনে গলি দেখা শেষ করে পরদিন সূর্য ওঠার আধ ঘণ্টা আগে আমরা ঘাটে গিয়ে হাজির হলাম। অনেক ঘাট ঘুরে দেখতে হবে বলে আমরা ট্যাক্সি করে হরিশচন্দ্র ঘাটে গিয়ে সেখান থেকে উত্তরে দশাশ্বমেধের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। সোজা ঘাট ধরে হাঁটলে মাইল দুয়েক পথ, কিন্তু আমাদের প্রায়ই সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আশে-পাশের বাড়িগুলো দেখতে হচ্ছে। দশাশ্বমেধের কাছাকাছি যখন পৌঁছেছি তখন সূর্য বেশ খানিকটা উঠে গেছে। সেদিন আবার ছিল মকরসংক্রান্তির স্নান। আসল স্নান দশাশ্বমেধে, কিন্তু লোকের ভিড় উপছে পৌঁছে গেছে আরও দুটো ঘাট এদিকে ওদিকে। এইসব স্নানার্থীদের মধ্যে আবার হিপিরা ঘোরা-ফেরা করছে ; কেউ দোকান থেকে চা কিনে খাচ্ছে, কেউবা ঘাটের সিঁড়িতে বসে পিড়িং পিড়িং করে সেতার বাজাচ্ছে, আবার কেউ এই সাত সকালেই গাঁজায় দম দিতে শুরু করেছে। গঙ্গার উপর দিয়ে বিদেশি টুরিস্টে বোঝাই বজরা ভেসে চলেছে। অনেকের হাতেই মুভি ক্যামেরা। তারা সাগ্রহে ফিল্ম তুলে চলেছে এই তাজ্জব দৃশ্যের।

দশাশ্বমেধের ঠিক পাশেই দক্ষিণে হল দ্বারভাঙা ঘাট। ঘাট থেকে খাড়াই সিঁড়ি উঠে গেছে একেবারে দ্বারভাঙার রাজার প্রাচীন প্যালেসের দরজা অবধি। আমরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। কলকাতার মানুষ, অতগুলো বেয়াড়া সিঁড়ি ভাঙতে বেশ পরিশম হয়, অথচ এখানকার আশি-বিরাশি বছরের বুড়ো বুড়িরা কত কাল ধরে সকাল সন্ধে দিব্যি এই সিঁড়ি দিয়ে উঠছে নামছে সেটা ভাবতে অবাক লাগে। এই দ্বারভাঙার সিঁড়ির পাশেই একটা আটকোণা বুরুজে পায়রাদের দানা দেওয়া হয় রোজ সকালে-বিকালে। শ'য়ে শ'য়ে পায়রার ঝাঁক এসে নামে এই বুরুজের উপর। এ দৃশ্য বাইশ বছর আগেও দেখেছি, এবারও দেখলাম। কীভাবে এই পায়রাকে ছবিতে কাজে লাগানো যাবে সেটাও মাথায় এসে গেল।

খারভাঙা প্যালেসের দরজায় তালাচাবি লাগানো। একজন দারোয়ান রয়েছে, সে বলল প্রবেশ নিষেধ। অথচ বাইরে থেকে দেখে ভিতরে ঢোকার প্রবল ইচ্ছা হচ্ছে। বুঝতে পারছি প্যালেসে কেউ থাকে না, কাজেই মছলিবাবার গোপন ডেরা সেখানে হলেও হতে পারে। সুখের বিষয়, দুটো টাকা বকসিশ দিতেই দারোয়ান চাবি এনে দরজা খুলে দিল। ভিতরে ঢুকতেই বুকের ভিতর ধুকপুকুনি সুরু হয়ে গেল আর মন বলল যে আর কোনও বাড়ি দেখতে হবে না, যা চাইছিলাম তা পেয়ে গেছি। গঙ্গার উপরে মোগলাই কাজ করা এই প্রাচীন পরিত্যক্ত প্রাসাদেই শুটিং করতে হবে, এবং সে কাজের জন্য অনুমতি যেখান থেকে হোক জোগাড় করতেই হবে।

প্যালেসের প্রথম তলাটাই ঘাট থেকে প্রায় পঞ্চাশ হাত উপরে। দরজা দিয়ে ঢুকে প্রথমে পড়ে একটা খোলা বারান্দা। তার রেলিং-এর ধারে গিয়ে নীচের দিকে চাইলে ঘাটের মানুষগুলোকে খুদে খুদে দেখায়। ঘাটের শব্দও এখানে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। উত্তরে চাইলে দেখা যাচ্ছে রেলের ব্রিজ, আর দক্ষিণে ওপারে রামনগরের কেল্লার সামনে দিয়ে গঙ্গাটা বাঁক নিয়ে পুবমুখো হয়ে কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে।

প্রথম বারান্দা পেরিয়ে দ্বিতীয় বারান্দায় ঢুকে ডাইনে খিলান পেরিয়ে প্রাসাদের ভিতর গিয়ে ঢুকলাম। এখানেও বারান্দায় ঘেরা ছাতখোলা উঠোন। বাঁয়ে এক কোণে একরাশ পুরনো আসবাব ডাঁই করা হয়েছে। ডাইনে অন্ধকার দরজা দিয়ে ঢুকে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। দিনের বেলায় টর্চ জ্বেলে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠেই মছলিবাবার ঘর পেয়ে গেলাম। ক্যামেরায় দেখালেই বোঝা যাবে এ বাড়িতে কস্মিন কালে কেউ আসে না ; কাজেই গোপন ডেরার পক্ষে চমৎকার জায়গা। জায়গা বেছে নিয়ে প্যালেস থেকে বেরোবার সময় একটা আশ্চর্য জিনিস চোখে পড়ল। সেটা একটা বৈদ্যুতিক লিফ্‌ট। বিদ্যুতের অভাবে সেটা অবিশ্যি এখন অচল, কিন্তু রাজার আমলে যখন চলত, তখন সেটা প্রাসাদের চার তলা অবধি ওঠা-নামা করত। চার তলায় কালীমন্দির। রাজা স্নান সেরে লিফ্‌টে উঠে বোতাম টিপে সোজা পৌঁছে যেতেন পুজোর ঘরে।

মছলিবাবার ডেরা তো পাওয়া গেল, আর সেই সঙ্গে প্যালেসে শুটিং করার অনুমতিও আদায় করে নেওয়া হল। এবার বাকি ঘোষালদের বাড়ি। খোঁজ করে আমাদের চাহিদা অনুযায়ী দুটো বাড়ির সন্ধান পাওয়া গেল। একটা মেমুরগঞ্জের সাহাদের বাড়ি। গিয়ে দেখলাম মোটামুটি গল্পের বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায়, কিন্তু তার আশেপাশে বেনারসের কোনও চিহ্ন নেই। এখানে শুটিং করাও যা কলকাতাতেও তাই। এ বাড়ি বাতিল করে আমরা চলে গেলাম নাগওয়া। এই নাগওয়ার ঘাট থেকেই

সাঁকো পেরিয়ে রামনগর যায়। নাগওয়ার যে অংশে বাড়ি দেখব, সেটার নাম লঙ্কা। বাড়ির মালিক ছিলেন উত্তর প্রদেশের কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচান্সেলর জ্ঞান চক্রবর্তী। তিনি মারা গেছেন অনেককাল ; এখন বাড়ি চলে গেছে ডালমিয়াদের হাতে। গেট দিয়ে ঢুকে বেশ কিছুটা হাঁটার পর গাছপালার আবরণ সরে গিয়ে বাড়িটা দেখা যায়। বিশাল অট্টালিকা। কেউ থাকে না এখন তাতে। চারদিকে বিস্তীর্ণ জমি, এককালে বেশ রমরমা ছিল সেটা দেখেই বোঝা যায়। ঘোষালবাড়িই বটে। পাশেই গঙ্গা, তবে বর্ষায় জল বাড়লেও এ বাড়ির একতলা অবধি পৌঁছবে না, কারণ ভিত প্রায় দশ হাত উঁচু, প্রথম তলায় পৌঁছতে অনেকগুলো সিঁড়ি ভাঙতে হয়। জমিটা ছিল নাকি এক মেমসাহেবের। তাঁর সঙ্গে এই জ্ঞান চক্রবর্তীর আলাপ হয়। তার অল্পদিন পরেই মেমসাহেব স্বপ্নে জানেন যে পূর্বজন্মে জ্ঞান চক্রবর্তী ছিলেন তাঁর নিজের ছেলে। অনেকদিন কাশীতে থেকে ভদ্রমহিলার হিন্দু ধর্মের প্রতি টান হয়, পূর্বজন্ম-টন্ম সম্বন্ধেও বিশ্বাস জন্মায়। এই স্বপ্ন দেখার ফলে মেমসাহেব তাঁর জমিজমা সম্পত্তি সব কিছু চক্রবর্তীমশাইকে দান করে যান। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে চক্রবর্তীমশাই বাড়িটি তৈরি করেন আর উনিশ শো আটাত্তর সালে সেখানে হবে ফেলুদার ছবির শুটিং।

বাড়ির মধ্যে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি তাক লাগিয়ে দেয় সেটা হল ছাত। এই ছাতে বেশ কিছু দৃশ্য তুলতে হবে, কারণ ছাতেই হল গল্পের খুদে নায়ক রুক্মিণীকুমার বা রুকুর খেলার ঘর। যেমন ঘর গল্পে ছিল, ঠিক তেমনই একটা ঘর রয়েছে ছাতের সিঁড়ির ঠিক ডান দিকে। এই ঘর থেকে বেরিয়ে আরও চার ধাপ সিঁড়ি উঠে তবে আসল ছাত। কাশীর যে দৃশ্য দেখা যায় এই ছাত থেকে তার কোনও তুলনা নেই। সুদূরে রেলের ব্রিজ অবধি বিছিয়ে রয়েছে বেনারসের উপকূল, কাস্তের ফলার মতো গোল হয়ে বেঁকে গেছে এ মাথা থেকে ও মাথা। সকালের কুয়াশায় দৃষ্টি বেশি দূর যায় না, কিন্তু বেলা বাড়লে কুয়াশা কেটে ক্রমে পুরো শহরটাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। দক্ষিণে গঙ্গার পাড় অবধি সমস্ত জমিটাই ছিল চক্রবর্তীদের। সেই জমিতে এখন অড়হর আর গাঁদা ফুলের চাষ হয়েছে। শুনলাম শহরের পুজোর বেশির ভাগ গাঁদাই এখান থেকে যায়।

ঘোষালদের জন্য এত ভাল আর এমন জুতসই একটা বাড়ি পাওয়াতে মনটা নেচে উঠেছিল, তার পর যখন জানলাম যে এখানে শুটিং করার অনুমতি পেতে কোনও অসুবিধা হবে না, তখন আনন্দের সঙ্গে পরম নিশ্চিন্তির ভাব নিয়ে তিন দিনের কাশীবাস শেষ করে কলকাতায় ফিরলাম। কলকাতায় দিন কয়েক থাকা ; তার মধ্যে একটা বড় কাজ

হল রুকুর জন্য একটি নতুন ছেলে জোগাড় করা। শুটিং শুরু হবে ফেব্রুয়ারি মাসের ১৩ই।

* * *

বেনারসে যখন শুটিং-এর জন্য জায়গা খুঁজতে আসি, তখন আমরা ছিলাম পাঁচজন। আমি ছাড়া ছিল আমার ক্যামেরাম্যান সৌমেন্দু, শিল্প-নির্দেশক অশোক (যাকে কলকাতার স্টুডিওতে বেনারসের ঢং-এ ঘরবাড়ি তৈরি করতে হবে), অন্যতম সহকারী পুনু সেন আর প্রোডাকশন ম্যানেজার অনিলবাবু। এই শেষ জনের কাজ হল সব খোঁজখবর নেওয়া, শুটিং-এর অনুমতির জন্য তদ্‌বির করা, খরচের হিসাব রাখা ইত্যাদি।

শুটিং-এ যখন যাই, তখন দলে থাকে অনেক লোক। এবারে যেমন কুলি-মজুর বাদে ছিল তেইশ জন। পুরো একটা বগি রিজার্ভ করে সবাই একসঙ্গে এক গাড়িতে যাওয়া আমাদের রীতি। অভিনেতাদের মধ্যে শুধু ফেলুদা ছিল আমাদের সঙ্গে। বাকিরা তাদের যেদিন থেকে দরকার ঠিক আগের দিন পৌঁছলেই চলবে। এদের সবাইকে ঠিক ঠিক দিনে ট্রেনে তুলে দেবার দায়িত্ব পালন করার জন্য অনিলবাবু কলকাতায় রয়ে গেলেন।

জয় বাবা ফেলুনাথ-এর খুদে চরিত্র ৭ বছরের রুকুর জন্য ছেলে খুঁজতে হবে আগেই লিখেছি। সেই ছেলেকে পেলাম যেদিন রাত্রে দুন এক্সপ্রেসে কাশী রওনা হব সেদিন দুপুরে। একটি ছেলেকে আগে দেখা হয়েছিল ; তার একটা স্ক্রিন-টেস্ট নিয়ে দেখা গেল তার বয়স আট হলেও পর্দায় তাকে প্রায় দশ বলে মনে হচ্ছে। সেটা রুকুর পক্ষে একটু বেশি বলে ভাল অভিনয় সত্ত্বেও ছেলেটিকে বাদ দেওয়া হল। নতুন লোক নিতে গেলে অনেক সময়ই স্ক্রিন-টেস্ট করে নিতে হয়। যার টেস্ট হবে তাকে চরিত্র-অনুযায়ী খানিকটা ডায়লগ দিয়ে দিতে হয়। সেটা মুখস্থ করে ক্যামেরার সামনে পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী অভিনয় করে। সেই অভিনয় পর্দায় দেখে বিচার করা হয় বাছাই ঠিক হয়েছে কিনা। এটা সব সময় চোখে দেখে সম্ভব হয় না, কারণ মানুষের চোখ যা দেখে, ক্যামেরার চোখ দেখে তার চেয়ে বেশি। একজন লোক যখন সাধারণভাবে কথাবার্তা বলে, বিশেষ কারণ না থাকলে আমরা কখনওই তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি না। ক্যামেরা কিন্তু ঠিক এই কাজটাই করে। এই নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার ফলটা যখন আমরা পর্দায় দেখি অভিনয়ের সূক্ষ্ম দোষগুলি চট্ করে ধরা পড়ে। তেমনি আবার অনেক সময় চোখে দেখে যাকে খুব সাধারণ বলে মনে হয়, ক্যামেরায় সূক্ষ্ম গুণ ধরা পড়ে এই সাধারণকেই অসাধারণ করে তোলে।

রুকুর জন্য বাছাই করা ছেলে টেস্টে বাদ পড়ে যাওয়াতে আমাদের খুবই মুশকিল পড়তে হয়েছিল। ছেলে আসছে অনেক, কিন্তু কাউকেই পছন্দ হয় না। এদিকে সময় চলে যাচ্ছে, শুটিং-এর তারিখ বাঁধা, হোটেল আর ট্রেনের বুকিং হয়ে গেছে। যেদিন রাত্তিরে দুন এক্সপ্রেসে রওনা দেব, সেদিন সকালে সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমার সহকারী পুনু টালিগঞ্জ থেকে ফোন করে উত্তেজিত কণ্ঠে জানাল, একটি ছেলেকে সে একটা দোকানের সামনে দেখে তার পিছনে ধাওয়া করে তার মা-র সঙ্গে কথা বলে জেনেছে যে আমার পছন্দ হলে আমরা সে ছেলেকে ছবিতে ব্যবহার করতে পারি। আমি বলাতে আধঘণ্টার মধ্যে ট্যাক্সি করে মা ও ছেলে হাজির হয়ে গেলেন আমার বাড়িতে, আর শ্রীমান জিৎ বোস-কে একবার দেখে এবং দুটো কথা বলে বুঝে গেলাম যে মনের মতো রুকু পেয়ে গেছি।

এখানে বলি যে আমার অনেক ছবির জন্যেই ছোট ছেলে পাওয়া গেছে বেশ অদ্ভুতভাবে। পথের পাঁচালির অপুর জন্য ছেলে খুঁজে হয়রান হয়ে শেষটায় কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল। অমুক দিন অমুক সময় পাঁচ থেকে সাত বছরের ছেলে সঙ্গে নিয়ে অভিভাবকরা যেন এসে দেখা করেন অমুক ঠিকানায়। বহু ছেলে এসেছিল। তার মধ্যে ছিল আবার একটি মেয়ে, যার বাপ-মা সবেমাত্র তাকে সেলুন থেকে চুল ছাঁটিয়ে (তখনও ঘাড়ে পাউডার লেগে আছে!) ছেলের পোশাক পরিয়ে নিয়ে এসেছেন। এদের কাউকেই পছন্দ হয়নি। শেষটায় ছেলে পাওয়া গেল আমাদের পাশের বাড়ি থেকে।

অপরাজিত ছবির জন্য দরকার ছিল আরেকটু বেশি বয়সের অপুর। কোথায় পাব জানি না; অনেক ছেলে দেখেছি, পছন্দ হয়নি। শেষটায় একদিন সোনারপুরের দিকে একটা গ্রাম দেখে ট্রেনে করে ফিরছি, এমন সময় আমাদের কামরাতেই এসে উঠল একদল স্কুলের ছেলে। তারা একসকার্শন সেরে ফিরছে। একটি ছেলেকে দেখেই ভাল লাগল, কিন্তু এত ভিড়ে কথা বলার সুযোগ পেলাম না। ট্রেন বালিগঞ্জে এসে থামল; আমাদের সঙ্গে ছেলের দলও নামল। আমার পছন্দ-করা ছেলেটিকে একটা ট্রামে উঠতে দেখে দৌড়ে গিয়ে সেই ট্রামে উঠে ছেলেটির পাশে বসে তাকে সরাসরি জিগ্যেস করলাম সে সিনেমায় নামবে কিনা। সে বিনা দ্বিধায় ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলে দিল। বললাম, 'তোমার বাবা-মা আপত্তি করবেন না সেটা কী করে জানলে?" তাতে ছেলেটি বলল যে তার বাবা নেই, আর মা যে আপত্তি করবেন না সেটা মাকে না জিগ্যেস করেও বলতে পারে। শেষ পর্যন্ত তার কথাই ঠিক বলে প্রমাণ হল। অথচ এই অপরাজিত ছবির জন্যই অপুর বান্ধবী লীলার উপযোগী কোনও মেয়ে না পাওয়ায় শেষ পর্যন্ত লীলার চরিত্রটাই ছবি থেকে বাদ

হয়ে যায়।

বেনারসে যখন রওনা হই তখন জয় বাবা ফেলুনাথ-এর জন্য সব লোক বাছা হয়ে গেছে। তাদের প্রায় সকলেরই অল্পবিস্তর কাজ হবে বেনারসে, বাকি কাজ হবে কলকাতায় স্টুডিওতে মার্চ-এপ্রিল-মে-তে। সৌমিত্র ছাড়াও আরেকজন অভিনেতা চলেছেন আমাদের সঙ্গে। তিনি যে কাজটা করবেন সেটা অভিনয়ের চেয়ে কিছু কম কঠিন বা দায়িত্বপূর্ণ নয়। কাশীর ঘাটে গলিতে শুটিং দেখার জন্য ভিড় হবে সেটা আগে থেকেই জানি। এই ভিড় সামলাতে দুটি লোকের জুড়ি নেই। এক হল আমাদের ইউনিটেরই ভানু ঘোষ, যার এক হুঙ্কারে লোক ছিটকে পিছিয়ে পড়ে, আর দুই হল সোনার কেল্লার মন্দার বোস, অর্থাৎ অভিনেতা কামু মুখার্জি। এই কামুর সঙ্গে গুপী গাইন আর সোনার কেল্লাতে অনেকবার একসঙ্গে একই ট্রেনের বগিতে যাতায়াত করেছি। ভোরে কোনও স্টেশনে গাড়ি থামলেই কামুর হাঁক শোনা যায়— 'জাগো বাঙালি'। এই ডাকে অবিশ্যি দলের সকলেরই ঘুম ভেঙে যায়। আর তারপরে কামুরই উদ্যোগে ঘরে ঘরে চলে আসে চায়ের ভাঁড়। সোনার কেল্লার শুটিং-এ মারাত্মক কাঁকড়া বিছের ল্যাজের ডগায় হুলটাকে ঠিক বাঁচিয়ে খপ করে দু আঙুলে ল্যাজটা শূন্যে তুলে নিতে দেখেছি এই কামুকেই। সত্যি বলতে কি কামুর বিচিত্র কীর্তিকলাপের কথা লিখতে গেলে একটা পুরো বই হয়ে যায়। একটা উদাহরণ দিই।

গুপী গাইন শুটিং-এর জন্য যখন রাজস্থান যাই, তখন আমাদের দলে একজন অভিনেতা ছিলেন, তাঁর নাম রাজকুমার লাহিড়ি। তিনি রাজস্থানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে জয়পুর থেকেই ছোট বড় মাঝারি নানান সাইজের নাগরা কিনতে আরম্ভ করলেন। তাঁর বাড়িতে নাকি বিভিন্ন বয়সের অনেক মেম্‌বার, তারা সকলেই ফরমাশ দিয়েছে নাগরা নিয়ে যেতে। এই নাগরার বান্ডিলের আকার বাড়তে বাড়তে জয়সলমির পৌঁছে সেটা হয়ে গেল মোটামুটি একটা প্রমাণ সাইজ ধোপার পুঁটুলির মতো। লাহিড়ি মশাইয়ের এই বাতিক এবং এই বোঁচকা কারুরই দৃষ্টি এড়ায়নি।

জয়সলমিরে আমরা ছিলাম রাজার গেস্ট হাউস জওহরনিবাসে। তার দোতলায় আমার পাশের ঘরেই লাহিড়ি মশাইয়ের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছে। হলদে পাথরে তৈরি এই জওহরনিবাসকে একটা ছোটখাটো প্রাসাদ বলা চলে ; উঁচু সিলিং-ওয়ালা ঘরগুলো রীতিমতো বড়, এবং প্রত্যেক ঘরের জানালা দিয়ে হয় কেল্লা না হয় দিগন্ত-বিস্তৃত মরুপ্রান্তর দেখা যায়।

দিন দু'এক কাজ হবার পর একদিন সন্ধ্যাবেলা— আমি যখন আমার ঘরে বসে পরদিনের কাজের প্ল্যান করছি— লাহিড়িমশাই আমার কাছে

এসে একটু ইতস্তত ভাব করে গলা খাঁকরি দিয়ে বললেন, 'ইয়ে, আমার একটা, মানে, কমপ্লেন আছে'। কমপ্লেন খুব জরুরি না হলে আমার কানে পৌঁছয় না ; বুঝলাম ব্যাপারটা গুরুতর। বললাম, 'বলুন কী কমপ্লেন'। উত্তর এল, 'মানে, নাগরাগুলো পাচ্ছি না'। 'একটাও না ?' 'একটাও না। কেউ বোধ হয় ইয়ে করে নিয়েছে।'

'চুরি' কথাটা ভদ্রলোক যেন ব্যবহার করতে গিয়েও পারলেন না। 'ঠিক আছে, দেখছি কী করা যায়,' বলে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় করলাম, কিন্তু তাঁর আমসি-মুখে কোনও পরিবর্তন দেখলাম না।

এর পরে অনেককেই ডেকে নাগরার বিষয় জিগ্যেস করলাম, কিন্তু তারা কেউই এ ব্যাপারে কোনও আলোকপাত করতে পারল না। শেষটায় এল কামু। আমার একটু সন্দেহ ছিল যে কামুই কালপ্রিট। তাকে জিগ্যেস করাতে সে চোখ কপালে তুলল— 'কে বলেছে নাগরা নিয়েছে ? নাগরা তো লাহিড়ি মশায়ের ঘরেই রয়েছে। আসুন দেখিয়ে দিচ্ছি।'

পাশের ঘরে যেতে কামু উপর দিকে আঙুল দেখাল। চেয়ে দেখি সুউচ্চ সিলিং-এর কড়িবরগায় বাঁধা দড়িতে ঝুলছে নাগরার ঝাড়লণ্ঠন— এত উঁচুতে যে সেটা চট্ করে চোখে পড়ার কথা নয়। এই নাগরাগুচ্ছের ঠিক নীচেই লাহিড়ি মশাইয়ের বিছানা। 'মেঝেতে অনেক জায়গা নিচ্ছিল বলে সিলিং-এ তুলে দিলুম', বলল কামু। তার পর পাশে দাঁড়ানো হতভম্ব লাহিড়ি মশাইয়ের দিকে চেয়ে তিরস্কারের সুরে বলল, 'আপনি এরকম চুকলিবাজ জানলে রাত্তিরে আপনাকে বিছানায় শুইয়ে ওই দড়ি কেটে দিতুম, তখন দেখতেন নাগরা Falls কাকে বলে !'

কামুর আরেকটা গুণের কথা এখানে বলতেই হয়। সেটা হল, কোনও কিছুর বর্ণনা দিতে অপ্রত্যাশিত উপমার ব্যবহার। একবার আমার বাড়িতে বসে বিস্কুট খেতে খেতে বলল, 'বউদি, এগুলোতে সাইলেন্সর লাগিয়েছেন বুঝি ?' অর্থাৎ বিস্কুট মিইয়ে যাওয়াতে চিবোলে শব্দ হচ্ছে না। জয়সলমিরে একদিন সকালে এসে কামু বলল সে সারারাত খড়কাটা মেশিনের শব্দে ঘুমোতে পারেনি। জয়সলমিরে খড়কাটা মেশিন কোথায় জিগ্যেস করাতে বলল তার ঘরে বৃদ্ধ গোবিন্দ চক্রবর্তী, যিনি গুপীর বাবা সেজেছিলেন, তিনি থাকেন, তাঁর নাকি রাত্রে কাশির ফিট ওঠে। যারা খড়কাটা মেশিনের শব্দ আর হেঁপো বুড়োর কাশির শব্দ দুটোই শুনেছে তারাই বুঝবে উপমাটা কী মোক্ষম।

কাশীতে পৌঁছে প্রথম দুদিন শুটিং-এর জায়গাগুলো আরেকবার ভাল করে দেখে নেওয়া হল। এটা ছাড়াও আরেকটা কাজ— সেটা হল, একটা ভাল বজরা ঠিক করা। এই বজরা ছবিতে হবে ভিলেন মগনলালের বজরা, আর যখন শুটিং হবে না, তখন এটিতে করে

মাল-পত্তর এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে নিয়ে যাওয়া হবে। একটা বেশ বড় বজরা ঠিক করে সেটাতে নতুন করে রং দিয়ে নকশা করার জন্য কারিগর লাগিয়ে দেওয়া হল। দরজার দুদিকে থাকবে সশস্ত্র সেপাইয়ের ছবি, আর জানালার চারপাশে থাকবে ফুল-পাতার নকশা। বেনারসে অনেক বাড়ির গায়ে এরকম দেখা যায়— হাতি, ঘোড়া, ময়ূর, টিয়া, বাঘ, রাজা, সেপাই। এই নকশার উপলক্ষ হচ্ছে বিয়ে। বিশ বছর আগে দেখেছি এই সব নকশার তুলির টান একেবারে পাকা শিল্পীর হাতের টানের মতো। আজকাল আঁকার ভাল লোক পেতে অনেক খুঁজতে হয়।

শুটিং শুরুর দিন, অর্থাৎ তেরই ফেব্রুয়ারি, ভোর সাড়ে ছটায় দ্বারভাঙা ঘাটে পৌঁছে সাড়ে দশটার মধ্যে মছলিবাবার আস্তানা আবিষ্কারের পুরো দৃশ্যটা শেষ হয়ে গেল। যারা ফিল্ম তৈরি করে, তাদের একটা হিসেব আছে যে দিনে যদি তিন মিনিটের ছবি তোলা যায় তা হলে বুঝতে হবে যথেষ্ট কাজ হয়েছে। তিন মিনিটের ছবি মানে পর্দায় দেখাতে যেটা তিন মিনিট সময় নেবে। এই হিসেবেই যে ছবি পর্দায় চলবে ২ ঘণ্টা অথবা ১২০ মিনিট, সে ছবি তুলতে গড়ে লাগে ৪০/৪৫ দিন। স্টুডিওর আট ঘণ্টা কাজের মধ্যে তিন মিনিটের ছবি তোলা কঠিন নয়। কিন্তু আউটডোরে মাত্র এক সকালে আজ আমরা প্রায় রেকর্ড করে ফেলেছি, কারণ আজকের এই দৃশ্য পর্দায় থাকবে প্রায় পাঁচ মিনিট।

প্রথম দিন বলে ঘাটে শুটিং দেখার জন্য বেশি ভিড় হয়নি। যারা এগিয়ে এসে দেখার বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, তাদের দিয়ে ঘাটে হাঁটা-চলা করিয়ে শটেই কাজে লাগিয়ে নেওয়া গেল। সব রকম লোকই ঘাটে হাঁটা চলা করে, কিন্তু ছবিতে দেখাতে গেলে এমন লোক চাই যাদের কাশীর ঘাটে মানায় ভাল। এই সব লোকের জন্য দৃষ্টি সজাগ রাখতে হয়। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী, পাণ্ডা বা তীর্থযাত্রী টাইপের লোক, বা লাঠি হাতে কোমর ভাঙা বুড়ি— এদের দেখলেই আমাদের লোভ লেগে যায় তাদের কথা বলে বুঝিয়ে ছবির কাজে লাগানোর জন্য। শুধু মানুষ নয়, গরু ছাগল কুকুর এসবও এই ভাবে কাজে লাগিয়ে নিতে হয়। ইচ্ছে করলে পুলিশ লাগিয়ে ঘাটকে-ঘাট খালি করে দিয়ে শুধু অভিনেতাদের নিয়ে কাজ করা যায়, কিন্তু বেনারসের ঘাটে একমাত্র ফেলুদাই চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, এ দৃশ্য একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য হত না। তাই লোক জোগাড়ের জন্য এত মেহনত।

এখানে বলে রাখি যে প্রথমবার দ্বারভাঙা প্যালেসে ঢুকে উঠোনের ডানদিকে যে স্তূপীকৃত পুরনো ভাঙা আসবাব দেখেছিলাম, আজ তার সমস্তটুকু দড়ি দিয়ে বেঁধে একতলা থেকে দোতলায় চালান করে দিতে

হয়েছিল। সেগুলো রাখা হয়েছিল দোতলার বারান্দার একটা কোণে। আচমকা মছলিবাবা এসে পড়ায় এই ভাঙা আসবাবের স্তূপের পিছনেই হয়েছিল ফেলুদার লুকোনোর জায়গা।

সকালের কাজ শেষ করে সাড়ে এগারোটার মধ্যেই যে যার হোটেলে ফিরে এলাম। বিকেলের প্রোগ্রাম হল চারটের মধ্যে আবার ঘাটে হাজির হওয়া। মগনলালের বজরা করে মছলিবাবা দর্শনে আসছেন সেই দৃশ্য তোলা হবে।

প্রথম দিন সকালে দ্বারভাঙা ঘাটের শুটিং-এ বিশেষ ভিড় না হলেও, বিকেলে সেই একই ঘাটে গিয়ে দেখি তার চেহারাটা হয়েছে ফুটবল স্টেডিয়ামের মতো। শুধু ঘাটে কেন, গঙ্গার বুকেও হঠাৎ নৌকার সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে যারা ডাঙায় জায়গা পায়নি তারা জল থেকে শুটিং দেখার মতলব করেছে। নৌকোয় আপত্তি নেই, কারণ বেনারসে ছুটিতে এসে বহুলোকেই বিকেলে নৌকো ভাড়া করে বেড়ায়। কিন্তু ঘাটের দর্শকদের সামলাতে হবে। এই ভিড় জিনিসটা যে কী মারাত্মক হতে পারে সেটার একটা উদাহরণ আমারই একটা পুরনো ছবি থেকে দিই।

চিড়িয়াখানা ছবির শুটিং হয়েছিল কলকাতার বাইরে বারাসত ছাড়িয়ে বামুনগাছি বলে একটা গ্রামে। আমবাগানের মধ্যে একটা বেশ বড় খোলা জায়গায় আমরা পাঁচিলে ঘেরা গোলাপ কলোনির সেট তৈরি করে নিয়েছিলাম। কোনও ফিল্মের জন্য তৈরি করা ঘরবাড়ি রাস্তাঘাটকে বলে সেট। গল্পে একজন অবসরপ্রাপ্ত জজ সাহেবের বিশেষ করে তৈরি এই কলোনিতে ছিল ফুলের বাগান (যাকে বলে নার্সারি), পুকুর, কলোনির কর্মচারীদের থাকবার জন্য গোটা ছ'য়েক কটেজ, জজ সাহেবের নিজের বাংলো, একটা বড় গোয়ালে আট-দশটা গরু, আর বেড়া দিয়ে ঘেরা পোলট্রি। অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশ। প্রায় এক মাস ধরে অনেক খেটে অনেক খরচে আমরা তৈরি করেছিলাম এই কলোনি। শুটিং-ও হবে প্রায় একমাস।

শুটিং-এর জায়গা থেকে মাইল দু-এক দূরে রেলের স্টেশনে ট্রেন আসা-যাওয়ার শব্দ পেতাম। এটা জানতাম যে দুপুরে একটার সময় কলকাতার একটা ট্রেন এসে সেখানে থামে।

প্রথম কয়েকদিন নির্বিবাদে কাজ হল। তার পর একদিন কলকাতার ট্রেনটা ছেড়ে যাবার ঘণ্টাখানেক পরে একটা কোলাহল শুনতে পেলাম। ক্রমে কোলাহল স্পষ্ট হবার পর বুঝতে পারলাম ছেলের দল আসছে স্লোগান দিতে দিতে। স্লোগান হল, 'শুটিং দেখতে দিতে হবে। ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ!' আরও কাছে এলে পর পাঁচিলের উপর দিয়ে

সড়কির ডগা দেখা গেল। পরে বেরোল সেগুলো সড়কি নয়, ছেলের দল আখের খেত থেকে খান পঞ্চাশেক আখ উপড়ে নিয়ে সেগুলো কাঁধে নিয়ে আসছে। তারা এসেই পাঁচিলের বাইরে যত আমগাছ ছিল সব কটার জুতসই ডালগুলো দখল করে ফেলল। অবাক হয়ে দেখলাম যে ছেলের ভিড়ে গাছের পাতা আর দেখাই যাচ্ছে না। আমরা এই অবস্থাতেই কাজ শুরু করে দিলাম, কারণ একবার তাদের নামতে বলার পরক্ষণেই কলোনি জুড়ে ইষ্টকবর্ষণ শুরু হয়েছিল। ঘন্টাখানেক কাজের পর হঠাৎ একটা মড় মড় শব্দ শোনা গেল, এবং তার পরেই ঝুপঝাপ, আর সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ!

একটা গাছের ডাল ভেঙে সাতটি ছেলে মাটিতে পড়েছে, তার মধ্যে একজন গুরুতর ভাবে জখম। সেই জখম ছেলেকে ফার্স্ট এড দিল আমাদেরই একজন অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। শুভেন্দু এককালে ডাক্তারির ছাত্র ছিল।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে এমন একটা দুর্যোগের পরেও দলের কারুরই শুটিং দেখার উৎসাহ কমল না, এবং একটি ছেলেও গাছ থেকে নামল না। এই ভাবে এই অবস্থায় পর পর চারদিন আমাদের শুটিং করতে হয়েছিল। এমনও দেখেছি যে মাঝবয়সী ভদ্রমহিলাদের কাঁধে চড়িয়ে গাছে তুলে দিচ্ছে এই সব ছেলেরা। মহিলারাও এই সুবর্ণসুযোগ পেয়ে পরম আহ্লাদে ঘন্টার পর ঘন্টা গাছের ডালে বসে কাটিয়ে দিচ্ছেন। আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, সিনেমাটা যে পর্দায় দেখার জিনিস সেটা অনেকেই ভুলে যায়। তারা ভাবে খোলা মাঠে যেমন লোকে যাত্রা দেখে, খোলা রাস্তাঘাটে শুটিং দেখাটাও বুঝি সেই রকম জিনিস।

যাই হোক, ঘাটে ভিড় হবে সেটা আন্দাজ করেছিলাম, তাই সঙ্গে মোটা দড়ি আনা হয়েছিল। সেটা বার করে ভানু আর কামু কর্ডন তৈরি করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এসব অবস্থায় মেজাজ গরম করে লাভ হয় না; সবাইকে মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে দিতে হয় ভিড় করে এগিয়ে এলে আমাদের কাজের কী ধরনের ক্ষতি হয়। যখন বলা হল যে কাজের জায়গাটুকু খালি করে না দিলে আমরা কাজ বন্ধ করে ক্যামেরা গুটিয়ে সরে পড়ব, আর তা হলে কারুরই কিছু দেখার থাকবে না, তখন সকলেই মোটামুটি ভদ্র হয়ে দড়ির পিছনে রয়ে গেল।

এদিকে উৎপল দত্ত উত্তরে দুটো ঘাট দূরে বজরার মাথায় আরামকেদারায় রেডি হয়ে বসে আছে, আমাদের একজন লোক সে ঘাটে রাখা হয়েছে, আমরা তৈরি হলে তাকে সিগন্যাল করব, তখন তার

ইশারায় মগনলালের বজরা আমাদের ঘাটের দিকে রওনা হবে। দ্বারভাঙা ঘাটে ফেলুদা, লালমোহন আর তোপসে রেডি হয়ে আছে আর তাদের সঙ্গে আছেন লিট্‌ল থিয়েটারের সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ক্যালকাটা লজের ম্যানেজার চক্রবর্তী মশাইয়ের পার্ট করেছেন। মগনলালের বজরা দেখতে পেয়ে এই চক্রবর্তী মশাই কাশীর এই ডাকসাইটে লোকটিকে ফেলুদের চিনিয়ে দেবেন। ফেলু বাইনোকুলার দিয়ে মগনলালকে দেখবে, তার পর বজরা আমাদের ঘাটে লাগলে পর মগনলাল ছাত থেকে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ভৃত্যের হাত থেকে রুপোর রেকাবির উপর সিল্কের রুমাল দিয়ে ঢাকা উপঢৌকন নিজের হাতে নিয়ে ফেলুদের সামনে দিয়েই মছলিবাবার সভার দিকে চলে যাবে। লাল হল মছলিবাবার নম্বর ওয়ান ভক্ত।

যদিও মছলিবাবা ঘাটেরই একটা অংশে বসেন, এ দৃশ্য কাশীতে না তুলে কলকাতায় তোলা হবে, কারণ সভায় অনেক ঘটনা আছে, সেটা স্টুডিওতে তোলা অনেক বেশি সুবিধা। এবারে, ফেব্রুয়ারি মাসে, তোলা হল মগনলাল ফেলুদার সামনে দিয়ে মছলিবাবার দিকে এগিয়ে গেলেন। আর এপ্রিল মাসে কলকাতায় তোলা হবে মগনলাল মছলিবাবার সামনে বসে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর হাতে উপঢৌকন তুলে দিলেন। দর্শক যখন দেখবে, তখন এই দুমাসের ব্যবধান তারা কিছুই বুঝতে পারবে না।

প্রথম দিন মগনলালের যে দৃশ্যটা তোলা হল সেটা ছবির একেবারে গোড়ার দিকের দৃশ্য, আর দ্বিতীয় দিন তোলা হল ছবির একেবারে শেষ দিনের দৃশ্য। এখানেও মগনলাল বজরা করে এসে হাতে ভেট নিয়ে সিঁড়ি উঠছে। কিন্তু এবার তাকে দেখছে কেবল লালমোহন আর তোপসে। এই লালমোহন আর তোপসেকে দেখে চেনা মুশকিল হবে, কারণ তারা দুজনেই ফেলুর নির্দেশমতো ছদ্মবেশ নিয়ে এসেছে। দুজনেরই পরনে গেরুয়া, মাথায় জটা, কপালে চন্দন আর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। লালমোহনের হাতে আবার যষ্টি আর কমন্ডুল। তাকে বুরুজের উপর বসে মাঝে মাঝে গালবাদ্য আর বম্‌ বম্‌ করতে হচ্ছে, তোপসে খেয়াল রাখছে জটায়ু বাড়াবাড়ি করে ফেলছে কিনা। মেক-আপ যে দুর্ধর্ষ রকম ভাল হয়েছিল সেটা বুঝলাম যখন দেখলাম লালমোহন ঘাটে হাজির হওয়ামাত্র একটি পাণ্ডা তাকে মহাভক্তিভরে প্রণাম করল। লালমোহনও দেখি দিব্যি আধবোজা চোখে তার মাথায় হাত দিয়ে তাকে আশীর্বাদ করলেন।

ভিড় সত্ত্বেও ঘাটের শুটিং আশ্চর্যভাবে উতরে গেল। কাজের শেষে আমরা আর ভিড়ের দিকে না গিয়ে সবাই মিলে বজরার ছাতে চড়ে বসলাম। বজরাই আমাদের দশাশ্বমেধ পৌঁছে দিল। যেদিন সকাল থেকে বিকেল অবধি ঘাটে কাজ হত সেদিন দুপুরের খাওয়াটা বজরাতে

বসেই সারা হত। কাগজের বাক্সে শুক্‌নো খাবার, শেষ হলেই বাক্স জানালা দিয়ে গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, আর অমনি চিলের দল ছোঁ মেরে বাক্স থেকে চপ-কাটলেটের টুকরো তুলে নিচ্ছে।

দ্বারভাঙার কাজ শেষ করে আমাদের যেতে হয়েছিল দক্ষিণে বেশ খানিকটা দূরে বিখ্যাত কেদার ঘাটে। কাউকে বলা হয়নি যে আমরা ঘাট বদল করছি, তাই বিকেল হতে না হতে সব লোক গিয়ে হাজির হয়েছিল সেই দ্বারভাঙা ঘাটেই। কিন্তু কেদার ঘাটে শুটিং-এর তোড়জোড় করার সময় দেখা গেল উত্তর দিক থেকে পিল পিল করে লোক আসছে হেঁটে আর নৌকায় এই কেদারের দিকেই। আসল খবর কত তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেছে শুটিং দর্শনপ্রার্থীদের কানে সেটা দেখে বেশ অবাক লাগল। ভিড় যদি বা দূরে সরে গিয়ে আমাদের শট্ নিতে দেয়, তা হলেও একটা অসুবিধায় পড়তে হয় তখনই যদি দৃশ্যটা হয় মজার, আর সেই মজায় যদি লালমোহনের একটা বড় ভূমিকা থাকে। শটের মধ্যে দর্শক হো হো করে হাসতে আরম্ভ করে, ফলে অভিনেতারা যে কী কথা বলছে, আর সেটা ঠিক ভাবে বলছে কিনা বোঝা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। টেপ রেকর্ডারে অবিশ্যি সাউন্ড তোলা হচ্ছে, কিন্তু তাতেও দর্শকদের হাসির শব্দ অন্য সব শব্দকে ছাপিয়ে উঠছে। এই হাসির ভেতর ফেলু তোপসে লালমোহনের কথা খুঁজে বার করা অনেক সময় খুব কঠিন হয়ে পড়ে। অথচ এ কাজটা না করলেও নয়, কারণ কলকাতায় এসে এই টেপ শুনেই এদের তিনজনকে দিয়ে আবার কথাগুলো বলিয়ে নতুন করে রেকর্ড করে ছবির সঙ্গে জুড়তে হবে। একেই বলে 'ডাবিং'। এই ডাবিং নিখুঁত হলে পরে ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে কথা হুবহু মিলে যায়, আর লোকে ধরতেই পারে না যে ছবি আগে তোলা হয়েছে, শব্দ পরে জোড়া হয়েছে।

ঘাটের পরে গলি নিয়ে পড়তে হল। ফেলুদারা এসে উঠেছে দশাশ্বমেধ রোডের উপর ক্যালকাটা লজ হোটেলে। সেখান থেকে বিশ্বনাথের গলি ধরে জ্ঞানবাপী পেরিয়ে আরও কয়েকটা অলিগলি পেরিয়ে তাদের যেতে হবে মগনলালের বাড়ি। এই যাওয়ার পথে কথাবার্তা আছে, আর আছে ষাঁড়ের সামনে পড়ে লালমোহনের ভড়কানো। বিশ্বনাথের গলিতে ভিড় ম্যানেজ করে শট্ নিয়ে জ্ঞানবাপীতে মগনলালের সঙ্গে মিটিং-এর শট্ নিয়ে যে গলিতে ষাঁড়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, সেখানে ক্যামেরা সমেত গিয়ে হাজির হলাম। কলকাতায় বসে যখন চিত্রনাট্য লিখেছি তখন জানতাম না যে কাশীতে গত কয়েক বছরে ষাঁড়ের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। অথচ ষাঁড় ছাড়া কাশী ভাবাই যায় না, আর ষাঁড়ের সামনে পড়ে জটায়ুর কী দশা হবে

সেটাও দেখানো দরকার। গলির লোকেরা বলল, কাছাকাছির মধ্যে কোনও ষাঁড় নেই, ষাঁড় আনতে হবে ঘাট থেকে। তার মানে কম করে মাইল খানেকের পথ। আর ষাঁড়বাবাজি সেখানে থাকলেও, তিনি তাঁর স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র ছেড়ে আমদের বাছাই করা এই গলিতে আসবেন কিনা সেটাও একটা প্রশ্ন।

কানু এগিয়ে হল। বলল হাতে ষাঁড়ের খাদ্য কিছু শাকসবজি নিয়ে ষাঁড়কে প্রলোভন দেখিয়ে সে যে করে হোক তাকে শুটিং-এর জায়গায় এনে হাজির করবে। কানু আমাদের সকলের শুভেচ্ছা নিয়ে চলে গেল, আমরা অপেক্ষার জন্য প্রস্তুত হলাম। খুব ভোরে বেরোনো হয়েছে, প্রাতরাশের সময় পাওয়া যায়নি, তাই কাছেই বিশাল আকারের জিলিপি ভাজা হচ্ছে দেখে তাই দিয়ে সকলে ব্রেকফাস্ট সেরে নিলাম।

লালমোহন দেখলাম মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন ; সেটা বোধহয় ষাঁড়ের চিন্তাতেই। সোনার কেল্লায় তাঁকে উটের সামনে পড়তে হয়েছিল ; সেখানেও চিন্তার কারণ ছিল। তবে ষাঁড়ের তুলনায় উট অনেক বেশি নিরীহ। ষাঁড়মশাই কখন কী করে বসেন সেটা আগে থেকে অনেক সময়ই বোঝা যায় না। তাই লালমোহনের উদ্বেগের কারণ আছে বইকি। এখানে আরেকটা দৃশ্য নিয়ে একজন অভিনেতার উদ্বেগের গল্প একটু বলে রাখি। সোনার কেল্লার ভিলেন মন্দার বোস ডাক্তার হাজরাকে ঠেলা মেরে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছিল। শৈলেন মুখার্জি করেছিল ডাক্তার হাজরার পার্ট। তাকে যে মন্দার বোস ঠেলা মারবে সেটা শৈলেন জানত, কিন্তু দৃশ্যটা ঠিক কিভাবে তোলা হবে সেটা আমার জানা থাকতেও আমি ওকে বলিনি। ও বোধ হয় ভেবে রেখেছিল যে সত্যজিৎ রায় যখন ফাঁকি দেওয়া পছন্দ করেন না তখন ওকে বুঝি সত্যিই পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়তে হবে। রাজস্থান যাবার আগে শৈলেন তার বাড়িতে বলে গেল— 'যাচ্ছি তো, কিন্তু হাড়গোড় কিছু রেখে আসতে হতে পারে এটা বলে গেলাম'। তার পর একেবারে জয়পুর পৌঁছে শট্ দেবার ঠিক আগে শৈলেনকে বলা হয় যে তাকে মন্দার বোস ঠেলা মারবে ঠিকই, কিন্তু সে পাহাড় দিয়ে গড়িয়ে পড়ার আগে তাকে ধরে নেবে, আর তার পর তাকে দেখানো হবে একেবারে পাহাড়ের নীচে জখম অবস্থায় পড়ে আছে। সুতরাং তার চিন্তার কারণ নেই। শট্ নেবার পর সেই দিনই শৈলেন কলকাতায় টেলিফোন করে জানিয়ে দিল— 'তোমাদের কোনও চিন্তা নেই, আমার হাড়গোড় সব ঠিকই আছে'।

এদিকে ষাঁড়ের গলিতে ভিড় জমতে আরম্ভ করেছে। ঘাটে ছিল বাঙালিদের ভিড়, আর এখানে শুনছি খালি হিন্দি কথা। শুটিং দেখার উৎসাহে এখানেও কেউ কম যায় না। মনে মনে ভাবছি ষাঁড় কাছাকাছি

পৌঁছলেও এই ভিড় ভেদ করে আমাদের ক্যামেরার সামনে পৌঁছবে কি ?

প্রায় একঘণ্টা অপেক্ষা করার পর কামুর আবির্ভাব হল। কিন্তু ষাঁড় কই ? কামু মুখ কালো করে বলল ষাঁড় অর্ধেক পথ খাদ্যের লোভে তার পিছন পিছন এসে হঠাৎ কী খেয়ালে মাইন্ড চেঞ্জ করে উল্টোমুখো ঘুরে তার জায়গায় ফিরে গেছে। তবে কি ষণ্ডপর্ব বাদ দিতে হবে ? সে হয় না। কাশীতে এসে ষাঁড় পাওয়া যাচ্ছে না বলে ঘটনা পাল্টাবার ইচ্ছা আমার একেবারেই নেই।

এই সময় গলির মাথা থেকে হঠাৎ একটা সোরগোল শোনা গেল। আমাদের যে একটা ষাঁড়ের দরকার সে খবরটা ইতিমধ্যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। দু-একজনকে বলেও দেওয়া হয়েছিল কাছাকাছি সন্ধান করতে। তাদেরই একজন একটা জাঁদরেল ষাঁড় দেখতে পেয়ে সেটাকে ধরে এনেছেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে ষাঁড়ের মালিককেও ধরে এনেছেন। কিন্তু ক্যামেরা যেখানে দাঁড় করানো হয়েছে— অর্থাৎ দৃশ্যটা যেখানে নেব বলে ঠিক করেছি— সেখানে ষাঁড়টাকে আনা যাবে না, কারণ ষাঁড় আর ক্যামেরার মধ্যিখানে গলির মুখটাতে একটা লোহার বেড়া রয়েছে, সেটার মধ্যে দিয়ে একটা মাঝারি সাইজের গরু ঢুকবে, কিন্তু ষাঁড় ঢুকবে না। গলির উল্টোমুখে বেড়া নেই, কিন্তু সেখান দিয়ে ষাঁড় আনতে হলে আরও চারটে গলি ঘুরে উলটো দিক দিয়ে আনতে হবে। তাও আবার মাঝপথে যে ষাঁড় বেঁকে বসবে না, তার কী ঠিক ? তাই আমার ক্যামেরাটাকেই নিয়ে গেলাম বেড়ার ওপারে। দৃশ্যটা হচ্ছে এই— মগনলালের লোক ফেলুদা আর তোপসকে নিয়ে ষাঁড়ের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে, ফেলুদা কয়েক পা এগিয়ে পিছন ফিরে দেখবে লালমোহন ষাঁড়ের সামনে পড়ে থমকে গেছে। কারণ জিগ্যেস করাতে লালমোহন জানাবে যে আটান্তরে তার নাকি একটা ফাঁড়া আছে, এবং তার বিশ্বাস যে এই ষাঁড়ই সেই ফাঁড়া। ফেলু এগিয়ে গিয়ে তাকে ধমক দেওয়াতে কোনও রকমে সাহস সঞ্চয় করে বাধা অতিক্রম করে লালমোহন হাঁপ ছাড়বে।

আমরা নতুন জায়গায় ক্যামেরা বসিয়ে একটা রিহার্সাল করব বলে তোড়জোড় করছি, এমন সময় লক্ষ করলাম যে জনতার মধ্যে থেকে একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেছে। কাশীর লোকেরা ষাঁড় জিনিসটাকে বেজায় ভক্তি করে। সেই ষাঁড়কে এতক্ষণ গলির মধ্যে আটকে রাখাতে তাদের মধ্যে থেকে আপত্তি উঠেছে। বুঝলাম রিহার্সাল-টিয়ার্সাল চলবে না। দুর্গা বলে কপালে যা থাকে করে শটটা নিয়ে নিতে হবে। মগনলালের নীল-সার্ট পরা লোক আর থ্রি মাসকেটিয়ার্স ষাঁড়ের পিছনে

গিয়ে দাঁড়াল।

ক্যামেরা রেডি করে 'অ্যাকশন' বলতে তারা এগিয়ে এল সামনের দিকে। নীল সার্ট কাশীরই লোক, এই শ্রেণীর জানোয়ারে অভ্যস্ত, সে ষাঁড়টার পাশ দিয়ে যাবার সময় সেটাকে মৃদু ধাক্কা মেরে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে ফেলু আর তোপসের জন্য পথটা একটু চওড়া করে দিল, ফেলু আর তোপসে দিব্যি বেরিয়ে গেল। লালমোহনের কথা ছিল ষাঁড়টাকে দেখে হাত তিনেক দূরে দাঁড়িয়ে পড়বেন, আর কথামতো দাঁড়ালেনও বটে, কিন্তু সেই মুহূর্তে ষাঁড়বাবাজি হঠাৎ তাঁর দিকে ফিরে এমন ভাবে শিংনাড়া দিয়ে উঠলেন যে ভয়টা আর লালমোহনের অভিনয় করে দেখাতে হল না। ষাঁড়ের আস্ফালনে জটায়ু চোখ কপালে তুলে হাত পা ছুঁড়ে ছিটকে তিন হাত পিছিয়ে গেলেন। ফলে দৃশ্যটা যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে তিনগুণ বেশি ভাল হয়ে গেল। দুঃখের বিষয় ক্যামেরা ঠিকমতন কাজ না করায় এমন চমৎকার ষাঁড়ের শট্‌টা শেষ পর্যন্ত ছবি থেকে বাদ পড়ে গিয়েছিল।

ছবিতে দেখতে যে জিনিসটা খুব সহজসাধ্য বলে মনে হয়, শুটিং করতে অনেক সময় সেটার জন্য অনেক মেহনত করতে হয়। প্রত্যেক ছবিতেই এ ধরনের সহজ-কিন্তু-সহজ-নয় শট্ বা দৃশ্য থাকে ; তার কয়েকটার কথা শুটিং-এর গল্প করতে গিয়ে তোমাদের আগেও বলেছি। জয়-বাবা ফেলুনাথেও ছিল। তার একটার কথা বলি।

ফেলুদা, লালমোহন আর তোপ্‌সেকে ছবিতে প্রথম দেখা যাবে তারা মালপত্র নিয়ে সাইকেল রিক্সায় চেপে বেনারসের রাস্তা দিয়ে তাদের হোটেল ক্যালকাটা লজের উদ্দেশে চলেছে। একটা রিকশায় ফেলু, আরেকটায় লালমোহন আর তোপসে। দূর থেকে যদি এদের দেখানো হয় তা হলে কোনও সমস্যা নেই ; কিন্তু প্রথম দর্শনের পক্ষে সেটা ভাল নয়, কারণ তাতে লোকের মন ভরবে না, আর মানুষগুলোকে চেনানোও মুশকিল। তাই তাদের চলন্ত রিকশার কাছ থেকেই দেখাতে হবে। এইভাবে ক্লোজ-আপে দেখালে লালমোহনের কিছু বিশেষ অভিব্যক্তি ক্যামেরায় ধরা পড়বে। তীর্থস্থানে পা পড়তেই লালমোহনের ভক্তিভাব জেগে উঠেছে, তাই রাস্তার ধারে মন্দির দেখলেই সে কপালে হাত ঠেকাচ্ছে।

মুশকিল হল এই যে চলন্ত রিকশার সামনে থেকে যাত্রীর ক্লোজ-আপ নিতে গেলে ক্যামেরা রাখতে হয় চালকের জায়গায়। তাই যদি হয় তা হলে রিকশা চলবে কী করে ?

অনেক মাথা ঘামিয়ে ঠিক করা হয় যে সামনের চাকা সমেত চালকের সিটটা খুলে রিকশার পিছনের অংশটা জুড়ে দেওয়া হবে একটা ট্যাক্সির

পিছনে। ক্যামেরাম্যান সমেত ক্যামেরা থাকবে ট্যাক্সির পিছনের ক্যারিয়ারে, আর ট্যাক্সিটা রিকশাকে টেনে নিয়ে চলবে ঠিক রিকশারই স্পিডে।

একটা রিক্সাওয়ালাকে বলাতে সে তার গাড়িতে এই সার্জিক্যাল অপারেশনটা করতে রাজি হয়ে গেল। চালকের অংশ খুলে ফেলা হল, আর বাকি অংশটা আমাদের কাজের জন্য বহাল করা তিনটে ট্যাক্সির একটার পিছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হল। তার পর ক্যারিয়ারের ঢাকনা খুলে ফেলে ক্যামেরা বসিয়ে সেটাকেও দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হল। কিন্তু রিকশায় লালমোহন আর তোপ্‌সেকে বসিয়ে ক্যামেরায় চোখ লাগিয়ে দেখা গেল তারা দুজন বড্ড বেশি কাছে এসে পড়েছে। যাত্রীদের যখন আর পিছনো যাবে না, তখন ক্যামেরাকেই পিছোতে হবে। শেষটায় গাড়ির পিছনের কাচ খুলে ফেলে ক্যামেরা হাতে নিয়ে পিছনের সিটে উল্টো দিকে মুখ করে চোখ লাগিয়ে দেখা গেল এবারে ঠিক যেমনটি চাই তেমনটি হয়েছে।

তোড়জোড়টা করা হচ্ছিল রাস্তার উপর, ফলে যথারীতি চারিদিকে ভিড় জমে গেছে। শট্ নেব বলে যখন ট্যাক্সি রওনা করে দেওয়া হয়েছে তখন দেখি বেশ কিছু বেনারসি মস্তান সাইকেল চেপে ঠিক তোপসে আর লালমোহনের গা ঘেঁষে চলেছে, যাতে ক্যামেরায় তাদের ছবি উঠে যায়। এবার আর মিষ্টি কথায় কাজ হবে না, তাই দলের ছেলেরা কোমর বেঁধে লেগে গেল এই ক্যামেরা-লোলুপদের তাড়ানোর জন্য। মাইলখানেক চলার পর যখন দেখা গেল রোড ক্লিয়ার, সাধারণ পথচারী আর যানবাহন ছাড়া আর কিছু নেই, তখন ট্যাক্সি থেকে হাঁক দিয়ে লালমোহন আর তোপ্‌সেকে জানানো হল যে শট্ নেওয়া হচ্ছে। এইভাবে সেই রিকশাতে বসিয়ে ফেলুর শট্‌টাও নেওয়া হল। এই কারসাজিটা জানা না থাকলে পর্দায় দেখে কেউ বুঝতে পারবে না কী করে এই শট্ নেওয়া হয়েছে।

বেনারসে একটা ছাড়া সব দৃশ্যই নেওয়া হয়েছিল দিনের বেলায়। দিনের শুটিং এর ঝামেলা রাত্রের তুলনায় অনেক কম। তার একটা কারণ এই যে ছবি তুলতে গেলে—বিশেষ করে বেনারসের গলি-টলিতে—নিজেদের আলোর ব্যবস্থা করতে হয়। স্টুডিওতে যেমন লোহার স্ট্যান্ডে লাগানো বড় বড় আলো ব্যবহার করতে হয়, তেমন সব আলো সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হয়, আর তাতে লটবহর বেড়ে যায় অনেক বেশি। তা ছাড়া যেখানে শুটিং হবে সেখানে ইলেকট্রিক কানেকশনের ব্যবস্থা করতে হয়, যেখানে ইলেকট্রিসিটি নেই সেখানে জেনারেটর নিয়ে যেতে হয়, ফলে যে অঞ্চলে শুটিং হবে সেখানকার লোকদের বেশ ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে হয়। বেনারসে আমাদের নাইট-শুটিং হয়েছিল

বাঙালিটোলার পাণ্ডে হাভেলি বা পাঁড়ে হাউলিতে। তবে সেটার কথা বলার আগে রাজস্থানে সোনার কেল্লার একটা নাইট শুটিং-এর কথা এই ফাঁকে বলে নিই।

গল্পে ঘটনাটা ঘটছে মাঝরাত্তিরে, আর আমাদের শুটিংটাও হয়েছিল মাঝরাত্তিরে একেবারে হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যে। ফেলুদা, তোপ্‌সে আর লালমোহন রামদেওরা স্টেশন থেকে জয়সলমিরের ট্রেনে উঠেছে। কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর তাদেরই কামরার পাদানিতে এসে উঠেছে রাজস্থানির ছদ্মবেশে মন্দার বোস। ট্রেনের কামরার ভিতরে যা কিছু ঘটনা ঘটবে সে সব তোলা হবে কলকাতার স্টুডিওতে আমাদের তৈরি কামরাতে। কিন্তু কামরার বাইরে বেশ কিছু শট আছে যেটা স্টুডিওতে নেওয়া সম্ভব নয় তার মধ্যে সব দিক দিয়ে সবচেয়ে কঠিন শট্‌ হল মন্দার বোস চলন্ত ট্রেনে লোহার রড ধরে ঝুলতে ঝুলতে এক কামরা থেকে আর এক কামরায় চলে যাচ্ছে। কাজটা সবচেয়ে কঠিন অবিশ্যি কামু মুখার্জির জন্য, যিনি মন্দার বোসের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। এ দৃশ্য বিদেশে তোলা হলে অভিনেতার বদলে পেশাদারি স্টান্টম্যান ব্যবহার করা হত। দুঃখের বিষয় বাংলাদেশে ভাল স্টান্টম্যান নেই। সেটা আমরা জেনেছিলাম জলসাঘর ছবি তোলার সময়। ছবির শেষ দৃশ্যে দেখানো হয়েছিল জমিদার বিশ্বম্ভর রায় ঘোড়া থেকে পড়ে যাচ্ছেন। ছবি বিশ্বাসকে দিয়ে তো আর এ কাজ করানো যায় না, কাজেই খাঁ সাহেব বলে কলকাতার অন্যতম সেরা স্টান্টম্যানকে নেওয়া হয়েছিল। এই খাঁ সাহেবকে বালির উপর একটিবার মাত্র ঘোড়া থেকে পড়ে তিন দিন শয্যা নিতে হয়েছিল। সোনার কেল্লার এই দৃশ্যের জন্য অবিশ্যি কামু গোড়া থেকেই বলে রেখেছিল যে এই অসমসাহসিক কাজটা ও নিজেই করবে। কামুর ডানপিটেমোর নমুনা আমরা আগেও পেয়েছি, তাই তার কথায় ভরসা না করার কোনও কারণ দেখিনি।

দৃশ্যটা তোলার জন্য জয়সলমিরের পথে 'লাঠি' বলে একটা ছোট্ট স্টেশন বাছা হয়েছিল। এঞ্জিন ও কামরা সমেত স্পেশাল ট্রেন এসেছে শুটিং-এর জন্য। ড্রাইভারমশাইকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাকে হয়তো আমাদের নির্দেশমতো বার বার ট্রেন আগুপিছু করতে হতে পারে।

ট্রেন ছাড়াও আর একটা জিনিস এসেছে আমাদের কাজের জন্য, সেটা হল একটা ট্রেনের ট্রলি। লাইনের উপর দিয়ে মানুষে ঠেলে নিয়ে যাওয়া এই ট্রলি নিশ্চয় তোমরা সকলেই দেখেছ। ট্রেন যে লাইনে চলবে তার ঠিক পাশেই সমান্তরাল লাইনে ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে চলবে ট্রলি, আর সেই ট্রলির উপর থাকবে আমাদের ক্যামেরা। সঙ্গে আর একটা ক্যামেরা আছে, সেটা থাকবে সহকারী ক্যামেরাম্যান পূর্ণেন্দুর হাতে। তাকে চড়তে

হবে কামরার ছাতে। ছাতে উপুড় হয়ে শুয়ে ক্যামেরাটাকে হাতে নিয়ে সেটা ঝুলিয়ে দিতে হবে এমন ভাবে যাতে ঠিক মন্দার বোসের মাথার উপর থেকে দৃশ্যটা তোলা যায়। এই ভাবে মন্দার বোসের সার্কাসের খেল আরও শ্বাসরোধকারী বলে মনে হবে।

তোড়জোড় যখন শেষ হল তখন রাত বারোটা। প্রায় মরুভূমির মাঝখানে রেলের স্টেশন। কানু তৈরি হয়ে কামরার পাদানিতে উঠে দরজার লোহার রডটা ধরতেই বৈদ্যুতিক শক্ খাওয়ার মতো করে হাতটা পিছিয়ে নিল। লোহা এমনই ঠাণ্ডা হয়ে গেছে যে হাতে ধরা যায় না। এই ঠাণ্ডা সইয়ে নিতে মিনিটখানেক সময় নিল। তার পর আমরা সবাই তৈরি হয়ে এঞ্জিনের দিকে টর্চ ফেলে জানিয়ে দেওয়া হল যে এবার গাড়ি ছাড়তে হবে। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রেলের কুলি আমাদের ট্রলি ঠেলতে আরম্ভ করল। গাড়ি একটু স্পিড নিলে তবে শট্ দেওয়া হবে। আমি আর সৌমেন্দু ট্রলির ক্যামেরার সঙ্গে রয়েছি, পূর্ণেন্দু কামরার ছাত থেকে ক্যামেরা ঝুলিয়ে রেডি, আর ট্রলির কুলিও আশ্চর্যভাবে ঠিক ট্রেনের সঙ্গে তাল রেখে ট্রলি ঠেলে চলেছে। ট্রলির উপর আবার আলো রাখা হয়েছে, যেটা না থাকলে মন্দার বোসকে দেখাই যেত না, ফলে ছবিও উঠত না।

প্রায় মিনিট খানেক চলার পর শট্ নেবার ব্যবস্থা এল। মন্দার বোস এতক্ষণ বাদুড় ঝোলা হয়ে ছিলেন, এবার তাঁকে নির্দেশ দিতে তিনি তাঁর সার্কাসের খেল দেখিয়ে দিলেন আর আমাদের এই সুকঠিন শটটি একবারেই উতরে গেল।

এই ট্রেনের শুটিংটা এমন একটা জায়গায় হয়েছিল যেখানে দর্শকের ভিড়ের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ওই একটা ব্যাপারে তাই আমরা নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলাম। কাশীতে বাঙালিটোলার গলিতে শুটিং-এর টাইম রাখা হয়েছিল রাত আটটা। ফেলুদা তোপ্‌সে আর লালমোহন রাত্রের খাওয়া সেরে গলিতে বেড়াতে বেরিয়েছে। শখটা লালমোহনেরই, কারণ আগামী উপন্যাসের জন্য সে বেনারসের গলির অ্যাটমসফিয়ারটা একটু চোখে দেখতে চায়। জনমানবশূন্য থমথমে গলিতে তিনজনে গল্প করতে করতে হেঁটে যাবে, আর তার পাশেরই একটা গলিতে ঠিক সেই সময়েই একটা রক্ত-হিম করা খুন হবে। দৃশ্যটার জন্য যে ডায়ালগ লেখা হয়েছে সেটা বলতে গেলে কতখানি পথ হাঁটতে হবে সেটা হিসেব করে পর পর তিনটে গলি বাছা হয়েছে পাঁড়ে হাউলিতে। আমরা আগের দিন রাত্রে গিয়ে দেখে এসেছি যে জায়গাটায় এমনিতে প্রায় আলো নেই বললেই চলে। রাস্তার আলো জ্বললেও তাতে পথচারীর খুব একটা সুবিধে হয় না। কাজেই পুরো জায়গাটাকেই আলো করতে হবে

আমাদের স্টুডিওর আলো দিয়ে। কথা ছিল ইলেক্‌ট্রিশিয়ানরা চলে যাবে ছ'টায়, আমরা বাকিরা অভিনেতা সমেত হাজির হব আটটায়।

ঘড়ি ধরে সময়মতো গিয়ে গলির অবস্থা দেখে চক্ষুস্থির। আমাদের বাছাই করা দুটো গলির ঠিক মধ্যিখানে একটা অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত জায়গায় কমপক্ষে হাজার লোক জমায়েত হয়েছে—তার মধ্যে ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি বাঙালি পশ্চিমা কিছুই বাদ নেই। সত্যি বলতে কি, আমরা যে একটু নড়েচড়ে কাজের জন্য তৈরি হব তারও কোন উপায় রাখেনি বাঙালিটোলার অধিবাসীরা। সবাই অনড় হয়ে শুটিং দেখার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন ; অথচ এই সামান্য বুদ্ধিটুকু কারুর নেই যে এ অবস্থায় শুটিং-এর কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না।

গলা তুলতে হল (হাজার লোকের সমবেত গুঞ্জনে কোলাহলটাও জমেছে ভালই !) তারস্বরে জানিয়ে দেওয়া হল যে লোক না সরলে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। বার পাঁচেক বলেও যখন কোনও ফল হল না তখন আমার লোকদের তল্পিতল্পা গুটিয়ে হোটেলে ফিরে যাবার আদেশ দিয়ে দিলাম। কলকাতায় ফিরে গিয়ে স্টুডিওতে কাশীর গলি তৈরি করে নিয়ে কোনও রকমে কাজ সারতে হবে। এখানে হবে না।

হোটেলে ফিরে রাত্রের খাওয়া সেরে শোবার তোড়াজোড় করছি এমন সময় সদর দরজায় কলিং বেলটা বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখি দুই যুবক দণ্ডায়মান। যে পাড়ায় শুটিং করতে গিয়েছিলাম এরা নাকি সেই পাড়ারই ছেলে, আমার হাতে পায়ে ধরে বলল, 'দাদা, কাল আবার আসুন, একটু রাত করে আসুন ; গ্যারেন্টি দিচ্ছি কোনও ভিড় হবে না। আপনি কাশীতে এসে আমাদের পাড়ায় কাজ না করে ফিরে গেলে আমরা মুখ দেখাতে পারব না। চিরকালের জন্য কাশীর একটা কলঙ্ক থেকে যাবে'—ইত্যাদি।

অনেক ভেবে পরদিন আর একটা চেষ্টা দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। বললাম, 'গিয়ে ভিড় দেখলে কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরে আসব।'

এঁরা যে কথা রাখতে পারবেন সেটা কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি ; কিন্তু আশ্চর্য !—দ্বিতীয় দিন রাত এগারোটায় পৌঁছে তিনটে পর্যন্ত আমরা যেভাবে নির্বিঘ্নে কাজ করলাম, তেমন স্টুডিওতেও হয় না। একটা ব্যাপারে একটু মুশকিলে পড়তে হয়েছিল ; বাঙালির দোকান 'রিঙ্কু সিল্ক হাউস'-এর লোক আমাদের ছবি মারফত যাতে তাদের দোকানের বিজ্ঞাপন হয় সেই মতলবে দিনের বেলা কখন জানি এসে গলির সর্বত্র তাদের দোকানের নাম লেখা পোস্টার আটকে দিয়ে গেছে। যে দিকে তাকাই বাড়ির দেয়ালে, পাঁচিলে, মন্দিরের গায়ে ল্যাম্প পোস্টের গায়ে—সব জায়গায় জাজ্বল্যমান হয়ে আছে 'রিঙ্কু সিল্ক হাউস।' যাঁর

কীর্তি তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে বুঝিয়ে বলা হল যে বিজ্ঞাপনগুলো থাকতে দিলে একটা ভয় আছে যে লোকে ফেলুদাকে না দেখে শুধু ওগুলোই দেখবে, আর তার ফলে তাঁর দোকানের লাভ হলেও আমাদের ছবির ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং ওগুলি তুলে ফেলা দরকার। ভদ্রলোক একটু মুসড়ে পড়লেও তাঁকে তোয়াজ করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না ; ভানু এবং দলের কয়েকজন মিলে আধঘণ্টার মধ্যে দু-একটা বাদে সব পোস্টার তুলে ফেলে দিল ।

এখানে এই দৃশ্যে সাউন্ড রেকর্ডিং করার কথাটা একটু বলি। আউটডোরে যে সব দৃশ্যে কথাবার্তা থাকে সেগুলো তখন-তখন রেকর্ড করা হলেও ছবিতে ব্যবহার করা চলে না, কারণ অন্যান্য শব্দের জন্য কথা পরিষ্কারভাবে রেকর্ড হয় না। সে সাউন্ডটা তোলা হয় সেটাকে বলে 'গাইড ট্র্যাক' ; পরে স্টুডিওতে ফিরে এসে এই গাইড ট্র্যাক শুনে অভিনেতাদের দিয়ে হুবহু সেইরকম ভাবে কথা বলিয়ে আবার রেকর্ডিং করা হয়। আমাদের এই গলির দৃশ্যে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল সেটা হল তিনজন দূর থেকে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে, এই কথা যিনি রেকর্ড করবেন তিনি থাকবেন কোথায় ? তিনি ত আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে পারবেন না, তা হলে তো তাঁকে ক্যামেরায় দেখা যাবে।

বাঙালিটোলার এই দৃশ্যের সাউন্ড তোলার জন্য আমরা একটা ফন্দি বার করেছিলাম। লালমোহনের কাঁধে দিয়েছিলাম একটা ঝোলা, আর ঝোলার মধ্যে পুরে দেওয়া হয়েছিল একটা ছোট্ট ক্যাসেট টেপ রেকর্ডার। শটটা শুরু হবার ঠিক আগে সেটা চালু করে দেওয়া হত, আর শট্ শেষ হলে সেটা ঝোলা থেকে বার করে দেখে নেওয়া হত কথা ঠিক বোঝা যাচ্ছে কি না। বলা বাহুল্য, ঝোলা লালমোহনের কাঁধে থাকলেও টেপ রেকর্ডারে তিনজনের কথাই দিব্যি রেকর্ড হয়ে যেত।

কাশীতে আমরা সবশুদ্ধ তেরোদিন শুটিং করেছিলাম। দিনে তিন মিনিটের হিসেবে দেখা যায় এই শুটিং-এ জয়বাবা ফেলুনাথ-এর তিন ভাগের এক ভাগ তোলা হয়ে গিয়েছিল।

উট বনাম ট্রেন

তোমাদের মধ্যে যারা সোনার কেল্লা ফিল্ম দেখেছ, তারা জান যে সেখানে উটকে নিয়ে বেশ একটা মজাদার ঘটনা আছে। রহস্য-রোমাঞ্চ উপন্যাস লেখক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু মরুভূমিতে উটের পিঠে চড়ার স্বপ্ন দেখেন। এ স্বপ্ন গল্পের শেষের দিকে আশ্চর্যভাবে ফলে যাচ্ছে। জয়সলমির যাবার পথে মন্দার বোসের চক্রান্তে ফেলুর গাড়ির টায়ার পাংচার হয়, তার ফলে ফেলু তোপ্‌সে লালমোহন পথে বসে। এমন সময় দূরে দেখা যায় উটের দল। আট মাইল দূরে রামদেওরা স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা করতে পারলে মাঝরাত্তিরের ট্রেনটা ধরা যাবে। ফেলু স্থির করে এই পথটুকু তারা উটেই যাবে। ফেলু তোপসের তো কোনও চিন্তা নেই—দু'জনেই স্মার্ট, দু'জনেরই খেলাধুলো ব্যায়াম করা ছিমছাম শরীর—কিন্তু জটায়ু তো নামেই জটায়ু। উটের সামনে পড়ে অ্যাদ্দিনের স্বপ্ন যে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী জানোয়ার রে বাবা! নেশাখোরের মতো আধবোজা ঘোলাটে চোখ, এবড়ো খেবড়ো কোদালের মতো দাঁত, ঝোলা ঠোঁট উলটিয়ে অষ্টপ্রহর কী জানি চিবোচ্ছে—আর হাঁটলে পরে সর্বাঙ্গে যা দোলানি, দেখলে মনে হয় সওয়ারের হাড়গোড় সব আলগা হয়ে যাবে। না জানি এ জানোয়ারের পিঠে চড়লে কী ভোগান্তি আছে!

কিন্তু উপায় নেই। ফেলু তোপ্‌সে তড়াক তড়াক করে উঠে পড়ে, লালমোহন উঠতে গিয়ে প্রায় বেসামাল হয়ে কোনও রকমে ম্যানেজ করে। ফেলু উটওয়ালাদের হুকুম দেয়—'চলো রামদেওরা'।

উটের দল চলেছে সার বেঁধে, লালমোহন প্রমাদ গুনছে, মাঝপথে হঠাৎ তোপসের চোখ গেল—ওই দূরে ট্রেন আসছে। ওটাকে থামাতে পারলে আর রামদেওরা গিয়ে দশ ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয় না। ছুট ছুট

ছুট। উটের দল লাইনের ধারে পৌঁছে যায়, ফেলু পকেট থেকে রুমাল বার করে প্রাণপণে নাড়তে থাকে, ট্রেন সে সংকেত অগ্রাহ্য করে মরুপ্রান্তর কাঁপিয়ে চোখের সামনে দিয়ে তারস্বরে সিটি মারতে মারতে বেরিয়ে যায়। ফেলু দাঁতে দাঁত চেপে বলে 'শাবাশ'। জটায়ু আধমরা। স্বপ্ন ভেঙে খান খান। এ শিক্ষা ভোলবার নয়। অগত্যা সবাই উটের পিঠেই চলতে শুরু করে রামদেওরা উদ্দেশে।

এই তো গেল উটের পর্ব। ছবিতে শুধু এই দৃশ্যটি তুলতে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল সেটা বললে ফিল্ম তৈরির এলাহি কারবারটা তোমরা কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে।

এটা সবাই জানে যে উট জিনিসটার অভাব নেই রাজস্থানে। গুপী গাইন ছবিতে হাল্লার সেনা দেখানোর জন্য উটের মালিক সমেত এক হাজার উট জোগাড় হয়েছিল মাত্র দু'-তিন দিনের চেষ্টায়। এ ব্যাপারে অবিশ্যি জয়সলমিরের মহারাজা আমাদের অনেক সাহায্য করেছিলেন। সোনার কেল্লায় আমাদের চাহিদা ছিল এর তুলনায় সামান্যই। কিন্তু মুশকিল এই যে, যে জায়গাটা শুটিং-এর জন্য বাছা হয়েছিল, তার ত্রিসীমানায় কোনও লোকালয় নেই। চারিদিকে ধূ ধূ করছে বালি, মাঝে মাঝে শুকনো ঘাস আর ছোট ছোট কাঁটা ঝোপ। এরই মধ্যে দিয়ে চলে গেছে মিটার গেজের লাইন ; দেখলে মনে হয় যার শুরুও নেই শেষও নেই। এই রেললাইনের পাশ দিয়েই আবার চলে গেছে জয়সলমির যাবার মোটরের রাস্তা। লাইন যদি রাস্তা থেকে বেশি দূর হত তা হলে শুটিং সম্ভব হত না, কারণ জয়সলমিরে আমাদের ডেরা—সেখান থেকে মালপত্তর লোকজন নিয়ে আসতে হবে শুটিং-এর জায়গায়। উট যখন ট্রেনের দিকে ছুটে যাবে, তখন ক্যামেরাকেও ছুটতে হবে তার সঙ্গে সঙ্গে। তার মানে ক্যামেরাকে চাপতে হবে হুড খোলা জিপের উপর, আর তার মানেই রেললাইনের কাছাকাছি পিচ বাঁধানো রাস্তা চাই।

যোধপুর থেকে জয়সলমির পর্যন্ত দেড়শো মাইল রাস্তা চষে বেড়িয়ে একটিমাত্র জায়গা পাওয়া গেল যেখানে আমরা যা যা চাইছি তার সব কিছুই আছে। জায়গাটা জয়সলমিরের প্রায় সত্তর মাইল পুবে, যোধপুরের দিকে। উটের দলকে আসতে হবে সেখান থেকে আরও সাত মাইল পুবে খাচি নামে একটা গ্রাম থেকে। উটওয়ালাদের বলে দেওয়া হল তারা যেন উটগুলোকে সাজপোশাক পরিয়ে আনে। আমরা উটকে যে চোখে দেখি, রাজস্থানের মরুদেশের লোকেরা মোটেই সে চোখে দেখে না। উট দেখে আমাদের হাসি পায়, কিন্তু তাদের পায় না। কারণ উট হল তাদের পরম বন্ধু, মরুভূমিতে একমাত্র সহায়। এই বন্ধুটিকে সাজানোর জন্য রাজস্থানীরা আদ্যিকাল থেকে যে কত রকমের

কত বাহারে জাজিম ঝালর গয়নাগাটি তৈরি করে এসেছে তার হিসেব নেই। এই সব পরে উটের দল যখন বালির উপর দিয়ে সার বেঁধে চলে, তখন তারা এই রুক্ষ প্রাকৃতিক পরিবেশে আশ্চর্য সুন্দরভাবে খাপ খেয়ে যায়। দেখলে মনে হয় ঘোড়া বা হাতি বা অন্য কোনও জানোয়ার হলে নিশ্চয়ই এতটা মানানসই হত না। যাই হোক, উটওয়ালারা কথা দিল যে তারা দুপুরেই এসে পৌঁছে যাবে। আমাদের লোক শুটিং-এর জায়গায় অপেক্ষা করবে, নইলে উটওয়ালাদের পক্ষে জায়গা চিনে বার করার কোনও উপায় থাকবে না।

উট তো হল, এবার ট্রেনের ব্যাপার। যোধপুর থেকে একটা সকালের ট্রেন সত্তর মাইল দূরে পোকরান অবধি যায়। আমরা সেই ট্রেনটাকেই ব্যবহার করব বলে ঠিক করেছিলাম। পোকরান হল যোধপুর আর জয়সলমিরের মাঝামাঝি। আমাদের বাছাই করা জায়গাটা অবিশ্যি পোকরান ছাড়িয়ে আরও ২০ মাইল পশ্চিমে, তাও আমাদের ভরসা ছিল যে রেলের কর্তাদের বলে সেই ট্রেনটাকেই আমরা আমাদের কাজের জায়গা অবধি এগিয়ে নেব।

আমরা শুটিং-এর জোগাড় করে তৈরি হয়েছি, এমন সময় একটা ভয়াবহ ঘটনা আমাদের রক্ত জল করে দিল। কয়লার দাম বেড়ে যাওয়াতে রেলের কর্তৃপক্ষ দিনের ট্রেনটিকে এক দিনের নোটিসে দিলেন বাতিল করে! সর্বনাশ! ফেলুর দল উটের পিঠে করে ছুটে গিয়ে ট্রেন থামানোর চেষ্টা করছে—আমার এই সাধের দৃশ্য কি ছবিতে স্থান পাবে না? এ হতেই পারে না।

সেই দিনই রেলের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁদের সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম, এই দৃশ্যটা তুলতে না পারলে আমাদের এত খরচ করে রাজস্থানে আসাটাই মাটি হয়ে যাবে। আমাদের কপাল ভাল যে কর্তাদের মধ্যে রসিক লোকের অভাব ছিল না। তাঁরা ব্যাপারটা বুঝলেন এবং বুঝে যে ব্যবস্থা করলেন তা হল এই—তাঁরা আমাদের ব্যবহারের জন্য একটি আস্ত ট্রেন দেবেন যাতে থাকবে থার্ড ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস মেশানো ছ'টি বগি, গার্ডের গাড়ি, কয়লার গাড়ি ও ইঞ্জিন; ট্রেন চালু করতে যা কয়লা লাগবে তার খরচ দেব আমরা। ব্যাস, সমস্যা মিটে গেল। সত্যি বলতে কি, আমার মতে এটা হল শাপে বর, কারণ এ ট্রেনটা থাকবে আমাদের হাতের মুঠোয়। নির্দিষ্ট কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে আমরা সেটাকে নিয়ে এগোনো পিছনো থামানো চালানো যা ইচ্ছে তাই করতে পারব।

ঠিক হল পোকরান স্টেশনে এসে ট্রেন আমাদের জন্য অপেক্ষা করবে। আমরা জয়সলমির থেকে একশো মাইল রাস্তা মোটরে গিয়ে ট্রেনে চাপব। ট্রেন রওনা হবে আমাদের উটের দৃশ্যের জন্য বাছাই করা

জায়গার দিকে। ফেলু তোপসে জটায়ু অপেক্ষা করবে সেখানে। যাবার পথে আমরা ট্রেনের কামরায় শুটিং করব মুকুল আর বর্মনকে নিয়ে। বর্মন মুকুলকে নিয়ে জয়সলমির যাবার পথে ঝিমিয়ে পড়েছে, আর মুকুল তন্ময় হয়ে জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছে।

এ ছাড়া যাবার পথে আরও একটা জিনিস তোলার ইচ্ছে আছে। ক্যামেরা নিয়ে কয়লার গাড়িতে গিয়ে চাপব, সেখান থেকে ইঞ্জিনের ছবি তুলব—সামনেই চোঙা দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে, আর তার মধ্যে দিয়ে সমান্তরাল রেললাইন একেবারে দিগন্ত পর্যন্ত চলে গেছে।

প্রথম গণ্ডগোলটা হল পোকরানে। ট্রেন আসার কথা এগারোটার সময়, এল আড়াইটার পর। কাজের সময় যেখানে আগে থেকে হিসেব করে ভাগ করা থাকে, সেখানে দশ-পনেরো মিনিট এদিক ওদিক হলেই হিমসিম খেতে হয়, আর এ তো তিন ঘণ্টার ব্যাপার। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি করলে আরও মূল্যবান সময় নষ্ট হবে, তাই আমরা চটপট মালপত্র নিয়ে কামরায় উঠে গাড়ি চালু করে দিলাম।

মুকুল আর বর্মনকে নিয়ে কামরার ভিতরের কাজটা নির্ঝঞ্ঝাটে হয়ে গেল। তারপর গাড়ি থামিয়ে আমরা জনা তিনেক গিয়ে উঠলাম কয়লার গাড়িতে। সেখানে কয়লার স্তূপ ছাড়া কিছুই নেই, তাই সেই স্তূপের ওপরেই দাঁড়িয়ে ক্যামেরা হাতে নিয়ে রেডি হয়ে আবার ট্রেন চালু করে দেওয়া হল। ক্রমে গাড়ির স্পিড বাড়লে পর ক্যামেরাও চলতে শুরু করল। ইঞ্জিনে ড্রাইভার ছাড়াও আর একজন লোক থাকে, সে হল স্টোকার। তার কাজ হল একটি অতিকায় খোন্তায় কয়লা তুলে বয়লারে ঢালা। ঢাললেই বয়লারের আগুন গন গন করে জ্বলে ওঠে, আর সেই সঙ্গে চোঙা দিয়ে ভস ভস করে কালো ধোঁয়া বেরোয়।

আমার হাতে ক্যামেরা, কয়লার উপর পা দিয়ে কনুই দুটোকে ইঞ্জিনের ছাতে ভর করে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছি। তারই মধ্যে কেন যে মাঝে মাঝে পা হড়কে টাল হারিয়ে ফেলছি সেটা বুঝতে পারছি না। শট্ নেওয়ার পরে বুঝলাম, আমি কয়লার স্তূপের সামনের দিকে দাঁড়ানোর ফলে স্টোকারবাবু বাধ্য হয়ে আমার ঠিক পায়ের তলা থেকেই কয়লা তুলে নিচ্ছিলেন। বুঝলাম একেই বলে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাওয়া!

এই কয়লার গাড়িতে করেই আমরা উটের শুটিং-এর জায়গায় পৌঁছে গেলাম। উট সমেত বাকি দল সেখানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কেবল যে জিনিসটি না হলে ছবি তোলা যায় না, সেটিকে আর ধরে রাখা যায়নি। সেটি হল সূর্যের আলো। পশ্চিম দিগন্তে মামার আধখানা উঁকি মারছে, নতুন জায়গায় ক্যামেরা বসাতে বসাতে তিনি যে একেবারেই ডুব দেবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

উট, ট্রেন, সব যে যার ঘরে ফিরে গেল, তবে যাবার আগে ঠিক হয়ে

গেল পরদিন আমরা আবার এই একই জায়গায় জমায়েত হচ্ছি দুপুর আড়াইটার সময়। ট্রেনও পোকরানে না থেকে সোজা চলে আসবে এইখানে।

আগেই বলেছি যে আমাদের ডেরা ছিল জয়সলমিরে। মুকুলের সোনার কেল্লা থেকে আধ মাইল দূরে একটি ছোটখাটো প্রাসাদের মতো গেস্টহাউসে আমাদের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। পরদিন ভোরে উঠে আমরা প্রথমে গেলাম কেল্লার ভিতরে শুটিং করতে। ঘণ্টা তিনেক ধরে সেখানে ছবির শেষ দৃশ্যের কিছু শট্ নেওয়া হল। তারপর তাড়াতাড়ি দুপুরের খাওয়া সেরে আমরা আড়াইটার মধ্যে গিয়ে হাজির হলাম উটের শুটিং-এর জায়গায়।

গিয়ে দেখি উটের দল আগেই হাজির। এবার শুধু ট্রেন আসার অপেক্ষা। গতকালের গণ্ডগোলটাও যে শাপে বর হয়েছে সেটা বুঝলাম আকাশের চেহারা দেখে। সাদা আর ছাই রঙের টুকরো টুকরো মেঘে আকাশ ছেয়ে আছে, আর তারই ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে সোনালি রোদ এসে পড়েছে মরুভূমির উপর। নাটকীয় দৃশ্যের পক্ষে এমন মানানসই নাটকীয় আলো গতকাল ছিল না।

আজ ট্রেনও এসে হাজির হল ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায়। আসার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সকলেরই বুক ধুকপুক করছিল, কারণ কাল সকালেই জয়সলমির ছেড়ে চলে যেতে হবে যোধপুর, আর কালই সন্ধ্যায় আমরা তলপি-তলপা গুটিয়ে রাজস্থান ছেড়ে ঘরমুখো রওনা হব। হঠাৎ যখন কানে এল ঝুক্ ঝুক্ শব্দ, তখন সবাই একসঙ্গে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম।

ট্রেন এসে থামবার পর ড্রাইভারকে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া হল। তাকে পিছিয়ে যেতে হবে সিকি মাইল। সেখান থেকে আবার রওনা হয়ে ট্রেন আমাদের দিকে এগিয়ে আসবে, সময় বুঝে আমরা সওয়ার সমেত উটের দলকে রওনা করিয়ে দেব। ক্যামেরা থাকবে হুড খোলা জিপের উপর, পিচের রাস্তা দিয়ে জিপ ঠেলে ক্যামেরাকেও উটের সঙ্গে সঙ্গে দৌড় করানো হবে ট্রেনের দিকে।

ড্রাইভারকে সবই বোঝানো হয়েছিল, কেবল একটি জিনিস বাদে— যার ফলে আমাদের প্রথম বাজি ভেস্তে গেল। ট্রেন আসছে, উট ছুটছে, ক্যামেরাও ছুটছে; ট্রেন উটের কাছাকাছি এসে গেলে পর ফেলু যেই পকেট থেকে রুমাল বার করে হাত নেড়েছে, অমনি ঘ্যাঁ-চ করে ব্রেক কষে ট্রেন থেমে গেল। ড্রাইভারকে জিগ্যেস করতে বলল, 'বাবু যে আমায় থামবার জন্য ইশারা করল, তাইতো থামলাম'। ড্রাইভার বেচারা তো আর জানে না যে ও জিনিসটা করলে গল্পের ঘটনা একেবারে উলটিয়ে যায়! পিছোও, পিছোও— ট্রেন পিছোও, আবার সেই সিকি মাইল দূরে। উট পিছোও, ফেলু তোপসে লালমোহন পিছোও, জিপ

ক্যামেরা সব পিছোও, আবার সব শুরু থেকে নতুন করে হবে। এবারে নিশ্চয়ই আর কোনও গণ্ডগোল হবে না।

ট্রেন আবার রওনা হল। ওই যে শব্দ শোনা যাচ্ছে, ওই এসে পড়ল বলে। উটের দলকে ইশারা করে দেওয়া হল। জিপকে ঠেলার জন্য সার বেঁধে লোক তৈরি। এক ঠেলায় একদফা ঘাম ছুটে গেছে তাদের ; এবার দ্বিতীয় দফা।

ক্যামেরা চালু করার জন্য 'স্টার্ট' কথাটা বলতে গিয়ে জিভে আটকে গেল। ট্রেন তো আসছে, কিন্তু ধোঁয়া কই? মরুপ্রান্তরের বিশাল ঝলমলে আকাশ ট্রেনের মিশকালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যাচ্ছে—এ না হলে দৃশ্যটা জমবে কী করে? থামাও থামাও, ট্রেন থামাও, উট থামাও, জিপ থামাও!

দলের যত লোক যে যার কাজ ফেলে দুহাত তুলে ট্রেনের দিকে ছুটে গেল। রোক্‌কে, রোক্‌কে!

ঘ্যাঁ-চ করে ট্রেন আবার ব্রেক কষল।

স্টোকারবাবু নিজে শুটিং দেখার জন্য এত উদ্‌গ্রীব যে বয়লারের কয়লা দিতে ভুলেই গেছেন— ধোঁয়া আর হবে কোত্থেকে? এবার কিন্তু কয়লা দেওয়া চাইই চাই। তৃতীয়বার ভুল হলে আমরা পথে বসব, কারণ চারবারের বার আর আলো থাকবে না। স্টোকারের খেয়াল খুশির উপর নির্ভর না করে এবার ইঞ্জিনে আমাদের নিজেদের একজন লোক রেখে দিলাম।

ফেলু, তোপসে আর জটায়ু উটের পিঠে চড়ে জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। বার বার তিনবার শট্ নেওয়াতে একটা লাভ হবে জানি—সওয়ারদের আর দম বেরোনোর অভিনয় করতে হবে না। জটায়ুর অবস্থা তো দেখছি এর মধ্যেই ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। কিন্তু দৃশ্যটা যাতে ভালভাবে তোলা হয় তা জন্য সবাই সমান ব্যগ্র, তাই পরিশ্রম হলেও কেউ সেটা গায়ে মাখছে না।

তিনবারের পর আর কোনও দিক দিয়ে কোনও গণ্ডগোল না হওয়াতে দৃশ্যটা নিখুঁতভাবে তোলা হয়ে গেল।

কিন্তু তার মানেই যে সেদিনের কাজ শেষ হয়ে গেল তা নয়। এই একই ট্রেন আমাদের আবার প্রয়োজন হবে আজই রাত্রে দশটার সময়। রামদেওরা স্টেশনের দৃশ্য! মাঝরাত্তিরে জয়সলমিরের ট্রেন এল, ফেলু তোপসে লালমোহন ট্রেনে চাপল, আর ট্রেন ছাড়া মাত্র রাজস্থানির ছদ্মবেশে মন্দার বোস দৌড়ে গিয়ে ফেলুদের কামরার দরজার হাতল ধরে ঝুলে পড়ল।

সে হল আরেক পর্ব।

সমাপ্ত